~ www.amarboi.com ~

লেখা নিয়ে কথা

শাহাদুজ্জামান

~ www.amarboi.com ~

সাম্প্রতিককালের অন্যতম কথাসাহিত্যিক শাহাদুজ্জামানের সঙ্গে তরুণ প্রজন্মের লেখক, সাহিত্যানুরাগীদের কথোপকথনের সংকলন 'লেখা নিয়ে কথা'। এই কথোপকথনের ভেতর শাহাদুজ্জামান তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্য, সমাজ ভাবনা, ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা, জীবনজিজ্ঞাসার নানা দিক।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

~ www.amarboi.com ~

আলোকচিত্র: কেট্রিওনা ফরেস্ট (Catriona Forrest)

শাহাদুজ্জামান

শাহাদুজ্জামান বাংলা মননশীল কথাসাহিত্যের বিশিষ্ট নাম। গল্প, উপন্যাস ছাড়াও প্রবন্ধ, অনুবাদ, ভ্রমণ এবং গবেষণার ক্ষেত্রে রয়েছে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। প্রকাশনা সংস্থা মাওলা ব্রাদার্স আয়োজিত কথাসাহিত্যের পাণ্ডুলিপি প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়ে প্রকাশিত হয় শাহাদুজ্জামানের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'কয়েকটি বিহ্বল গল্প' (১৯৯৬)। তার উল্লেখযোগ্য বইয়ের ভেতর রয়েছে ক্রাচের কর্নেল; একজন কমলালেবু; অন্য এক গল্পকারের গল্প নিয়ে গল্প; মামলার সাক্ষী ময়না পাখি; কথা পরম্পরা; একটি হাসপাতাল, একজন নৃবিজ্ঞানী, কয়েকটি ভাঙা হাঁড়ি ইত্যাদি। কথাসাহিত্যে সামগ্রিক অবদানের জন্য ২০১৬ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তিনি। তার গল্পগ্রন্থ 'মামলার সাক্ষী ময়না পাখি' ২০১৯ সালে প্রথম আলো বর্ষসেরা বই হিসেবে পুরস্কৃত হয়।

শাহাদুজ্জামানের পড়াশোনা মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে। নেদারল্যান্ডসের আমস্টার্ডাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি অর্জন করেন চিকিৎসা নৃবিজ্ঞানে। বর্তমানে তিনি যুক্তরাজ্যের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন। শাহাদুজ্জামানের জন্ম ১৯৬০ সালে ঢাকায়।

Email:zshahaduz@gmail.com)

~ www.amarboi.com ~

লেখা নিয়ে কথা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লেখা নিয়ে কথা

শাহাদুজ্জামান

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ঐতিহ্য

~ www.amarboi.com ~

লেখা নিয়ে কথা
শাহাদুজ্জামান

প্রকাশক
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল
মাঘ ১৪২৬
ফেব্রুয়ারি ২০২০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

মূল্য
দুইশত আশি টাকা

LEKHA NIYE KATHA by Shahaduzzaman
Published by Oitijjhya
Date of Publication : February 2020

E-mail: oitijjhya@gmail.com

Copyright©2020 Shahaduzzaman
All rights reserved including the right
of reproduction in whole or in part in any form

Price: Taka 280.00 US$ 8.00
ISBN 978-984-776-574-7

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

আমার লেখালেখির অনুপ্রেরণায় আমার মাতৃকুল

খালা
সুফিয়া বকুল

বড় মামা মামী
খোরশেদ আলম বাবলু
আকতার জাহান জিনা

মেজ মামা মামী
খায়রুল আলম বেলাল
নাসিমা আখতার দীপি

ছোট মামা মামী
খালেদ আহমেদ বাবর
সয়েমা আহমেদ মুন্নী

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

লেখা নিয়ে কথা বলা আমার জন্য সব সময়েই আগ্রহের ব্যাপার। নিজে একসময় পছন্দের লেখকের মুখোমুখি হয়ে কথায় মগ্ন হয়েছি। সেসব আলাপ আমার 'কথা পরম্পরা' বইয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পরবর্তীকালে আমার নিজের লেখার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে আমার সঙ্গে কথা বলেছেন তরুণ প্রজন্মের অনেকে। সেসব আলাপ সংকলিত হয়েছে আমার 'দূরগামী কথার ভেতর' বইটিতে। সে বই প্রকাশিত হয়েছে ২০১২ সালে বেশ কয় বছর আগে। ইতোমধ্যে আরও অনেকেই নতুনভাবে আগ্রহী হয়েছেন আমার সাথে সাহিত্য নিয়ে কথা বলবার। আমারও নতুন কিছু বলার কথা তৈরি হয়েছে। 'লেখা নিয়ে কথা' নামের এই বইয়ে খুব সাম্প্রতিককালের কয়েকটি কথোপকথন যুক্ত হলো। এই কথোপকথনগুলো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

শাহাদুজ্জামান
২০২০

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সূ চি প ত্র

কথা-এক
অলাত এহ্সানের সঙ্গে/ ১১

কথা-দুই
ইলিয়াস কামাল রিসাতের সঙ্গে/ ২৮

কথা-তিন
মাসউদ আহমাদের সঙ্গে/ ৫০

কথা-চার
সুমন রহমানের সঙ্গে/ ৬৭

কথা-পাঁচ
মাসউদুল হকের সঙ্গে/ ৯৯

কথা ছয়
অমিতা চক্রবর্তীর সঙ্গে/ ১২৯

কথা-সাত
হারুন পাশার সঙ্গে/ ১৩৭

কথা-আট
আলতাফ শাহনেওয়াজের সঙ্গে/ ১৪৮

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কথা-এক

[এই কথোপকথন হয়েছে অলাত এহ্সানের সাথে। অলাত এহ্সান গল্পকার। আমাদের এই কথোপকথন ছাপা হয়েছে 'রাইজিং বিডি' পত্রিকায় ২০১৯ সালে। অলাত মূলত আমার ছোটগল্প নিয়ে আলাপ করেছেন। সেইসঙ্গে আমার লেখক জীবনের প্রাথমিক পর্ব, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, শহীদুল জহির প্রসঙ্গ, অনুবাদ, সাহিত্যের সাথে চলচ্চিত্রের সম্পর্ক, সাম্প্রতিক লিটল ম্যাগাজিন, ওয়েব ম্যাগাজিন চর্চা ইত্যাদি নিয়েও কথা হয়েছে।]

অলাত এহ্সান : সাক্ষাৎকার নেয়া ও দেয়ার সংখ্যা আপনার কম নয়। ঠিক কোথা থেকে শুরু করা যায়?

শাহাদুজ্জামান : শুরু তো হয়েই গেল। আপনি আমার সঙ্গে যোগাযোগের সময় বলেছিলেন, সাক্ষাৎকারকে আপনি বিকল্প আত্মজীবনী মনে করেন। কথাটা পছন্দ হয়েছে আমার। তেমন সাক্ষাৎকার দিতে ভালো লাগে যেখানে কথা বলতে বলতে নিজের ভেতরের নানা চোরাগোপ্তা প্রান্তে আলো ফেলা যায়।

অলাত এহ্সান : আপনার সঙ্গে গল্প নিয়েই কথা বলতে চাই। গত বইমেলায় আপনার পঞ্চম গল্প সংকলন প্রকাশ হয়েছে। প্রথম গল্প সংকলন প্রকাশ হয়েছিল ১৯৯৬ সালে। মাঝে ১৫ বছর। নিজের গল্পে বদল কেমন দেখতে পাচ্ছেন?

শাহাদুজ্জামান : পেছন ফিরে আমার গল্পগুলোর দিকে তাকালে সেগুলোকে যেমন অনেকটাই এক সুতায় বাঁধা দেখতে পাই, আবার এদের ভেতর বদলও দেখতে পাই। আমার গল্পের উপস্থাপনায়, আঙ্গিকে একটা নিরীক্ষা প্রবণতা সবসময় ছিল, এখনও আছে। তবে গল্পের বিষয়ে কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। নব্বই দশকের গোড়ায় আমি যখন গল্প লিখতে শুরু করি তখন পৃথিবীর একটা বড় রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটে গেছে। সমাজতান্ত্রিক পৃথিবীর ভাঙন ধরেছে, স্নায়ুযুদ্ধের অবসান হয়েছে, পৃথিবী দ্রুত বিশ্বায়নের দিকে ঝুঁকেছে। বাংলাদেশে বসে সে চাপ আমরা অনুভব করছি তখন। আমি নিজে বাম রাজনীতিতে বিশ্বাসী

~ www.amarboi.com ~

ছিলাম। আমার সে সময়ের গল্পে এই ভাঙনের থিমগুলো ঘুরে ফিরে এসেছে। গল্পের চরিত্রগুলো একধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ভেতর থেকেছে। আমার প্রথম গল্পের বইয়ের নাম ছিল 'কয়েকটি বিহ্বল গল্প'। বিহ্বলতা, দ্বিধা আমার গল্পগুলোর একটা প্রধান থিম। সেসময়ের অনেক গল্পে এই বিহ্বলতার উৎস হয়তো রাজনৈতিক স্বপ্নভঙ্গ। তবে সময় বদলালেও এই বিহ্বলতার থিম কিন্তু আমার গল্পে এখনও আছে। তার উৎস অবশ্য ভিন্ন। মানুষের বেঁচে থাকার ভেতরেই নাজুকতা আছে। ব্যক্তি মানুষ মাত্রই বিরাট, জটিল বাস্তবতার কাছে নাজুক। আমাদের জীবন তো নানা আকস্মিকতায় আর দুর্ঘটনায় ভরা। অনিবার্য মৃত্যুর বিপরীতে এই বেঁচে থাকা, স্বপ্ন দেখার ব্যাপারটাও তো অদ্ভুত। আমাদের জীবনে আনন্দের ভেতর সবসময় চোরাগোপ্তা লুকিয়ে থাকে একটা বেদনার আশঙ্কা। এসব কিছু মিলিয়ে জীবন বিস্ময়কর। আমার গল্পগুলোর ভেতর এই বিস্ময়বোধ সবসময় থাকে। তার বিশেষ বদল হয়নি।

অলাত এহ্সান : আপনার প্রথম বইয়ের সূচনা গল্পটি গল্প নিয়ে। সর্বশেষ গ্রন্থ 'মামলার সাক্ষী ময়না পাখি' বইয়ের সূচনা গল্পটিও গল্প নিয়ে। আপনি অনেকবারই গল্প নিয়ে কথা বলতে চেয়েছেন।

শাহাদুজ্জামান : আমার প্রথম বইয়ের প্রথম গল্পের নাম 'এক কাঁঠাল পাতা আর মাটির ঢেলার গল্প'। এই গল্পের মূলভাব জীবনের ওই নাজুকতা আর আকস্মিকতা। এটি বন্ধুত্বের গল্প। তাদের সর্বোচ্চ আন্তরিকতা সত্ত্বেও সেই বন্ধুত্ব যে টিকল না, তার জন্য তারা দু'জনের কেউ দায়ী নয়। আমরা স্বপ্ন দেখি আর সেই স্বপ্নগুলো ভাঙবার জন্য কোথায় কে অদৃশ্য হয়ে বসে আছে, এই বোধ নিয়ে শুরু হয়েছিল আমার সেই গল্পের বই। আমার সর্বশেষ 'মামলার সাক্ষী ময়না পাখি' বইয়ের শেষ গল্পের নাম 'নাজুক মানুষে সংলাপ', জীবনের ওই নাজুকতা আর আকস্মিকতা নিয়েই এই গল্প। একজন জ্যেষ্ঠ আর একজন কনিষ্ঠ সংলাপের মাধ্যমে জীবনের এই হাত ফসকে যাবার প্রবণতা নিয়ে কথা বলছে। ফলে পনেরো বছর আগের আর পরের এই গল্প দুটোকে একটা ব্রাকেটে এনে ফেলা যায়। তবে 'মামলার সাক্ষী ময়না পাখি' বইটার প্রথম গল্প 'জনৈক স্তন্যপায়ী যিনি গল্প লেখেন'র থিম খানিকটা ভিন্ন। এই গল্পটা বরং বলা যায় আমার এতদিনের গল্প লেখা বিষয়ক ভাবনারই নির্যাস।

অলাত এহ্সান : সেই যে 'এক কাঁঠাল পাতা আর মাটির ঢেলার গল্প'-এ শ্রোতা কারা তা খোঁজা হচ্ছে। আর এবার দেখলাম একটা গল্প লেখায় তাড়িত লেখক গল্পের নানা ধারণা নিয়ে আলোড়িত হচ্ছে। এটা কি নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শাহাদুজ্জামান : ঠিকই বলেছেন। এই গল্পগুলোতে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ার ব্যাপার আছে, আর আছে আমার গল্প বিষয়ক ধারণার প্রকাশ। বলতে পারেন গল্প লেখা নিয়ে একটা গল্প। এটা প্রবন্ধ হতে পারত। আমি বরং একটা প্রবন্ধকে গল্পে রূপান্তরিত করলাম। এটা আমার গল্পের নিরীক্ষা প্রবণতারই ধারাবাহিকতা। আমি ওই গল্পে একজন গল্পকারের কথা বলছি যে বানিয়ে তোলা গল্পের বদলে হয়ে ওঠা গল্প লিখতে চেষ্টা করছে।

অলাত এহ্সান : একজন চিকিৎসা নৃ-বিজ্ঞানীর ব্যস্ততা অন্য অনেক পেশার চেয়ে আলাদা। কর্মস্থল প্রবাসে হওয়ার কারণে তা হয়তো আরো আলাদা। আপনার অভিজ্ঞতা শুনতে চাই।

শাহাদুজ্জামান : আমি ডাক্তারি পাস করলেও প্রচলিত অর্থে রোগীর চিকিৎসা করবার পেশা আমি গ্রহণ করিনি। আমি চিকিৎসা নৃ-বিজ্ঞানে (নেদারল্যান্ডসের আমস্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে) পিএইচডি করে অধ্যাপনা এবং গবেষণাকে আমার পেশা হিসেবে নিয়েছি। শিল্প সাহিত্য অঙ্গনে আমার বিচরণ সহজ করবার জন্যই আমি এ পেশা বেছে নিয়েছি। অধ্যাপনা এবং গবেষণার সঙ্গে থাকার কারণে আমার সময় অনেকটাই নিজের মতো সাজিয়ে নিতে পারি। তবে পেশাগত এই সিদ্ধান্ত নেয়াটা সহজ ছিল না। প্যাসন আর পেশার ভারসাম্য রাখা কঠিন কাজ, সেই কঠিন পথটা এখনও পাড়ি দিতে হয় আমাকে। আমার পেশার অভিজ্ঞতাকে লেখার কাজেও ব্যবহার করার চেষ্টা করি। আমি এখন ব্রিটেনের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা, গবেষণা করছি। বিশ্বস্বাস্থ্য বিষয়ক কাজ করার সুবাদে পৃথিবীর নানা প্রান্তে যাবার সুযোগ ঘটে আমার, সেসব অভিজ্ঞতা আমার লেখাতেও কাজে লাগে। সে হিসেবে পেশাগত জীবনকে আমি যথাসম্ভব আমার সাহিত্যিক জীবনের সহযোগী করে তুলবার চেষ্টা করি। প্রবাস জীবনের অনেক দোলাচল থাকে। সেখানে হারানোর বেদনা আছে, পাওয়ার আনন্দও আছে। নিজের দেশ, সংস্কৃতি থেকে দূরে থাকার কারণে নিজেকে, নিজের দেশকেও নতুন করে চেনা যায়। কিন্তু দেশান্তরের ব্যাপারটার ভেতর একটা চাপা হাহাকার আছে সবসময়। আমি অবশ্য নিয়মিতই দেশে যাওয়া-আসা করি। ফলে নানা মিশ্র অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে প্রবাসে বসবাস করি এবং মনের এই নাগরদোলাকে বরং আমার লেখায় কাজে লাগাতে চেষ্টা করি।

অলাত এহ্সান : এর মধ্যে আপনার লেখার রুটিন কী রকম? মানে রুটিন করে লেখেন কি না?

শাহাদুজ্জামান : আমি সাধারণত রাতে লিখি। প্রবাসে অবিরাম সামাজিকতার কোনো দায় থাকে না বলে, প্রতি রাতেই পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর পর

~ www.amarboi.com ~

আমি কিছু সময় ব্যয় করি লেখায়। লেখা আমার রাতের পেশা। বিশেষ কাজ না থাকলে ছুটির দিনগুলোতে দিনের বেলাতেও লিখি। আবার সুযোগ পেলে কাজের ফাঁকেও চুরি করে লিখি। বিশেষ কোনো বই লেখার মাঝখানে যখন থাকি তখন যতটুকু সময় পাই একেবারে আকণ্ঠ ডুবে থাকি সে লেখায়। 'একজন কমলালেবু' যখন লিখেছি তখন ছুটির দিনগুলোতে টানা আট-দশ ঘণ্টা লিখেছি। তাছাড়া আগে যেমন বলছিলাম কাজের সূত্রে আমাকে পৃথিবীর নানা দেশে ভ্রমণ করতে হয়। প্লেনে আমাকে ছয় সাত ঘণ্টা থাকতে হয়। এসময় আমার তো প্লেনে বসে থাকা ছাড়া আর কাজ নেই। আবার ব্রিটেনের ভেতর বেশ লম্বা ট্রেন জার্নি করতে হয় আমাকে। আমি এই সময়গুলো কাজে লাগাই। আমি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বই পড়েছি প্লেনে, আমার অনেক গল্প লিখেছি প্লেনে, ট্রেনে। জীবনের ব্যস্ততার ফাঁক-ফোকরে যখনই চোরাগোপ্তা সময় পাই, তা লেখার কাজে লাগাই।

অলাত এহ্সান : সেক্ষেত্রে আপনি লেখার সব উপাদান জোগাড় করে লিখতে বসেন, নাকি লিখতে লিখতেই উপাদানগুলো জড়ো হয়, আপনি তাতে সাড়া দেন মাত্র?

শাহাদুজ্জামান : লেখা একধরনের সার্বক্ষণিক পেশা। আমি অন্য কাজ করলেও লেখা নিয়ে ভাবনা মাথায় থাকে সবসময়। ফলে লেখার মূল ভাবনা, চরিত্র ইত্যাদিগুলো মোটামুটি ঠিক করেই লিখতে বসি। লেখার পুরো চেহারাটা মাথায় থাকে না, তবে একটা অবয়ব থাকে। লিখতে লিখতে রূপটা স্পষ্ট হয়।

অলাত এহ্সান : 'একজন কমলালেবু' উপন্যাস প্রকাশের পর আপনি বিচিত্র প্রতিক্রিয়া পেয়েছিলেন, তাই না?

শাহাদুজ্জামান : বইটা প্রকাশের পর যে প্রতিক্রিয়া পেয়েছি তাকে বিচিত্র বলা যায়। ২০১৭ সালের গ্রন্থমেলায় বইটা প্রকাশের পর, মেলার ভেতরই চারটি মুদ্রণ শেষ হয়ে যায়। এরপর ধারাবাহিক মুদ্রণ চলছে। এ বছর সম্ভবত নবম মুদ্রণ চলছে। অনলাইনে, পত্রপত্রিকায় নানা আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক হয়েছে বইটি নিয়ে সেটা লক্ষ করেছি। জীবনানন্দের সাথে শিক্ষিত বাঙালির অল্প বিস্তর সবারই পরিচয় আছে। তাকে কেন্দ্র করে একটা উপন্যাসের ব্যাপারে কৌতূহল তৈরি হবারই কথা। বহু পাঠক-পাঠিকা এই বইয়ের মাধ্যমে নতুন করে জীবনানন্দকে আবিষ্কার করেছেন জানিয়েছেন। ই-মেইলে, ফেইসবুক মেসেঞ্জারে, ব্যক্তিগতভাবে নানা রকম আবেগাক্রান্ত প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তার ভেতর বিচিত্র, নানারকম প্রতিক্রিয়াও থাকে। একজন পাঠক আমাকে ই-মেইল করে জানিয়েছেন, এই বই পড়ার পর থেকে তিনি কমলালেবু খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। কমলালেবু খেতে গেলেই নাকি তার মনে হয় তিনি বোধহয় জীবনানন্দকেই খেয়ে ফেলছেন।

~ www.amarboi.com ~

লোকালয় থেকে বাইরে গিয়ে একজন পুরো বইটা পড়েছেন গাছের উপর চড়ে– এইসব নানা রকম প্রতিক্রিয়া। অনেকে বইটার নাম নিয়ে বিভ্রাটে পড়েছেন। একজন কমলালেবুকে ভেবেছেন একডজন কমলালেবু। তবে জীবনানন্দের মতো অনেক পরিচিত একজনকে নিয়ে বই লেখার বিপদও আছে। জীবনানন্দ বিষয়ে যারা নিজেদের বিশেষজ্ঞ মনে করেন তাদের অনেকের ভেতর জীবনানন্দকে কেন্দ্র করে এক ধরনের অভিভাবকত্ব তৈরি হয়। তারা যেভাবে জীবনানন্দকে বুঝেছেন সেটাই চূড়ান্ত ধরে নিয়ে অন্য যে কোনো ব্যাখ্যা বা উপস্থাপনকে তারা নাকচ করেন। এমন কিছু জীবনানন্দ অভিভাবকের বিরূপ প্রতিক্রিয়া পেয়েছি। একটা বই সবার পছন্দ হবে না। কিন্তু কারো কারো উদ্ধত এবং রুচিহীন মন্তব্যে মর্মাহত হয়েছি। তবে 'একজন কমলালেবু' নিয়ে বেশ কিছু মেধাবী আলোচনাও দেখেছি যেখানে এই বইয়ের শক্তি এবং সীমাবদ্ধতা নিয়ে চমৎকার আলোচনা করা হয়েছে। এই বইটা নিয়ে বিশেষভাবে বিতর্ক হতে দেখেছি বইটা উপন্যাস না জীবনী এই নিয়ে।

অলাত এহ্সান : এটা কেন হলো?

শাহাদুজ্জামান : এই বিতর্ক নিয়ে আমি অন্যত্র কথা বলেছি। আমি বলেছি, উপন্যাসের সংজ্ঞা কালে কালে পাল্টেছে। কোথায় উপন্যাসের সীমা শেষ আর জীবনীর সীমা শুরু সেটা নির্দিষ্ট করা কঠিন। আমি সাহিত্যের নানা শাখার দেয়াল ভেঙে ফেলার আগ্রহের কথা বিভিন্ন সময় বলেছি। উপন্যাস একটা বিশেষ পাঠ অভিজ্ঞতা। বহু পাঠক এই বইটাকে উপন্যাস হিসেবেই পড়েছেন। কলকাতার 'দেশ' পত্রিকায় প্রচেত গুপ্ত বইটা নিয়ে একটা লম্বা লেখা লিখেছেন। তিনি এই বই উপন্যাস না জীবনী এই বিষয়ক বিতর্ক নিয়ে বেশ ভালো ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং তিনি এই বইটাকে উপন্যাস হিসেবেই পাঠ করেছেন। আমি আমার একটা লেখায় মিলান কুন্ডেরাকে উদ্ধৃত করেছিলাম, যিনি উপন্যাসকে বলেছিলেন 'ডিসকভারি অব প্রোজ', যার ভেতর কবিতা, দর্শন, প্রবন্ধ, সবই একাকার হয়ে যেতে পারে। যাহোক এই বইটাকে উপন্যাস না জীবনী কি লেবেল দেয়া হবে তা নিয়ে আমি বিশেষ চিন্তিত নই। বইটাকে একটা সাহিত্যকর্ম হিসেবেই সবাই পাঠ করুক সেটাই আমি চাই। আমি নিজে কোনো জীবনী লেখার ভাবনা থেকে বইটা লিখিনি। 'একজন কমলালেবু'তে আমি আমার মতো করে জীবনানন্দকে পুনঃনির্মাণ করেছি। এই বইটা যতটা জীবনানন্দকে নিয়ে ততটাই জীবনানন্দের দিকে আমার তাকানো নিয়ে এবং এ বই শুধু জীবনানন্দের গল্প না, আমারও গল্প।

অলাত এহ্সান : আপনার পঞ্চম গল্পগ্রন্থ প্রকাশের পরও পাঠকদের মধ্যে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ করেছিলাম। এই দুটি বই প্রকাশের পর কয়েকজন সুহৃদ লেখকের সঙ্গে কথাও বলেছিলাম। আপনার অভিজ্ঞতা কেমন?

~ www.amarboi.com ~

শাহাদুজ্জামান : আগেই বলেছি, একটা বই প্রকাশিত হয়ে যাবার পর তা পাঠক-পাঠিকার সম্পত্তি। যার যার মতো বইটাকে গ্রহণ-বর্জনের স্বাধীনতা আছে। সেখানে আমার কোনো বক্তব্য নাই। তবে আমার শেষ গল্পের বই 'মামলার সাক্ষী ময়না পাখি' নিয়ে এযাবৎ তো ইতিবাচক প্রতিক্রিয়াই পাচ্ছি। আমি এটুকু বলতে পারি যে, এই বইয়ের গল্পগুলো লিখে খুব আনন্দ পেয়েছি।

অলাত এহ্সান : অনেকের ফেসবুক স্ট্যাটাস দেখেছি, এবারের গল্পগুলো 'শাহাদুজ্জামানীয়' হয়ে ওঠে নাই। আপনার কাছে কী মনে হয়?

শাহাদুজ্জামান : গল্পগুলো যে চরিত্র দাবি করে সেগুলো সেভাবেই লেখা হয়েছে বলে আমি মনে করি। আমার সারা জীবনের গল্প লেখার যাত্রা লক্ষ করলে দেখবেন সেখানে বরাবর নিরীক্ষার প্রবণতা আছে। আমি সব সময় নতুন নতুন পথ খুঁজেছি। এই বইতেও সেই চেষ্টা আছে। 'শাহাদুজ্জামানীয়' হয়ে ওঠে নাই বলতে ঠিক কী বোঝায় আমি জানি না।

অলাত এহ্সান : আমার মনে হয়েছে, আগের গল্পে আপনি চিন্তার সংকট-সীমাবদ্ধতার দার্শনিক সমাধানে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন, আর এবার গল্পগুলোয় ব্যক্তির নান্দনিক সমস্যা-সৌন্দর্য নিয়ে কথা বলছেন। এই বিষয়গুলো নিয়ে পূর্ববর্তী লেখকগণ অনেক কথা বলেছেন। বহুল চর্চিত বিষয় পাঠক আশা করেন না।

শাহাদুজ্জামান : আমি মনে করি না, এই বইয়ের গল্পগুলো নান্দনিক সমস্যা-সৌন্দর্য নিয়ে। আগেই বলেছি, এই গল্পগুলো মূলত মানুষের অস্তিত্বের নাজুকতা এবং জীবনের আকস্মিকতা নিয়ে। এই বইয়ের গল্পে আমি জীবনের উপরতল থেকে ঝাঁপ দিয়ে ডুব দিতে চেয়েছি গভীরে, সেখানে ঠিক থই পাওয়া যায় না। আমাদের অস্তিত্বের গভীরের সেই তলটাতে অনেক অন্ধকার। আমরা সেখানে যেতে ভয় পাই। আমি সেই অন্ধকার কুঠুরিতে ঢোকার চেষ্টা করেছি এই গল্পগুলোতে। এখানে ডার্ক হিউমার আছে। এসব বহুল চর্চিত কোনো বিষয় বলে আমি মনে করি না।

অলাত এহ্সান : আপনার গল্পে পাঠের একটা প্রভাব আছে। 'আন্না কারেনিনার জনৈকা পাঠিকা', 'অন্য এক গল্পকারের গল্প নিয়ে গল্প'-তে যেমন দেখি...

শাহাদুজ্জামান : হ্যাঁ, তা ঠিক। পঠন-পাঠন আমার অভিজ্ঞতারই অংশ। আমি প্রায়ই আমার পাঠের অভিজ্ঞতাকেও গল্পের বিষয়ে পরিণত করি।

~ www.amarboi.com ~

অলাত এহ্সান : আপনার গল্পে লোকগল্প ও প্রবচনের ব্যবহার আছে। কোনো কোনো গল্প দাঁড়িয়েছে সেগুলো অবলম্বন করে।

শাহাদুজ্জামান : আমার লেখালেখির মূল প্রণোদনা–জীবন জিজ্ঞাসা। এর উত্তর খুঁজতে আমি আমাদের লোকসাহিত্যের দ্বারস্থ হই। অনেক অসাধারণ ভাবনার উপকরণ সেখানে আছে। লোকগল্প, প্রবচন আমার অনুপ্রেরণা, ফলে আমি সুযোগ তৈরি হলে সেগুলো ব্যবহার করি।

অলাত এহ্সান : অনেকে মনে করেন, লোকগল্প ও উপকথার আদলে গল্প বলতে পারলে বাংলা গল্পের নিজস্ব স্বাক্ষর তৈরি হবে।

শাহাদুজ্জামান : আমাদের এই অঞ্চলের মানুষের জীবন ভাবনার, জীবন যাপনের নানা সূত্র লুকিয়ে আছে আমাদের লোকসাহিত্যে। লোকসাহিত্যে বিষয় এবং আঙ্গিকেরও বৈচিত্র্য আছে। ফলে সেই ভাণ্ডার ব্যবহার করতে পারাটা আমি প্রয়োজনীয় মনে করি। কিন্তু কীভাবে সে কাজটা করা হবে এটা সহজ প্রশ্ন না। সাহিত্যে স্থানিকতা জরুরি, কিন্তু তাকে আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে মেলাতে হবে। লোকগল্পের আদলে একটা গল্প বলতে পারলেই তাতে বাংলা গল্পের নিজস্ব স্বাক্ষর তৈরি হয় না। এই বিশ্বায়নের যুগে আধুনিক ভাবনা, আধুনিক জীবনের সঙ্গে আমাদের লোকসাহিত্যের উপাদান সৃজনশীলভাবে ব্যবহার করার সুযোগ আছে। লাতিন আমেরিকার লেখকরা তাদের লোকসাহিত্য, স্থানিক ভাবনা সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন। আমি অন্যত্র বলেছি– আমি কীভাবে রাস্তার ধারের ওষুধ বিক্রেতাদের গল্প বলার ধরন দিয়ে প্রভাবিত হয়েছি। গল্প নির্মাণের অসাধারণ ক্ষমতা আছে তাদের। একসময় আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে তাদের পারফরম্যান্স দেখতাম।

অলাত এহ্সান : 'জ্যোৎস্নালোকের সংবাদ', 'শিং মাছ, লাল জেল এইসব', 'চীনা অক্ষর অথবা লংমার্চের গল্প' পড়ে মনে হচ্ছিল আপনি নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। পরে আমরা 'আধো ঘুমে ক্যাস্ট্রোর সঙ্গে' বইটা পেলাম। আপনার জীবনানন্দ দাশ পাঠের একটা প্রকাশ পেলাম। এমন আর কিছু নিয়ে ভাবছেন?

শাহাদুজ্জামান : 'জোৎস্নালোক...' থেকে 'আধোঘুমে...' যে গল্পগুলোর কথা বললেন তা মূলত একটা প্রজন্মের সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গের যে ইতিবৃত্ত সেসব বিষয়গুলোকে নিয়ে লেখা। আগেই বলেছি– সেটা আমার প্রথম দিককার অনেকগুলো গল্পের থিম ছিল। জীবনানন্দ দাশের পাঠের ব্যাপারটা এ থেকে ভিন্ন।

অলাত এহ্সান : মুক্তিযুদ্ধের গল্প লিখতে গিয়ে আমাদের দেশের লেখকরা প্রায়ই যুদ্ধকালীন বর্ণনায় চলে যান। অনেক সময় বোঝা যায়, এটা কষ্ট কল্পনা।

লেখা নিয়ে কথা-২

~ www.amarboi.com ~

এ দিক দিয়ে আপনার 'অগল্প' আলাদা। মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাহীন উত্তর প্রজন্মের মুক্তিযুদ্ধের গল্প লেখা নিয়ে আপনার বক্তব্য কী?

শাহাদুজ্জামান : কোনো ঘটনা নিয়ে লেখার জন্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যদি জরুরি হতো তাহলে তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সৈনিক ছাড়া এ নিয়ে আর কেউ লিখতে পারত না। বহু প্রজন্ম পর– এখনও বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে উপন্যাস, চলচ্চিত্র হচ্ছে। তলস্তয় যে যুদ্ধ নিয়ে 'ওয়ার অ্যান্ড পিস' লিখেছেন, সে যুদ্ধ ঘটেছে তার জন্মেরও আগে। সুতরাং মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লিখবার জন্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দরকার নেই, যা দরকার তা হচ্ছে সাহিত্যিক কল্পনার ক্ষমতা।

অলাত এহ্সান : আপনার অবাধ লেখাচর্চা চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে পড়াকালে শুরু হয়েছিল। সে সময় সাহিত্যিক কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীরও ছিলেন সেখানে। শিল্পী ঢালী আল মামুনও ছিলেন। আর কেউ কি ছিলেন?

শাহাদুজ্জামান : সেখানে আমার নিয়মিত যাদের সঙ্গে আড্ডা হতো তাদের মধ্যে যারা ছিলেন তাদের প্রায় সবাই মেডিকেল চত্বরের বাইরের এবং বয়সে আমার চেয়ে কিছুটা বড়। আমরা তিন-চারজন অসমবয়সী ছিলাম যারা বলতে গেলে নিয়মিত আড্ডা দিতাম। তাদের মধ্যে ছিল ঢালী আল মামুন চিত্রশিল্পী, মিলন চৌধুরী 'অঙ্গন থিয়েটার' পরিচালনা করতেন, বাংলাদেশে প্রথম পথ নাটক পরিচালনা করেছিলেন; সুচরিত চৌধুরী একসময়ের তুখোর লেখক, সঙ্গীতজ্ঞ; ডা. মোহাম্মদ আলী বাবু যিনি পেশায় ডাক্তার কিন্তু লেখালেখি করতেন, তার নানা বিষয়ে ব্যাপক পঠন-পাঠন ছিল। আমার বেশি সময় কেটেছে মিলন চৌধুরীর সাথে। লেখালেখির ব্যাপারে তিনি আমাকে খুবই অনুপ্রাণিত করেছেন। ঢালী বেশ অনেকদিন আমার হোস্টেলে আমার রুমেই থেকেছে। কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর আমার সাথে একই ব্যাচে মেডিকেলে পড়লেও মেডিকেলে পড়বার সময় ওর সাথে অতটা ঘনিষ্ঠতা ছিল না। জাহাঙ্গীর সেসময় কবিতাচর্চা করত মূলত, পরে সে কথাসাহিত্যে আসে। মেডিকেল থেকে বের হবার পর বরং ওর সাথে ঘনিষ্ঠতা হয় ওঁর 'কথা' পত্রিকার সূত্র ধরে। আমি সেসময় চট্টগ্রামের গ্রুপ থিয়েটারের সাথে যুক্ত ছিলাম, আমি চিটাগাং ফিল্ম সোসাইটির জেনারেল সেক্রেটারিও ছিলাম। ফিল্ম সোসাইটির সাথে যুক্ত ছিল আলম খোরশেদ, শৈবাল চৌধুরী, আনোয়ার হোসেন পিন্টু। ওদের সাথে আড্ডা হতো। মামুনের সূত্রে পরিচয় হলো ওয়াকিল, শিশির, জুইস, নিসারের সাথে। মেডিকেলে আমি গান বাজনা, আবৃত্তি, বিতর্ক এসবের সাথে যুক্ত ছিলাম। সেইসূত্রে ঘনিষ্ঠ ছিলাম হিউবার্ট ডি ক্রুজ, সেলিম রেজা, মালবিকা সরকার এদের সাথে। আমাদের কাছাকাছি প্রজন্মের অনেক ডাক্তারই সেই আশি, নব্বই দশকে সিরিয়াসভাবে লেখালেখি চর্চা শুরু করে। উত্তরবঙ্গের মামুন হুসাইন, জাকির তালুকদার, ময়মনসিংহে তসলিমা নাসরিন।

~ www.amarboi.com ~

মামুন, জাকিরের সাথে সেই নব্বই দশক থেকেই যোগাযোগ ছিল। তসলিমার সাথে কখনো যোগাযোগ হয়নি।

অলাত এহ্সান : সে সময় আপনি পছন্দের লেখক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, হাসান আজিজুল হক, শিল্পী এস এম সুলতানের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। অনেকে আপনাকে তাদের উত্তরসূরি হিসেবে বলেন। আপনি কি সাহিত্যের উত্তরাধিকার ধারণা বহন করেন?

শাহাদুজ্জামান : তারুণ্যে আমি যাদের লেখক শিল্পী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি তাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। যাদের নাম বললেন, শিল্প-সাহিত্যের জেনুইন ক্রিয়েটিভ মানুষ হিসেবে তাদের কাছ থেকে দেখবার বুঝবার চেষ্টা করেছি। হাসান ভাইয়ের কিছু কর্মকাণ্ডে নানা বিতর্ক তৈরি হয়েছে। সেটা দুঃখজনক। আমি যখন তাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি আমার নিজস্ব শিল্পযাত্রায় আমি তাদের প্রাসঙ্গিক মনে করেছি। তবে আমার নিজস্ব একটা শিল্পযাত্রা আছে সেখানে তাদের সাথে আমার ভিন্নতাও আছে। সাহিত্যে পরম্পরার একটা ব্যাপার তো আছেই। উত্তরাধিকারের প্রাসঙ্গিকতাও আছে। পরম্পরার ধারণা ভাবনায় রেখেই নিজের পথটা কেটে নিতে হয়।

অলাত এহ্সান : আপনার 'কথা পরাম্পরা' বইয়ের উৎসর্গে বলেছেন, 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াস/ প্রাজ্ঞ পূর্বসূরি'।

শাহাদুজ্জামান : আখতারুজ্জামান ইলিয়াস আমার প্রিয় লেখক তো বটেই, প্রিয় মানুষও। তিনি ছিলেন অনেকটা আমার অগ্রজ বন্ধুর মতো। তার সঙ্গে অনেক চমৎকার সময় কাটাবার স্মৃতি আছে আমার। তার অকাল মৃত্যু আমাকে খুবই মর্মাহত করেছিল। তাকে স্মরণ করেই আমার 'কথা পরম্পরা' বইটা উৎসর্গ করেছি। তাকে নিয়ে বেশ কিছু লেখা লিখেছি আমি।

অলাত এহ্সান : ওই প্রশ্নে শহীদুল জহিরকেও আপনাদের গোত্রভুক্ত করেন। মানে বলা হয় আপনারা সিরিয়াস সাহিত্য চর্চাকারী। আপনি শহীদুল জহির সম্পর্কে একাধিক বক্তৃতা করেছেন। তার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন ছিল?

শাহাদুজ্জামান : শহীদুল জহিরকে আমি বাংলাসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ লেখক মনে করি। যেসব লেখক শুধুমাত্র পাঠক-পাঠিকার প্রচলিত রুচিকে পুঁজি করে লেখেন না, বরং পাঠক-পাঠিকাকে তার লেখার ধরনের সাথে প্রস্তুত করেন, সাহিত্যের নতুন নন্দনতত্ত্ব তৈরি করেন তারা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। অনেক লেখককেই দেখেছি তারা ভাষায়, বিষয়ে আগের প্রজন্মের প্রতিষ্ঠিত লেখকদের একধরনের পুনরুৎপাদন করেন। কিন্তু শহীদুলের পৃথিবীকে দেখবার চোখ, তাকে প্রকাশ

~ www.amarboi.com ~

করবার ধরন একেবারেই নিজস্ব। তার সঙ্গে আমার বহুদিনের যোগাযোগ ছিল, সাহিত্য নিয়ে অনেক আড্ডা হয়েছে। তবে তিনি খুব ভেতর গোটানো মানুষ ছিলেন। কথা বলতেন কম, একাকী থাকতেন।

অলাত এহ্সান : আরেক অকাল প্রয়াত কায়েস আহমেদ-এর সঙ্গেও তো আপনার যোগাযোগ ছিল।

শাহাদুজ্জামান : ইলিয়াস ভাইয়ের বাসায় কায়েস আহমেদের সাথে আমার দেখা হতো, গল্প হতো। তবে তার সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তিনি পরে আত্মহত্যা করলেন। যেদিন আত্মহত্যার খবর এল আমি সেদিন ইলিয়াস ভাইয়ের বাসায়। ইলিয়াস ভাই ডেডবডি দেখতে গেলেন। আমি যাইনি।

অলাত এহ্সান : আখতারুজ্জামান ইলিয়াস আপনার, মামুন হুসাইনের সাহিত্য নিয়ে কথা বলেছেন। এখন অগ্রজদের কাউকে কম দেখি নির্মোহ থেকে অনুজের সাহিত্য নিয়ে কথা বলতে। আপনাদের সময়ে অগ্রজ-অনুজের মধ্যে স্নেহ-শ্রদ্ধার সেতু ছিল। এখন তা ভেঙে গেছে।

শাহাদুজ্জামান : ইলিয়াস ভাই আমাকে লেখার ব্যাপারে খুবই অনুপ্রাণিত করতেন, সবসময়। কোথাও ছাপাবার আগে আমার প্রথম গল্পগুলো আমি তাকে দেখাতাম। গল্প নিয়ে নানারকম পরামর্শ করতাম তার সঙ্গে। সাহিত্য পৃথিবীতে ইলিয়াস ভাইয়ের মতো এমন আশ্চর্য নিরহঙ্কার মানুষ চোখে পড়েনি। এছাড়া মনে আছে আমার প্রথম কি দ্বিতীয় গল্প 'অগল্প' যখন প্রকাশ হলো, তখন গল্পটা পড়ে সৈয়দ শামসুল হক 'সংবাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত তার 'হৃদকলমের টানে' কলামে বেশ লম্বা আলোচনা করেছিলেন। আমি তখন একেবারেই অখ্যাত এক লেখক। তার সঙ্গে আমার পরিচয়ও নেই। কিন্তু স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তিনি এই গল্পটার প্রশংসা করেছিলেন। সেটা আমার জন্য সেই সময় খুবই অনুপ্রেরণার ব্যাপার ছিল।

অগ্রজ-অনুজের মধ্যে স্নেহ-শ্রদ্ধার সেতু ভেঙে গেছে–ব্যাপারটা একেবারে সাধারণীকরণ হয়তো করা যাবে না, তবে কিছুটা সত্য। আজকাল অনুভব করি, অগ্রজ-অনুজ নানা দিকেই নানা রকম ইগোর ফোলানো বেলুন। নানা রকম গোষ্ঠী প্রবণতা। এসব আগেও যে ছিল না তা নয়। তবে তার তীব্রতা বেড়েছে বলে মনে হয়। অনেক ক্ষেত্রে কোনো কোনো অনুজ লেখকদের ভেতর স্বীকৃতি পাওয়ার এক আগ্রাসী প্রবণতাও লক্ষ করেছি। সেই স্বীকৃতি পাওয়ার বাহন হিসেবে অগ্রজদের ব্যবহার করার প্রবণতাও দেখেছি। অগ্রজের দিক থেকেও অনুজদের ব্যবহার করার ব্যাপার হয়তো আছে। এইসব আগ্রাসী প্রচারের কালে অগ্রজ-অনুজের সম্পর্কের উষ্ণতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা রাখা কঠিন হয়ে পড়ে অনেক সময়। আমি

~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তিগতভাবে তরুণ লেখক-লেখিকাদের ব্যাপারে সবসময় আগ্রহী। যেখানে মেধার পরিচয় পাই, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করি।

অলাত এহ্সান : চট্টগ্রামে থাকাকালে আপনি চলচ্চিত্র আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন। সে সময় চার্লি চ্যাপলিনকে নিয়ে একটা লেখা পরবর্তীতে বই হয়েছে। চলচ্চিত্র দেখা ও বুঝা কি আপনার গল্পকে প্রভাবিত করেছে?

শাহাদুজ্জামান : হ্যাঁ, চলচ্চিত্র তো আমার সবসময়ের প্যাশন। একসময় সক্রিয় ছিলাম চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনে। চলচ্চিত্র নির্মাণে যুক্ত ছিলাম। একসময় টিভিতে চলচ্চিত্রের নন্দনতত্ত্ব নিয়ে অনুষ্ঠান করেছি। চলচ্চিত্র নিয়ে লেখালেখি তো করেছিই। চলচ্চিত্রের স্ক্রিপ্ট লিখেছি। আমার গল্প নিয়ে বেশ কিছু চলচ্চিত্র হয়েছে। চলচ্চিত্র আর সাহিত্য দুটো ভিন্ন ভাষাভঙ্গির শিল্প, তবে এর ভেতরকার একটা সম্পর্ক তো আছেই। আমার গল্পে ইমেজের ব্যাপার থাকে। আমি যখন গল্প লিখি তখন তার দৃশ্যরূপটা আমার চোখের নিচে ফুটে থাকে। অনেক পাঠকই বলেছেন– আমার গল্প পড়তে পড়তে তারা গল্পটাকে দেখতে পান। এটা সম্ভবত আমার চলচ্চিত্র চর্চা থেকেই হয়েছে। গল্প বলার যে ন্যারেটিভ ভঙ্গি অনেক চলচ্চিত্রকার সেটাকে ভেঙেছেন, সেসব চলচ্চিত্র আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। তারকোভস্কির চলচ্চিত্রে কাব্যিকতা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। ইরানি চলচ্চিত্রের আটপৌরে ঢঙে গল্প বলা কিংবা সত্যজিৎ, মৃণাল, ঋত্বিক, আমাদের জহির রায়হানের চলচ্চিত্রের বর্ণনাভঙ্গি থেকেও অনুপ্রাণিত হয়েছি। চ্যাপলিনের চলচ্চিত্র আমাকে বরাবর মুগ্ধ করে। লেখার সময় চেতনে-অবচেতনে এদের প্রভাব হয়তো থাকে।

অলাত এহ্সান : তবে অনেক বড় লেখকই বলেন, ভালো সাহিত্য চলচ্চিত্রায়ন করলে অনেক সময় তার স্বাদ হারিয়ে যায়।

শাহাদুজ্জামান : চলচ্চিত্রের সীমাবদ্ধতা হচ্ছে– তা দর্শকের নিজস্ব কল্পনার মাত্রা সীমিত করে। একটা উপন্যাস পড়ে পাঠক-পাঠিকা নিজের মতো করে এর চরিত্র, দৃশ্যপট ভেবে নিতে পারেন, কিন্তু চলচ্চিত্র তাকে সে সুযোগ দেয় না। সে নিজেই নির্ধারিত দৃশ্যপট, চরিত্র নিয়ে হাজির হয়। বুদ্ধদেব বসু এ কারণে চলচ্চিত্রকে সাহিত্যের নিচে স্থান দিতেন। মার্কেজ তার 'হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচুড'কে চলচ্চিত্রায়নের অনুমতি দেননি। তিনি উপন্যাসটি নিয়ে পাঠক-পাঠিকার নিজস্ব জগৎকে তার মতো অটুট রাখতে চেয়েছেন।

অলাত এহ্সান : আপনি মঞ্চেও আগ্রহী ছিলেন। আপনার 'ক্রাচের কর্নেল' উপন্যাসটি নিয়ে মঞ্চ নাটক হয়েছে। আপনি দেখেছেন?

~ www.amarboi.com ~

শাহাদুজ্জামান : হ্যাঁ, চট্টগ্রামে গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। আশি-নব্বই দশকে ঢাকার মঞ্চের এমন কোনো নাটক সম্ভবত নেই, যা আমি দেখিনি। নাটক দেখার জন্য কলকাতা চলে গেছি নিয়মিত। চট্টগ্রামের অঙ্গন থিয়েটারে অভিনয়ও করেছি। নাটক নিয়ে লেখালেখি করেছি। আমার 'ইব্রাহিম বক্সের সার্কাস' এবং 'ক্রাচের কর্নেল' অবলম্বনে নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। বটতলা প্রযোজিত 'ক্রাচের কর্নেল' নাটকের ঢাকা এবং পশ্চিমবঙ্গে অনেকগুলো মঞ্চায়ন হয়েছে, এখনও চলছে। এই বই যখন লিখেছি তখন এ থেকে নাটক হতে পারে ভাবিনি। অনেক বড় ক্যানভাসের উপন্যাস, একে মঞ্চে আনা সাহসের ব্যাপার। কিন্তু তারা তা সফলভাবেই এনেছেন মনে করি।

অলাত এহ্সান : চলচ্চিত্রকে বলা হয়, শিল্পের সব মাধ্যমের সমন্বয়। মানে শব্দ, সুর, টেক্স, ইমেজ-এর ব্যবহার থাকে। চলচ্চিত্র এখন বিশ্বের শক্তিশালী শিল্পমাধ্যম। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পাঠিকারা এখন সিনেমা, টিভি সিরিয়ালের পোকা। এখানে সাহিত্য অবস্থান হারাচ্ছে। বলে কি আপনার মনে হয়?

শাহাদুজ্জামান : চলচ্চিত্রের বয়স তো একশ বছরেরও উপর, তাতে সে তো এতদিনেও সাহিত্যের জায়গা দখল করে নেয়নি। টেলিভিশন যখন এসেছিল তখন ভাবা হয়েছিল চলচ্চিত্রের বুঝি মৃত্যু হলো, কিন্তু তারা বহাল তবিয়তে আছে। চলচ্চিত্র না, বরং কম্পিউটারের সূত্রে নানা অনলাইন বিনোদনের কারণে সাহিত্যের অবস্থানে বেশ একটা ধাক্কা এসেছে সন্দেহ নাই। তবে সাহিত্যের মৃত্যু খুব সহসা হচ্ছে বলে মনে হয় না।

অলাত এহ্সান : আপনার একাধিক গল্প থেকে স্বল্পদৈর্ঘ চলচ্চিত্র হয়েছে। মঞ্চ নাটকও হলো। এগুলো নিয়ে আপনার মূল্যায়ন কী?

শাহাদুজ্জামান : আমার গল্প অবলম্বনে এবং চিত্রনাট্যে 'কমলা রকেট' হয়েছে সেটা পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, এছাড়া আমার গল্প নিয়ে বেশ কিছু শর্ট ফিল্ম হয়েছে। 'কমলা রকেট' সিনেমায় চলচ্চিত্র ভাষার ভালো প্রয়োগ আছে বলে মনে করি। রবিউল রবি আমার 'ঠাকুরের সঙ্গে' গল্পটা নিয়ে 'একই পথে' নামে যে ছবিটা বানিয়েছে সেটাও আমার পছন্দ হয়েছে। প্রজন্ম টকিজের ব্যানারে সেই ছবি তো ইউটিউবে প্রচুর ভিউ হয়েছে। তবে আমার গল্প নিয়ে আরো যে বেশ কিছু টেলিফিল্ম হয়েছে সেগুলো আমার পছন্দ হয়নি বিশেষ।

অলাত এহ্সান : আপনার সাহিত্যে রাজনীতি উপস্থিত মানে আপনি নিরপেক্ষ নন। এখন অনেকে রাজনীতি থেকে দূরে থাকাকে সমর্থন করেন। আপনার ব্যাখ্যা কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শাহাদুজ্জামান : নিরপেক্ষ থাকার ভাবনা একটা মায়া। রাজনীতি থেকে দূরে তো কেউ থাকে না, থাকতে পারে না। কেউ মনে মনে ভেবে আনন্দ পেতে পারে যে- সে রাজনীতির সাতে-পাঁচে নাই, কিন্তু সত্য কথাটা হচ্ছে রাজনীতি ছাড়া হাঁড়ির ভাতও রান্না হয় না। অবশ্য রাজনীতি বলতে আপনি কী বুঝেছেন সেটা পরিষ্কার হওয়া দরকার। আমি কোনো দলীয় রাজনীতির কথা বলছি না। রাজনীতির সংজ্ঞাটাকে টেনে লম্বা করলে এর ভেতর সবকিছুই পড়ে। সমাজ, রাষ্ট্র নিয়ে লেখকের তো একটা দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে, না হলে সে লিখবে কী করে? সেই দৃষ্টিভঙ্গিই রাজনীতি।

অলাত এহ্সান : আমাদের দেশের লেখকদের রাজনৈতিক দর্শন চর্চার চেয়ে দলীয় চর্চার প্রবণতা বেশি। তথাকথিত 'তৃতীয় বিশ্বে' এটা বেশি প্রবল। অনেকে মনে করেন, এটা সাহিত্যের জন্য ক্ষতি ঘনিয়ে এনেছে।

শাহাদুজ্জামান : দলীয় রাজনীতি লেখকের জন্য অবশ্যই ক্ষতিকর। লেখককে এমন জায়গায় দাঁড়াতে হয়, যেখান থেকে অবাধে সে কোনো কথা বলতে পারার ক্ষমতা রাখে। দলের ভেতর থাকলে তো সেই স্বাধীনতা থাকবার কোনো উপায় নেই। একসময় বাম দলগুলো লেখক শিল্পীকে দলীয় কাঠামোর ভেতর আনতে বাধ্য করতে চাইত। এ নিয়ে বাম রাজনৈতিক দল আর লেখক শিল্পীদের ব্যাপক বিরোধ হয়েছে।

অলাত এহ্সান : আপনাদের লেখালেখির সূচনাকালে; তখন বিস্তর সোভিয়েত-রুশ সাহিত্য অনুবাদ পাওয়া যেত। অনেকে মনে করেন, এই সাহিত্যগুলো ওই সময়ের সাহিত্য মানসে বড় প্রভাব রেখেছিল।

শাহাদুজ্জামান : তা ঠিক। আমাদের শৈশব-কৈশোর কেটেছে রুশ সাহিত্যের বাংলা অনুবাদ পড়ে। তখন সেসব বই বিনামূল্যে বিতরণ করা হতো। রুশদেশের উপকথা কৈশোরে আমার নিত্যসঙ্গী ছিল। পরবর্তীকালে ননী ভৌমিকের অনুবাদে লিও তলস্তয়, আন্তন চেখভ, ম্যাক্সিম গোর্কি, ইভান তুর্গেনেভ, ফিওদর দস্তোয়েভস্কির লেখা সব বাংলায় পড়েছি বুঁদ হয়ে। রুশ সাহিত্যের নানা চরিত্র, রাশিয়ার ল্যান্ডস্কেপ আমার মাথার ভেতর গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। এই সাহিত্যগুলো আমার সাহিত্য মানসে যে বড় প্রভাব ফেলেছে তাতে সন্দেহ নাই।

অলাত এহ্সান : আপনি লিখতে শুরু করেছিলেন লিটল ম্যাগাজিনে। তারপর আপনি কয়েকজনের সঙ্গে 'প্রসঙ্গ' নামে ম্যাগ প্রকাশ করেছিলেন। সে সময় চট্টগ্রামসহ কয়েকটি জায়গা থেকে ভালো লিটল ম্যাগ প্রকাশ হতো। এর মধ্যে কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীরের 'কথা' পত্রিকাও আছে। এ সময় আর কী কী ছিল?

~ www.amarboi.com ~

শাহাদুজ্জামান : সেই আশির দশকে সাহিত্যচর্চায় লিটল ম্যাগাজিনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সেই অর্থে প্রতিষ্ঠিত বিশেষ কোনো সাহিত্য পত্রিকা তখন ছিল না। দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য পাতার পরিসর ছিল কম। ফলে অনেক নতুন লেখক, নতুন চিন্তার বাহন ছিল লিটল ম্যাগাজিন। সেসব লিটল ম্যাগাজিনের আয়ুও হয়তো বেশি ছিল না। তবু সেখানে অনেক নবীন লেখকদের ভালোবাসা, শ্রম জড়িয়ে থাকত। নিজেদের মতো নানা সাহিত্যিক নিরীক্ষা সেখানে করা যেত। আমার জীবনের প্রথম লেখা ছাপা হয়েছে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত একটা লিটল ম্যাগাজিনে। 'প্রসঙ্গ' করবার আগে আমি জড়িত ছিলাম 'চর্যা' নামে আরেকটা লিটল ম্যাগাজিনের সাথে। নিজের নাম প্রথম ছাপা অক্ষরে দেখি ওখানেই। এরপর আমরা চট্টগ্রামের কয়েকজন মিলে 'প্রসঙ্গ' নামে একটা লিটল ম্যাগাজিন করি। আমরা তখন অনুভব করতাম যে, নানা শিল্পমাধ্যমের ভেতর পারস্পরিক যোগাযোগ দরকার। পেইন্টারদের ফিল্ম সম্পর্কে জানা দরকার, তেমনি সাহিত্যিকদের পেইন্টিং বিষয়ে জানা দরকার। এরকম একটা ভাবনা থেকে আমরা 'প্রসঙ্গ' নামে একটা মাল্টিডিসিপ্লিনারি পত্রিকার কথা ভাবি। প্রতি সংখ্যায় আমরা সাহিত্য, নাটক, সংগীত, চলচ্চিত্র, চিত্রকলা বিষয়ক একটা করে তাত্ত্বিক নিবন্ধ ছাপাতাম। এ ধরনের কোনো পত্রিকা তখন বাংলাদেশে ছিল না। বেশ প্রশংসিত হয়েছিল সে পত্রিকা। পাঁচটা সংখ্যা প্রকাশ হয়েছিল। এ বছর নতুন করে প্রসঙ্গ পত্রিকাগুলো রিপ্রিন্ট করছে 'নোকতা' নামে একটি প্রকাশনা। সেসময় চট্টগ্রাম থেকে আরো কিছু লিটন ম্যাগাজিন বের হতো লিরিক, স্পার্ক জেনারেশন, লিটল ম্যাগাজিন নামেও একটা পত্রিকা বের করতেন মহিবুল আজিজ। জাহাঙ্গীর 'কথা' বের করেছে অনেক পরে।

অলাত এহ্সান : এখন দেশে অনেক লিটলম্যাগ প্রকাশ হয়। তাদের মান ও লিপ্ততা নিয়ে কথা বলা যায়। এদের নিয়ে আপনার মূল্যায়ন কী?

শাহাদুজ্জামান : এখনও লিটল ম্যাগাজিন নতুন লেখকদের বিকল্প একটা পাটাতন। কিংবা পুরনো লেখকরাও তাদের নতুন ভাবনা লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশ করেন। কিন্তু লিটল ম্যাগাজিনের সেই আগের ভূমিকা এখন সম্ভবত নেই। বিশেষ করে ওয়েব পত্রিকার সুযোগ তৈরি হবার পর বিকল্প সাহিত্য চর্চার ব্যাপক পরিসর তৈরি হয়েছে। সেখানে ছাপার অক্ষরের লিটন ম্যাগাজিনের সেই আগের ভূমিকা আর আছে বলে মনে হয় না।

অলাত এহ্সান : বিশ্বেই কিন্তু এখন লিটল ম্যাগ চর্চা কমে গেছে। ষাটের দশকের সেই ঢেউ এখন স্তিমিত। এখন তারা সাহিত্যের একটা স্রোত তৈরিতে ভূমিকা রাখছে? এখান থেকে কি লেখক তৈরি হচ্ছে বলে মনে করেন?

~ www.amarboi.com ~

শাহাদুজ্জামান : ওয়েব ম্যাগের কারণে সাহিত্যে নতুন স্রোত তৈরির ক্ষেত্রে লিটল ম্যাগাজিনের ভূমিকা কমে এসেছে। তবু বেশ কিছু লিটন ম্যাগাজিন নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে দেখতে পাই। এখনও বইয়ের দোকানে গেলে আমি আগে লিটন ম্যাগাজিনের কর্নারে যাই। লিটল ম্যাগাজিনের উদ্যোগে ভালো কিছু বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ হয়েছে দেখেছি। সেখান থেকে লেখক তৈরি হচ্ছে কিনা সেটা বলা কঠিন, তবে নবীন লেখকদের জন্য লিটল ম্যাগাজিন এখনও একটা বিকল্প পাটাতন।

অলাত এহ্সান : এখন ওয়েব ম্যাগ, ওয়েবজিন তৈরি হচ্ছে। ব্লগ তো এখনও আছে।

শাহাদুজ্জামান : গত দশ-পনেরো বছরে অনলাইন জগৎ মানুষের চিন্তা, জীবনযাপনের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। যেটা বলেছিলাম আগে লিটল ম্যাগাজিন অবাধ চিন্তা প্রকাশের যে কাজটা করত এখন সে জায়গাটা নিয়েছে অনলাইন পত্রিকা বা ব্লগগুলো। প্রকাশের এই গণতন্ত্রায়নের তো একটা ব্যাপক ইতিবাচক ভূমিকা আছে। পৃথিবীজুড়ে বেশ বড় বড় আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে এখন অনলাইনের মাধ্যমে, ব্লগের মাধ্যমে, নতুন ভাবনা তৈরির মাধ্যমে। আমাদের শাহবাগ আন্দোলন অনেকটাই অনলাইন এক্টিভিজমের ফল। তবে স্বাধীনতা মানে তো আর সবসময় উৎকর্ষ না, স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারও জন্ম দিতে পারে। এই অবাধ স্বাধীনতা আমি কীভাবে ব্যবহার করছি সে প্রশ্ন সবসময় প্রাসঙ্গিক থাকবে। মেধা না থাকলে শুধু অবাধ প্রকাশের সুযোগ দিয়ে তো কাজ হবে না। আগে একটা লেখাকে পাবলিক পরিসরে আসবার জন্য নানা মনিটরিংয়ের হাত ঘুরে আসতে হতো। এখন এই স্বাধীনতার সুযোগে অনেক নিম্নমানের লেখাও দেখতে পাই। লেখার এই সহজ প্রকাশ এক ধরনের ছদ্ম আত্মতৃপ্তি তৈরি করতে পারে। ওয়েবে একটা লেখার লাইক, শেয়ার ইত্যাদির হিসাব দিয়ে তো আর লেখার মান বিচার হবে না। নতুন লেখা সেটা পত্রিকা, বইয়ে আর ওয়েব ম্যাগাজিন যেখানেই প্রকাশ পাক না কেন তাকে সাহিত্যের পরম্পরার ইতিহাসে দাঁড়িয়েই নিজেকে যাচাই করে নিতে হবে।

অলাত এহ্সান : নানাভাবেই আমরা বলি– বাংলা সাহিত্যের কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি নেই। বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে আপনার কী মূল্যায়ন?

শাহাদুজ্জামান : সাহিত্যের অগ্রগতির মাপকাঠি তো খুব সহজ না। আর বিশ্বসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে সে মাপামাপি আরো কঠিন। সেখানে প্রথম প্রশ্নই জাগে ভাষা নিয়ে। আমার ভাষার লেখা যদি অন্য ভাষায় অনূদিত না হয় তাহলে

~ www.amarboi.com ~

সেই তুলনামূলক বিচার অন্যেরা করবে কী করে। কিন্তু বিশ্বসাহিত্য পাঠ থেকে এটুকু বুঝি– বাংলা সাহিত্যে বিশ্বমানের বহু লেখক, কবি রয়েছেন। অনুবাদের মাধ্যমে আমাদের সাহিত্য বিশ্ব পাঠকের কাছে পৌঁছালে ভালো। কিন্তু আমি মনে করি আমার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত আগে আমার নিজের ভাষার পাঠক-পাঠিকার কাছে পৌঁছানো।

অলাত এহ্সান : এই সময়ে দেশে যে অনুবাদ হচ্ছে, তা কি সাহিত্যের গুণগতমান পরিবর্তন করবে?

শাহাদুজ্জামান : অনুবাদ পরিশ্রম এবং মেধার কাজ। বিশ্বচিন্তা, বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য অনুবাদ জরুরি। একটা ভালো লেখা অন্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য কিংবা সে লেখাটাকে আরো নিংড়ে বোঝার জন্য একসময় অনুবাদ করেছি। নিজের মৌলিক লেখার চাপ যখন বেড়েছে তখন অনুবাদ কমিয়ে দিয়েছি। তবু অনুবাদ সাহিত্য চালু রাখা জরুরি। আমাদের দেশে ভালো অনুবাদের উদাহরণ আছে। তারা সংখ্যায় খুব কম। আবার যারা বাংলা থেকে ইংরেজি করেন তারা যেন যারা ইংরেজি থেকে বাংলা করেন তাদের চেয়ে বেশি মর্যাদা পান। এই প্রবণতার বদল দরকার। বিশ্বসাহিত্যের কোনো বিখ্যাত বই তাড়িঘড়ি করে বাজেভাবে অনুবাদের অনেক নমুনা আছে। সেগুলো অত্যন্ত অন্যায়। এ ধরনের অনুবাদের মাধ্যমে মূল লেখককে অপমান করা হয়।

অলাত এহ্সান : এখন একটা মারাত্মক প্রবণতা শুরু হয়েছে, এ দেশের সাহিত্য অন্যভাষায় অনুবাদ করে বিদেশে সরবরাহ করা। এরা কিন্তু মানোত্তীর্ণ সাহিত্য অনুবাদ করছেন না। বিদেশি প্রকাশনী আগ্রহ না দেখালেও গাঁটের পয়সা খরচ করে অনুবাদ করা হচ্ছে। যখন স্বীকার করে নিচ্ছি, আমরা সাহিত্যের নিস্ত রঙ্গ সময় পার করছি, তখন এই উদ্যোগ কী ফল বয়ে আনবে বলে আপনি মনে করেন?

শাহাদুজ্জামান : কোন বাংলা বই ভিন্ন ভাষায় অনূদিত হবে, কিংবা ভিন্ন ভাষার কোন বই বাংলায় অনুবাদ করা দরকার সেটা একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা, গবেষণার মাধ্যমে না করে এইসব কাণ্ডকারখানা করলে সাহিত্যের ক্ষতি ছাড়া লাভের কিছু নাই।

অলাত এহ্সান : পুরস্কার নিয়ে বেশি কথা নয়, একটা প্রশ্ন: পুরস্কারগুলো আমাদের দেশের সাহিত্যে কোনো অবদান রাখছে কী?

শাহাদুজ্জামান : এখন তো বিবিধ পুরস্কারের চল হয়েছে দেখি। পুরস্কার তো কাজের একধরনের স্বীকৃতি, তার একটা ইতিবাচক ব্যাপার আছে। একটা

~ www.amarboi.com ~
নিরপেক্ষ মর্যাদাবান পুরস্কার লেখককে অনুপ্রেরণা দিতে পারে; কিন্তু পুরস্কার যদি নানারকম গোষ্ঠী রক্ষা, গোষ্ঠী তৈরির বাহন হয় সেগুলোর তো কোনো মূল্য নাই।

অলাত এহ্সান : আপনাকে মনে হয় প্রতিবছরই দেশে যেতে হয়, অন্তত একবার। সচরাচর এই দেশে যাওয়াকে বলছেন 'দেশে ফেরা'। জীবননান্দ দাশ বলছেন, 'সব পাখি ঘরে ফেরে'। আপনার কাছে কী– ঘরে আসা, না ঘরে ফেরা?

শাহাদুজ্জামান : আমার শরীরটা প্রবাসে থাকলেও মননে, আবেগে আমি তো বরাবর দেশেই থাকি। একবার না, আমি বছরে একাধিকবার দেশে আসি; বা বলতে পারেন দেশে ফিরি হয়তো ওই পাখির মতো। দেশে না ফিরলে বিদেশেও উড়বার শক্তি পাই না। সেই শক্তি সঞ্চয় করতেই নিয়মিত দেশে আসি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কথা-দুই

[এই কথোপকথন হয়েছে ইলিয়াস কামাল রিসাতের সাথে। রিসাত কথাসাহিত্য চর্চা করেন। এই কথপোকথন ছাপা হয়েছে অনলাইন পত্রিকা 'তীরন্দাজে' ২০১৯ সালে। রিসাত এই আলাপে বেশ কিছু দার্শনিক বিষয়ের আবতারণা করেছেন। আমার লেখার প্রাথমিক পর্ব থেকে শুরু করে আমার বিশ্বাস ভাবনার বিবর্তন, জীবনের নানা বিষয়ে আমার কৌতূহল ইত্যাদি বিষয়ে জানতে চেয়েছেন। জানতে চেয়েছেন পাঠক বিষয়ে আমার ভাবনা, লেখকদের গোষ্ঠীবদ্ধতা, সমালোচনা সাহিত্য, সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্র, নৃবিজ্ঞানের সাথে সাহিত্যের সম্পর্ক, জলবায়ু পরিবর্তন, নন্দনতত্ত্ব, লেখার প্রেরণা, হুমায়ূন আহমদের লেখা, তরুণ লেখকদের লেখা ইত্যাদি বিষয়েও।]

রিসাত : একটু হালকা করেই বলি– আপনি লেখালেখি না করলে পাঠকদের কি ক্ষতি হতো বলে মনে করেন? প্রশ্নটা আপনার লেখক পরিচয়ের সার্বভৌমত্বে হানা দিতে পারে, তাও সম্প্রতি আপনার 'মামলার সাক্ষী ময়না পাখি'র প্রথম গল্প 'জনৈক স্তন্যপায়ী প্রাণী, যিনি গল্প লেখেন' পড়ে মনে হলো আপনি আপনার লেখক জীবনের এই পর্যায়ে এসে আপনার লেখার জগৎ ও এর জন্য উপযোগী পাঠককুলের সন্ধান পেয়ে গেছেন। অনেকটা Inclusion/ exclusion criteria 'র মতো।

শাহাদুজ্জামান : প্রথমেই বলি পাঠক পাঠিকার লাভ ক্ষতি বিবেচনা করে তো কোনদিন লিখিনি। লিখি আসলে নিজেকে বাঁচাতে। জীবন, জীবিকা, মন, শরীর সব নিয়ে এই বেঁচে থাকার যাত্রাটা তো খুব সহজ না। লিখে আমি আমার এই বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজি। প্রতিবার লেখা শেষে আমি বেঁচে উঠি। লিখতে লিখতে আমি আমার ভেতরের প্রশ্ন, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব এসবকে মোকাবেলা করি। লেখা আমার কাছে ক্যাথেরসিসের মতো। লিখতে লিখতে এক পর্যায়ে দেখেছি অনেক পাঠক পাঠিকাও আমার এই বেঁচে থাকার যাত্রার সঙ্গী হয়েছেন। আমি না লিখলেও তাদের ক্ষতি হতো না, তারা হয়তো অন্য কারো সঙ্গী হতেন। আসল কথা কারো জন্যই পৃথিবীর কোনকিছু থেমে থাকে না। আমি না লিখলেও পৃথিবীর কোনো

~ www.amarboi.com ~

ক্ষতিবৃদ্ধি হতো না। তিন দশক আগে লেখা শুরু করেছি কিন্তু এই ২০১৯ এসেও এমন পাঠকের সন্ধান পেয়েছি যিনি আমার লেখা প্রথম পড়ছেন। ফলে আমার পাঠক পাঠিকা গোষ্ঠীর ইনক্লুশন, এক্সক্লুশন সব নির্ধারিত হয়ে গেছে সেটা বোধহয় ঠিক না।

রিসাত : আমি আসলে প্রশ্নটা করেছিলাম আপনার 'জনৈক স্তন্যপায়ী..' গল্পের সূত্র ধরে। সেই গল্পে আপনি 'অভিযাত্রী' পাঠকের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা 'নতুন মানচিত্রে পা রাখতে ভয় পায় না। এমন এক মানচিত্র যার নদী, পাহাড়, লোকালয় তাদের অপরিচিত।' অভিযাত্রী পাঠকের বাস্তবতা আমাদের দেশে দুরূহ ব্যাপার। প্রচলিত ধারার গল্প উপন্যাসের বাইরে নিরীক্ষাধর্মী লেখার প্রতি আগ্রহী অভিযাত্রী পাঠক পাওয়া তো কঠিন।

শাহাদুজ্জামান : অভিযাত্রী পাঠক পাঠিকা পাওয়া কঠিন ঠিকই কিন্তু অসম্ভব না। পাঠক পাঠিকাকে আন্ডার এস্টিমেট করার কোনো কারণ নাই। আমি বারবার বলি পাঠক পাঠিকার রুচিকে শুধু ফলো করলে চলে না, রুচি তৈরিও করতে হয়। সেটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। ধৈর্যের ব্যাপার। আমার প্রথম বই 'কয়েকটি বিহবল গল্পের' গল্পগুলো মোটেও প্রচলিত ধারার ছিল না। এসব গল্প কেউ পড়বে কি পড়বে না সেসব নিয়ে আমি ভাবিনি। যারা পড়েছেন তাদের অনেকেই হয়তো এই ধারার গল্প পড়ায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেনি কিন্তু অনেকেই এর নতুন স্বাদ পছন্দ করেছেন। তারা আগ্রহ নিয়ে আমার পরের বইয়ের অপেক্ষা করেছেন। তাদের ভেতর সেই অভিযাত্রী পাঠকের মন জেগে উঠেছে। সাহিত্যের নতুন মানচিত্রে ঢুকবার আগ্রহ তৈরি হয়েছে। এভাবে ধীরে ধীরে দীর্ঘ দিন ধরে আমার একটা পাঠক পাঠিকা গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। পাঠক পাঠিকা নিরীক্ষাধর্মী লেখা পড়ে না, এক তরফাভাবে সেই কথাটা হয়তো সত্য না। তাদেরকে নিজের লেখার দিকে মুখ ফেরাবার জন্য সময় দিতে হয়।

রিসাত : ১৯৯৬ সালে 'কয়েকটা বিহবল গল্প', ১৯৯৯ সালে 'পশ্চিমের মেঘে সোনার সিংহ' । দীর্ঘ বিরতির পর ২০১২ সালে 'কেশের আড়ে পাহাড়'। গল্পের মধ্যে আপনার চিন্তাজগতের একটা সাযুজ্যতা এবং বিবর্তন খোঁজার জন্য এই সময়ের ব্যবধানের বিষয়টা উল্লেখ করলাম। আপনি আগেও বলেছেন বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে, প্রথম বই দুইটির মধ্যে পোস্ট-মার্ক্সিস্ট একটা ক্রিটিক এবং কমিউনিস্ট স্বপ্নভঙ্গের যাবতীয় বিষয় হাজির হয়। কিন্তু ২০১২'র দিকে এসে গল্পগুলোতে সাইকোএনালিটিক, এবং বিশ্বায়িত পৃথিবীতে বিভিন্ন অফ-ট্র্যাক মানুষের নানাবিধ 'দিশেহারা তৎপরতা' দেখা যায়, যেখানে সারভাইভালকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ করে তুলছেন। এই যে একটা এপিস্টেমোলজিক্যাল শিফট

~ www.amarboi.com ~

এটাকে আপনি কীভাবে দেখেন? আপনি প্রথমদিকে আপনার বিষয়কে যে লেন্সে দেখতেন সেই লেন্সটাও বদলেছে ২০১২ সালের গল্পে।

এই ট্রানজিশন নিয়ে যদি কিছু বলতেন। অর্থাৎ আপনার ব্যক্তিগত চিন্তাজগতের দার্শনিক রূপান্তর সম্পর্কে জানতে চাইছি আমি। এটাও বলে রাখি, আপনি ১৯৯৯ ও ২০১২ এর মধ্যে বিদেশে পাড়ি দিয়ে অবস্থানও শুরু করেছেন।

শাহাদুজ্জামান : গল্পের ভেতর চিন্তাজগতের একটা বিবর্তন যে এসেছে সেটা তুমি ঠিকই বলেছ। আমার গল্প লেখার শুরু প্রধানত নব্বই দশকের শুরুর দিকে যখন বিশ্বপরিস্থিতির একটা বড় বাঁক বদল হয়েছে, সমাজতান্ত্রিক ব্লকের পতনের ভেতর দিয়ে। তারুণ্য যে কারো জন্য একটা ফর্মেটিভ সময়, সেই পুরো আশির দশকে আমার তারুণ্য কেটেছে একটা ভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। আমাদের দেশে তখন মিলিটারি শাসন, আমরা তার বিরুদ্ধে লড়ছি। পৃথিবীর দেশে দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বপ্ন নিয়ে তরুণ তরুণীরা আন্দোলন করছে। শিল্প সাহিত্যেও সেই বিপ্লবী ভাবনার চর্চা হচ্ছে। তো আমাদের মনোজগতে এসবের একটা বড় অভিঘাত তো ছিলই। আমি ঠিক সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত ছিলাম না কিন্তু রাজনীতির সাংস্কৃতিক, দার্শনিক দিকটাতে বেশি আগ্রহী ছিলাম। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলাম, লেখালেখি করতাম। লেখালেখি কোনো অরাজনৈতিক কাজ না সেটা খুব ভালো টের পেতাম। মার্ক্সীয় ভাবনা অনুপ্রাণিত করত। কিন্তু নব্বই দশকে আমাদের চোখের সামনে এই বিশ্বপরিস্থিতি বদলে গেল। সমাজতান্ত্রিক বলয়ের পতন ঘটল। এই নতুন বাস্তবতায় পৃথিবীর দিকে, জীবনের দিকে, সংসারের দিকে নতুন করে তাকাতে শুরু করলাম। অনেক চেনা ভাবনাকে প্রশ্ন করতে শুরু করলাম। এইসব প্রশ্ন, দ্বিধাগুলো ধরতেই আমি তখন গল্প লিখতে শুরু করি। আগে আমি প্রবন্ধ লিখতাম মূলত কিন্তু দেখলাম প্রবন্ধ কেবল সিদ্ধান্ত চায়। আমি তো তখন কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারছিলাম না কিম্বা বলা যায় চাচ্ছিলামও না। বরং নিজের ভেতরের প্রশ্নগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে আগ্রহী ছিলাম। গল্পে সেটা সম্ভব। আমার গল্পের চরিত্রগুলো আমার এইসব প্রশ্নগুলোই বয়ে বেড়ায়। তারপর ধরো এরমধ্যে আমার ব্যক্তিগত জীবনেও নানা পরিবর্তন এসেছে। পেশাগত কারণে বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে ঘুরেছি, বিয়ে করেছি, সন্তান হয়েছে, তারপর তুমি যেমন বললে এক পর্যায়ে ইয়োরোপে পড়াশোনা করেছি, কাজের সূত্রে ব্রিটেনে বসবাস শুরু করেছি। তো আমার মনোজগতে এসবের প্রভাব আছেই। আমিই তো আমার লেখার বাহন। আমার সাবজেকটিভিটি তাই জরুরি। আমার ব্যক্তিজীবনের অভিঘাত লেখাতে আসাটা স্বাভাবিক। এইসব নানা অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যাওয়ার কারণে আগে যেমন বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকানোর ঝোঁক ছিল বেশি ধীরে ধীরে মনের ভেতরটার দিকে তাকানোর ঝোঁকও বাড়ল। আমার 'কেশের আড়ে পাহাড়'

~ www.amarboi.com ~

বইটার গল্পের ভেতর সেই বাঁক বদলের চিহ্ন আছে সেটা তুমি ঠিকই বলেছ। জ্ঞানতাত্ত্বিক দিক থেকেও চিন্তার বদল হয়েছে। ইয়োরোপ, যা মডার্নিস্টির পীঠস্থান সেখানে বসবাস করতে করতে মডার্নিস্ট ধারণার ফাঁক ফোকরগুলোও চোখে পড়েছে। মার্ক্স অসামান্য চিন্তক কিন্তু মার্ক্সের ভাবনাও এক ধরনের মডার্নিস্ট প্রজেক্টের অংশ। আমি ক্রমশ পুরাল মডার্নিস্ট নিয়ে যারা ভেবেছেন তাদের চিন্তার ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছি। সেই সূত্র ধরে ডিকলোনাজেশন নিয়ে যারা ভাবছেন তাদের চিন্তা অনেক প্রসঙ্গিক মনে হয়েছে। আমি ক্রমশ আরো বেশি সচেতন হয়েছি যে আন্তর্জাতিকার প্রেক্ষাপট চিন্তায় রাখলেও ভাবনায় স্থানিকতা খুব জরুরি। বলতে পারো এই যে বইয়ের নাম দিচ্ছি 'কেশের আড়ে পাহাড়' যা লালনের গান বা 'মামলার সাক্ষী ময়না পাখি' যা একটা পুঁথি ইত্যাদি আমার ঐ স্থানিকতার ভাবনা থেকে এসেছে। চিন্তার এই বিবর্তনকে আমি সক্রিয়ভাবে বেঁচে থাকার শর্ত বলে মনে করি। চিন্তার এই বিবর্তন মানে তো এই না যে আমার আগের চিন্তাকে একেবারে বাতিলের খাতায় রেখে দিচ্ছি। এক চিন্তার উপর দাঁড়িয়েই তো আমি পরের চিন্তায় যাচ্ছি। কোনটা চূড়ান্ত সত্য সেটা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে সত্য খোঁজার চিন্তাটা আমার কাছে জরুরি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো একটা উপন্যাসের চরিত্র বলে– 'জীবনের মূল সত্য কি আমার কখনো তা জানব না তবু আমাদের জীবনের মূল সত্য খুঁজতে হবে, এটাই হচ্ছে জীবনের মূল সত্য।' কথাটা সেই নবীন কিশোর বয়সে পড়েছিলাম কিন্তু মনে গেঁথে আছে এখনও।

রিসাত : বাংলাদেশের লেখকগোষ্ঠীর কিছু প্রসংগ আনতে চাই। খোলা চোখে দেখি, আমাদের লেখক 'গোষ্ঠী' এক ধরনের কৌম আনুষ্ঠানিকতায় বেশ ব্যস্ত থাকেন। ফেসবুক কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আসার পরে বিষয়টা আরো পরিষ্কারভাবেই চোখে পড়ে। এক ধরনের দলাদলি প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এই ধরনের কোনো তৎপরতায় আপনাকে দেখেছি বলে আমার মনে পড়ে না কিংবা আপনার বিভিন্ন সাক্ষাৎকারেও এসবের প্রতি একটা তির্যক মনোভাব লক্ষ করি। এর পেছনের কারণ সম্পর্কে জানতে চাই। এটা কি আপনি যে সমস্ত লেখকদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন (যেমন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, শহীদুল জহির) তাদের প্রভাব নাকি নিজের একটা বোধ/দর্শন থেকে এই ধরনের আনুষ্ঠানিকতা থেকে দূরে থাকেন?

এই বিষয়ের সাথে সম্পর্ক রেখে নতুন যারা লিখছে তাদের জন্য আপনার কিছু বলার আছে কিনা জানতে চাই।

শাহাদুজ্জামান : সাহিত্য যারা করতে আসে তারা তো একরকম দল ছুট মানুষ। ফলে এই দলছুট মানুষেরা একসাথে বসে নিজেদের সুখ দুঃখের কথা বলতে

~ www.amarboi.com ~

ভালোবাসে। সেটা ঠিক আছে। এই গোষ্ঠীবদ্ধতার ভেতর একটা স্বাভাবিকতা আছে। কিন্তু এ ব্যাপারটাই যখন দলবাজিতে পরিণত হয় তখন সেটা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই দলাদলি অবশ্য কালে কালে ছিল, এখনও আছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমার সুহৃদ আছে, সমমনা মানুষ আছে কিন্তু এই যে জোট বেঁধে একে অন্যের সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করা, নিজেদেরকে সাহিত্যের প্রধান প্রতিনিধি ভাবা, অন্য দলের লেখকদের ধূলিস্যাৎ করা এসবে সত্যিই আমার রুচি নাই। আমার সাহিত্যের সাথে যুক্ত হবার পথ এবং প্রণোদনাটা ঐ ধারার না। তুমি যাদের কথা বললে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বা শহীদুল জহির এদের ভেতর এসব দলাদলির প্রবণতার ছিটে ফোঁটাও কখনো দেখিনি। তারা এসব যাকে তুমি বললে 'কৌম আনুষ্ঠানিকতা' সেগুলো এড়িয়ে চলতেন। আমার মনে হয় যারা খুব দল পাকিয়ে চলে তাদের ভেতর হয়তো লেখক হিসেবে একটা 'স্টাটাস এ্যাংজাইটি' থাকে। তারা ঠিক নিশ্চিত হতে পারে না সাহিত্যে তাদের অবস্থান ঠিক কোথায় কিংবা অবস্থানের নড়চড় হচ্ছে কিনা। ফলে তাদের খুব কাছে সবসময় কাউকে লাগে যারা তাকে প্রতিনিয়ত এই নিশ্চয়তা দেবে যে তুমি খুব বড় লেখক। গোষ্ঠীবদ্ধভাবে থাকলে এক ধরনের কমফোর্ট জোনের ভেতর থাকা যায়। ইংরেজিতে একটা কথা আছে 'সেফটি ইন নাম্বারস', দল সংখ্যার ঐ নিরাপত্তা দেয়। ইলিয়াস ভাই, শহীদুল ভাইকে দেখেছি সাহিত্যিক নিরাপত্তা নিয়ে তাদের কোনো দুশ্চিন্তাই ছিল না। তারা জানতেন যে আল মাহমুদ যাকে বলেছিলেন 'কালের র‍্যাদার টান' তাতে বিচার্য শুধুমাত্র লেখাটাই। তারা কালের গর্ভের কাছে কমিটেড ছিলেন এবং সর্বোচ্চ শ্রম দিয়েছেন লেখাটাকে তৈরি করতে। কোনো কমফোর্ট জোনের ভেতর থেকে আত্মশ্লাঘা নিয়ে সাহিত্য চর্চার কোনো প্রয়োজন তারা বোধ করেননি। ইলিয়াস ভাইয়ের বাসার আড্ডায় সাহিত্যিক যত না থাকত তার চেয়ে সাহিত্যের বাইরের মানুষই বেশি থাকত দেখেছি। শহীদুল জহির তো লোকজনের সাথে কথাই তেমন বলতেন না। তারা দলবল নিয়ে সাহিত্য করতেন না। অথচ তাদের লেখা কেমন দিনে দিনে আরো ইনফ্লুয়েন্সিয়াল হয়ে উঠছে। আমি তাদের এই সাহিত্যিক এ্যাপ্রোচকে সবসময়ই পছন্দ করেছি। আমার নিজের সাহিত্য চর্চায় তার প্রতিফলন আছে। সাহিত্যের আনুষ্ঠানিকতার মূল্য আছে কিন্তু আমার কাছে সেসব প্রধান বিবেচ্য হয় নাই কখনো। কাউকে আমি আমার কোনো বইয়ের ভূমিকা লিখতে বলিনি, আমার কোনো বইয়ের কোনদিন মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান হয়নি, আমি কাউকে কোনদিন আমার বইয়ের আলোচনা লেখবার জন্য অনুরোধ করিনি। আমি সচেতনভাবে তা বাতিল করেছি। তাতে আমার বইয়ের প্রচার, পাঠক পাঠিকা তৈরিতে বিশেষ সমস্যা হয়েছে বলে মনে হয় না।

আমার এই এ্যাপ্রোচই যে সবার জন্য প্রযোজ্য হবে এমন দাবি আমি করি না। অনেক লেখক মনে করতে পারেন পণ্যের মতো বইয়েরও নানারকম প্রচার

~ www.amarboi.com ~
প্রচারণা প্রয়োজন। সেটা যার যার সাহিত্য যাত্রার নিজস্ব পথ। আমি আমার বিশ্বাসটার কথা বললাম। আমার মনে হয় না কর্পোরেট মার্কেটিং পলিসি সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ কাজে দেয়। সেদিন শহিদ কাদরীর এক পুরনো লেখায় পড়ছিলাম তিনি বলছেন তার সময়েও অনেক কবি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করে সেই অনুষ্ঠানের ছবি বিভিন্ন পত্রিকায় অফিসে অফিসে বিলি করতেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সম্পাদকের অফিসে বসে থাকতেন আর অনুরোধ করতেন যেন তার কবিতা পাঠের ছবি পত্রিকায় ছাপানো হয়। তো এইসব বিজ্ঞাপন প্রবণতা সাহিত্যের জগতে সবসময়ে ছিল। লেখালেখি করতে এসে এই নেটওয়ার্কিং, প্রচারণা ইত্যাদিকে অনেকে একটা প্রধান কর্তব্য মনে করেন। সৎ সহিত্যের জন্য সেসব খুব জরুরি কিছু বলে আমার মনে হয় না। আর এখন ফেসবুকের যুগে নিজেকে আড়ালে রাখবার মানসিকতা চর্চা করা তো রীতিমত দুরূহ। একেবারে নগদ লাইক, ফলোয়ার ইত্যাদির স্রোত থেকে এক ধরনের হরমোন বাহিত তৃপ্তির সুযোগ তো আছেই । নানারকম ফেসবুক কেন্দ্রিক দল এবং তাদের নিজস্ব সেলিব্রিটি ইত্যাদির ব্যাপার আছে। যার যার গণ্ডির ভেতর একটা তৃপ্ত সাহিত্যিক জীবন যাপনের যথেষ্ট সুযোগ আছে। আমি ফেস বুকের ব্যবহারিক নানা সুবিধার জায়গাগুলো লক্ষ করি এবং তার সদব্যবহার করার চেষ্টাও করি। কিন্তু সতর্কও থাকি। এসব নানা প্ল্যাটফর্ম সাহিত্যের সহায়ক শক্তি হতে পারে কিন্তু তাতে একটা ফলস ইমেজ তৈরিরও ঝুঁকি থাকে। অন্তরের প্রণোদনার চেয়ে বাহ্যিক প্রণোদনাটা প্রধান হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু সাহিত্যের সংগ্রাম শেষ বিচারে অন্তরের গভীর, নিংড়ানো বোঝাপড়ায়। সে কাজটা করতে হয় নিভৃতে, ধ্যানমগ্ন হয়েই। একজনের লেখার শক্তি সম্ভবত বেশি স্পষ্ট হয় যখন দেখা যায় তার চেনা জানা গণ্ডির নানা স্বার্থ নির্দিষ্ট সম্পর্কের বাইরে একেবারে অচেনা পাঠক পাঠিকার অন্তরে সেই লেখা সত্যিকার অভিঘাত তৈরি করছে। সাহিত্যে সাইলেন্ট মেজরিটিরি শক্তিতে আমি বিশ্বাস করি।

রিসাত : এই সাইলেন্ট মেজরিটির ব্যাপারটা যদি আরকটু খোলাসা করতেন।

শাহাদুজ্জামান : আমি বিশ্বাস করি একটা বড় পাঠক পাঠিকা গোষ্ঠী আছে যারা এই সব সাহিত্যিক ডামাডোলের বাইরে থেকে নীরবে লেখক খুঁজে বেড়ায় যারা তার অন্তর স্পর্শ করতে পারবে, তাকে তাড়িত করতে পারবে। তারা নানা পাবলিক ফোরামে উচ্চবাচ্য করে না। যে লেখক তাদের তাড়িত করে ধীরে ধীরে তারা সেই লেখকের চারপাশে অদৃশ্যভাবে জড়ো হয়। লেখক হিসেবে সেটা টের পাওয়া যায়। এই নীরব পাঠক পাঠিকা গোষ্ঠীকে আমি গুরুত্বপূর্ণ মনে করি।

রিসাত : গল্প ছেড়ে উপন্যাসের আলোচনায় আসতে চাই। যদিও আপনি এসব বিষয়ে অনেক কথা বলেছেন এবং আপনার 'ক্রাচের কর্নেল' ও 'একজন

~ www.amarboi.com ~

কমলালেবু' নিয়ে অনেক ধরনের আলোচনা হয়েছে। আমার সরাসরি একটা প্রশ্ন : চরিত্রনির্ভর এসব ডকুফিকশনের বাইরে আমাদের তথাকথিত যে উপন্যাসের একটা ইমেজ আছে, সেরকম উপন্যাস আপনি লিখেন না কেন?

অবশ্যই এটা আপনার আগ্রহ-অনাগ্রহের ব্যাপার। এবং এ ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনার যে অভিযাত্রী পাঠক তারা ঐ ধরনের উপন্যাসে ডুবতে চায়। এ তৃষ্ণা জন্মেছে আপনার গল্পের গভীরতা থেকে। 'মহাশূন্যে সাইকেল' এর রেজাউল করিমের বিচ্ছিন্নতা 'The unbearable lightness of being' এর থমাসের চেয়েও গভীর মনে হয় মাঝে মধ্যে। আমি আরো জানতে চাই রেজাউল করিম সম্পর্কে।

শাহাদুজ্জামান : আমি তো বহুদিন শুধু প্রবন্ধ লিখেছি। গল্প যে কোনদিন লিখব, বা লিখতে পারব তা ভাবিনি। এক পর্যায়ে মনে হয়েছে কিছু কথা আর প্রবন্ধে বলতে পারছি না তখন গল্প লিখতে শুরু করেছি। কিন্তু তথাকথিত গল্প আমি লিখতে চাইনি। আমার প্রথম লেখা গল্প 'অগল্প'। এটা একটা গল্প না লেখার গল্প। গল্পের তথাকথিত ফর্মকে ভেঙে ফেলেছি সেখানে। আবার একপর্যায়ে মনে হয়েছে কিছু কথা ঠিক গল্পের পরিসরে বলতে পারছি না আরেকটু বড় পরিসর দরকার। আমার প্রথম উপন্যাস লেখার চেষ্টা পারো 'বিসর্গ তে দুঃখ'। এটাতেও তো আঙ্গিক একেবারে ভেঙে দিয়েছি। এক একটা বর্ণমালা দিয়ে তৈরি করেছি এক একটা পর্ব। বাংলা সাহিত্যে এরকম আর দ্বিতীয় কোনো উদাহরণ আছে কিনা আমার জানা নেই। এটা ঠিক উপন্যাস হয়েছে কিনা সেটা অন্য প্রশ্ন। শহীদুল জহির এই বইটার বুক রিভিউয়ে একে বলেছিলেন মেটা ফিকশন। কনটেন্টের মতো ফর্ম আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। আমি এসব বলছি এটা বোঝাতে যে আমি আসলে কখনোই তথাকথিত গল্প উপন্যাস লিখতে চাইনি। আমি আগের লেখকদের লেখার পুনরুৎপাদন করতে চাইনি। কোনো বিশেষ ঘরানার লেখকদের দলে ভিড়তে চাইনি। আমি প্রচুর সময় কাটিয়েছি হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, শহীদুল জহিরের সাথে। তাদের লেখা আদ্যপান্ত পড়েছি কিন্তু তাদের মতো লিখতে চাইনি কখনো। যখনই আমি উপন্যাস লিখতে গেছি অনেকটা ডেলিবারেটলি আমার মন বলেছে পূর্বসূরি যারা লিখেছেন তাদের চেনা পথ ছেড়ে ভিন্ন পথ নেয়া যায় কিনা। কারণ আমার নিজের কথাটা আমি পুরনো পথে বলতে পারছি না। ফলে আমার উপন্যাসগুলো আদৌ উপন্যাস কিনা সেসব নিয়ে বরাবর বিতর্ক হয়েছে। ঠিক তথাকথিত উপন্যাস আমাকে দিয়ে লেখা হবে কিনা জানি না। তবে হ্যাঁ চরিত্রভিত্তিক, ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাস কিছু লেখা হলো। এই ধারার বাইরে হয়তো এবার লিখব। তুমি যেমন বললে রেজাউল করিমের মতো অখ্যাত কাউকে নিয়ে হয়তো লিখব যে নিজের বাসায় ফোন করে নিজেকেই চায় কথা বলবার জন্য।

~ www.amarboi.com ~

রিসাত : বাংলাদেশে বহু-মাধ্যমে লেখালেখি করার মানুষ গুটিকয়েক ছিলেন । তবে আপনার অবস্থানটা আলাদা হবে একেবারেই। কারণ–যদি আমি গুণগত ওজন করি এসব কাজের তবে আমার মনে হয় সব মাধ্যম সমান রিডিং দিবে। আপনার গল্পের যেমন আলাদা পাঠক, প্রবন্ধের তেমনি। আপনি নিজেই বলেছেন আপনার কোনো কাজ পড়েননি কিন্তু শুধু 'ক্রাচের কর্নেল' এর পাঠক আছে এমন সংখ্যাও ব্যাপক। আপনার সাক্ষাৎকার যে কয়েকটা নিয়েছেন, খুব অল্প যদিও, তাও সাড়া জাগানিয়া, ভাবানুবাদ এর মতো সৃষ্টিশীল ট্রেন্ড চালু করেছেন। এত মাধ্যমের লেখক পরিচয়ের পেছনের 'কৌতূহলী মানুষ শাহাদুজ্জামান' সম্পর্কে জানতে চাই। আপনি কি ঐ যুক্তিতেই লিখেছেন যে–'আমাকে এই বিষয়ে কথা বলতে হলে এই ফর্মে লিখতে হবে' নাকি অন্য কোনো বোধ আছে এর পেছনে?

শাহাদুজ্জামান : এটা ঠিক যে আমি বহু মাধ্যমে কাজ করেছি । শুধু বহু মাধ্যমে না, আমি জীবনে বহু বিষয়েই কৌতূহলী হয়েছি। কতরকম বিচিত্র ব্যাপার নিয়ে যে মেতে থেকেছি জীবনের বিভিন্ন সময়ে সেটা শুনলে হয়তো তুমি অবাকই হবে। এই সুযোগে তোমাকে আমার কিছু পাগলামির কথা শুনাই । আমার স্কুল কলেজ জীবনে আমার কিন্তু বড় নেশা ছিল দাবা খেলায়, রীতিমত এমবিশন ছিল এ নিয়ে। আমি ক্যাডেট কলেজে টানা, জুনিয়ার, সিনিয়ার দুটাই চ্যাম্পিয়ান ছিলাম, চিটাগাং মেডিকেল কলেজে চ্যাম্পিয়ান ছিলাম। জাতীয় পর্যায়ে খেলে হাই রাংকিং এ গিয়েছিলাম। গ্রান্ড মাস্টার নিয়াজ মোর্শেদের সাথেও কমপিট করেছি। নিজে গ্রান্ড মাস্টার হবার প্রস্তুতিও নিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম দাবাই হবে আমার ডেসটিনি। আমার দাবার হিরো ছিল একসময়ের ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ান কিউবার দাবাড়ু রাউল কাসাব্লাঙ্কা। তার জীবন নিয়ে অনেক পড়েছি। আমার সাথে তখন প্রচুর দাবার বই থাকত। দাবা খেলা শিখেছিলাম আমার আব্বার কাছ থেকে। আব্বা খুব ভালো খেলতেন এবং তারও দাবার নেশা ছিল। তো সেই দাবার নেশা একসময় ছুটে গেল। আমি গানও করি। গানটাও একসময় সিরিয়াসিলি নিয়েছিলাম। আমার আব্বা আম্মা দুজনেই গান করতেন। মেডিকেল কলেজের এমন কোনো ফাংশন ছিল না যে আমি গান করিনি। জাতীয় পর্যায়ে গানে অনেক পুরস্কার জিতেছি। আমি রেডিওর এনলিস্টেট শিল্পী ছিলাম। চিটাগাং রেডিওতে নিয়মিত রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতাম। চিটাগাং সঙ্গীত ভবনে ওস্তাদ প্রিয়দা রঞ্জনের ছাত্র ছিলাম। তার দুই মেয়ে পুরবী দি আর কাবেরী দির কাছে গান শিখেছি। একসময় গানের এমন নেশা পেয়ে বসল যে মেডিকেলের ক্লাস ফাঁকি দিয়ে সঙ্গীত ভবনে বসে রেওয়াজ করতাম। আমার মনে আছে একদিন হারমোনিয়াম বাজিয়ে রেওয়াজ করছি সঙ্গীত ভবনে, ওস্তাদ প্রিয়দা রঞ্জন আস্তে আমার পেছনে এসে দাঁড়ালেন। আমার ঘাড়ে হাত রেখে বললেন, 'গান বড় কঠিন নেশা, এর ভেতর ঢুকো না। বিপদে পড়বে। গান ছেড়ে দাও। মেডিকেলের পড়াশেনায় মনোযোগ

~ www.amarboi.com ~

দাও।' বুঝতে পারি অনেক অভিজ্ঞতার জায়গা থেকে কথাগুলো বলেছিলেন তিনি। গান ঠিক ছেড়ে দেইনি, নানা ঘরোয়া অনুষ্ঠানাদিতে গাই কিন্তু গানকে সিরিয়াসলিও নেয়া হয়নি। তারপর মেডিকেলে পড়া অবস্থাতেই চাপল নতুন নেশা, ফিল্মের নেশা। ফিল্ম আর্কাইভে ট্রেনিং করেছি, ফিল্মে নিয়ে বহু কাজ করেছি। আমি ইন ফ্যাক্ট মস্কো ফিল্ম ইন্সটিউটে ভর্তি হবার সব ব্যবস্থা সেরে ফেলেছিলাম। স্কলারশিপও যোগাড় হয়েছিল। তো সে আরেক পর্ব, সে পর্ব নিয়ে অন্য জায়গায় লিখেছি। পরে সেই ফিল্মের লাইনেও যাইনি। এই সময়ে সমান্ত রালভাবে শুরু করেছিলাম লেখালেখি। লেখায় আনন্দ পেয়ে গেলাম। মেডিকেল পাস করলাম ঠিকই কিন্তু পালাবার পথ খুঁছিলাম কী করে নিয়মিত ডাক্তারি না করে এমন কোনো ডাক্তরি পেশায় ঢোকা যায় যাতে লেখার সুযোগ পাব। তোমাকে আরেকটা ইনফরমেশন দেই । আমি পাস করে সরকারি চাকরিতে না গিয়ে দুটা জায়গায় এপ্লাই করেছিলাম। একটা হচ্ছে চা বাগানের ডাক্তার হিসেবে কাজ করার আর আরেকটা এক বিদেশি জাহাজে ডাক্তার হিসেবে জয়েন করার। একেবারে লোকালয়ের বাইরে পালাতে চেয়েছিলাম। দুটা থেকেই ইন্টারভিউ কার্ড পেয়েছিলাম। এ সময় ব্র্যাকের গ্রামীণ স্বাস্থ্য প্রকল্পের ডাক্তার হিসেবে চাকরি পেলাম। সেটাই ভালো মনে হলো। এতে লোকলয়ের ভেতরই থাকা যাবে আবার ঠিক টিপিকাল ডাক্তারিও করতে হবে না। যাহোক এসব বলছি এজন্য যে লক্ষ করবে আমার ভেতর একটা অস্থিরতা কাজ করেছে সময়ে, আমার ইন্টারেস্ট শিফট করেছে। এক এক সময় এক এক ব্যাপারে কৌতূহলী হয়েছি। আমি আলবেরুনীর একটা কথা প্রায়ই কোট করি 'সৃষ্টিকর্তা তুমি আমাকে দীর্ঘ জীবন দিও না, বিস্তৃত জীবন দাও।' তো এই বিস্তৃত জীবনের লোভেই হয়তো নানা কিছু করার চেষ্টা করেছি।

তারপর লেখায় যখন কনটিনিউ করলাম তখন কোনো একটা নির্দিষ্ট ধারার লেখার ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ থাকল না। অনেক লেখক একটা বিশেষ পরিচয়ে পরিচিত হতে চান, কবি বা গল্পকার ইত্যাদি। তারা ভার্টিকাল লেখক। তারা একটা বিশেষ ধারার লেখার স্তম্ভ তৈরি করেন। আমি বরং হরাইজন্টাল লেখক। নানা ভাবনা দিয়ে তাড়িত হয়েছি, কোনো ভাবনা গল্পে প্রকাশ করেছি, কোনোটা প্রবন্ধে, কোনোটা উপন্যাসে। কোনো বিশেষ সৃষ্টির স্তম্ভ তৈরির কোনো আকাঙ্ক্ষা আমার ছিল না। তবে যেটা বলছিলাম এসব প্রবণতার পেছনে হয়তো আছে বৈচিত্র্যের প্রতি প্রবল কৌতূহল। এক জীবনের অনেক জীবনের স্বাদ নেয়া। তবে এটা বিশ্বাস করি যে লেখালেখির একেবারে মূল জায়গাটাতে আছে কৌতূহল। মানুষের আর জীবনের ব্যাপারে অপার কৌতূহল না থাকলে লেখা কোথা থেকেই বা আসবে? প্রতিটা মানুষ তো এক এক গল্পের, ভাবনা, ঘটনার, দুর্ঘটনার ক্যাপসুল। সেই ক্যাপসুলের খাপটা খুলে দেখতে ইচ্ছা জাগে।

~ www.amarboi.com ~

রিসাত : আপনি বলছিলেন চলচ্চিত্র পরিচালক হবার অদম্য বাসনা ছিল আপনার। মস্কোতে স্কলারশিপও পেয়ে গিয়েছিলেন। পরে যাননি। আমাদের সমাজের পারিবারিক বন্ধনের যে টান তাতেই বাঁধা পড়েছেন নাকি বাংলাদেশের চলচ্চিত্র জগতের প্রতিবন্ধকতাই (তথাকথিত বিকল্প বনাম মেইনস্ট্রিম কোনো বিভাজনেই আমি যাব না, সব অর্থেই প্রতিবন্ধকতা) আপনাকে নিরুৎসাহিত করল?

শাহাদুজ্জামান : আগের প্রশ্নে যেমন বলছিলাম চলচ্চিত্রকে পেশাই করতে চেয়েছিলাম। চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন, আর্কাইভে কোর্স করা, ফিল্ম বানানো এসব নিয়ে মেতে থেকেছি। চলচ্চিত্রে যে শেষ পর্যন্ত থাকলাম না তার যে কারণগুলো তুমি বলেছ তার দুটোই কাজ করেছে। আমি তখন পড়ছি মেডিকেলে, সেখান থেকে ছেড়ে যেতে চাচ্ছি মস্কোতে ফিল্ম নিয়ে পড়তে। মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য তো এত বড় পাগলামি করা সহজ কাজ না। তারপরও আমার বাবা মা আমাকে কিন্তু যে বাধা দিয়েছেন তা না তারা শুধু শঙ্কিত হয়েছে আমার ভবিষ্যতের কথা ভেবে। তবে আমি নিজেও আর বাংলাদেশের ফিল্ম জগতে কাজ করার মতো নিজেকে যোগ্য মনে করিনি। তারেক মাসুদকে কাছ থেকে দেখেছি। আমরা একসাথে ফিল্ম ওয়ার্কশপ করেছি। একসাথে 'চিত্রলেখা' নামে একটা পত্রিকা করেছি। দেখেছি মূল ধারার বাণিজ্যিক ছবির বাইরে নতুন ধরনের ছবি বানাতে যাওয়ার জন্য কী অসম্ভব পরিশ্রম করেছে সে। আমার মনে হয়েছে তারেকের মতো স্রোত ঢেলে সেই সংগ্রাম করবার শক্তি আমার নাই। ফিল্ম তো শেষ বিচারে একটা ইন্ডাস্ট্রি। টাকা পয়সা ছাড়া এক পা এগোনোর কোনো পথ নাই। তো আমি যেধরনের ছবি করতে চেয়েছি তার জন্য অর্থ যোগাড় আমার সাধ্যের বাইরে ছিল। আমি বরং লেখায় ফিরেছি। লিখতে তো আর টাকা লাগে না। নিভৃতে অন্তত সৃষ্টির কাজটা সারা যায়। তো সব মিলিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাতা আমার হওয়া হয়নি। কিন্তু চলচ্চিত্র নির্মাণ না করলেও চলচ্চিত্রের সাথে আমার যোগাযোগ তো অব্যহত আছে। এখন ফিল্মের স্ক্রিপ্ট লিখছি। আমার গল্প নিয়ে বেশ কিছু চলচ্চিত্র হয়েছে। তুমি জানো যে 'কমলা রকেট' ফিল্মটা আন্তর্জাতিকভাবেও প্রশংসিত হলো। একসময় চলচ্চিত্র নিয়ে টিভি অনুষ্ঠান করতাম। চলচ্চিত্র নিয়ে নিয়মিত লিখছি। এভাবে চলচ্চিত্রের সাথে যুক্ত তো আছি।

রিসাত : আপনার 'ওয়ানওয়ে টিকেট' গল্পের মধ্যে যে একটা প্রতারণার গল্প, অবিশ্বাসের গল্প আছে এমন কিছু কি আপনার জীবনে ঘটেছে? এই প্রসংগ আমি তুলছি কারণ, প্রতারণার আরেকটা গল্প আছে 'পৃথিবীতে হয়তো বৃহস্পতিবার' আছে। জানি, একজন লেখক হিসেবে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আপনি গল্প লেখার

~ www.amarboi.com ~

অনুপ্রেরণা আশপাশ থেকেই নিয়ে থাকেন। কিন্তু আপনি ১১১ পৃষ্ঠার গল্পের বইয়ে যে বিষয়গুলোকে উপজীব্য করে লিখছেন সে বিষয়গুলোর পেছনে একটা চিন্তা তো কাজ করেছেই। প্রতারণা কিংবা ঠকানো এই মানবিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে যদি একটু সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেন... আরেকটা উদাহরণ দিতে পারি, 'ক্রাচের কর্নেল' এ কর্নেল তাহেরের সাথে জিয়া'র যে প্রতারণা– সব মিলিয়ে এটার একটা জাতীয় সম্পর্ক কি থেকে থাকতে পারে? আমি জানি না বোঝাতে পেরেছি নাকি?

শাহাদুজ্জামান : বিশ্বাস ভঙ্গের ব্যাপার তো আমার জীবনে ঘটেছেই। আমার ধারণা সবার জীবনেই কম বেশি এমন অভিজ্ঞতা আছে। চারপাশের দিকে তাকিয়ে কিম্বা নানা কাছের মানুষের অভিজ্ঞতার ভেতর থেকে বুঝতে পারি দৈনন্দিন জীবনে এই বিশ্বাসভঙ্গ, প্রতারণার ব্যাপারগুলো বেশি ঘটছে আজকাল। নীতি নৈতিকতার ব্যাপারগুলো তুচ্ছ হয়ে উঠছে। সমাজে প্রতিযোগিতার ব্যাপারটা খুব প্রবল হয়ে উঠেছে। সম্পর্কগুলো তো এখন গিভ অ্যান্ড টেকের অংক মেনে তৈরি হয় প্রায়সই। সম্পর্ক তৈরি হয় কে কার কাছ থেকে কতটুকু আদায় করতে পারবে সেই হিসাব করে। তো এসব ক্ষেত্রে বিশ্বাসভঙ্গ তো ঘটবেই। জীবনানন্দের এক গল্পের চরিত্র বলে 'একটু আলতো করে বাঁচতে চাই' তো সেই আলতো করে বাঁচা এখন অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যাপক অহং নিয়ে চলে সবাই। অহং আর অহং এ টক্কর চলতে থাকলে বিশ্বাস, আন্তরিকতা, ভালোবাসার অনুভূতিগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে। আমার শেষ গল্পের বইটাতে এই বিশ্বাসভঙ্গের থিম বেশ কয়েকটা গল্পে এসেছে। বিশ্বাসের ব্যাপারগুলো এমন ঠুনকো হয়ে গেলে মানুষ আর কী নিয়ে বাঁচবে? এসব আমাকে ভাবায়। তবে জাতীয় পর্যায়ের প্রতারণার কথা যা বললে তাও বেশ ইন্টারেস্টিং অবজারভেশন। আমাদের জাতীয় রাজনৈতিক জীবনে বিশ্বাস ভঙ্গের ব্যাপক সব উদাহরণ আছে। তাহের জিয়ার বিশ্বাসভঙ্গের আগেও তো আরো বড় বিশ্বাসভঙ্গের ব্যাপার ঘটেছে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে। ব্যক্তিজীবনে, জাতীয় জীবনের এইসব বিশ্বাসভঙ্গের ব্যাপারগুলো নিয়ে আমাদের ভাবার আছে।

রিসাত : আপনি একদিন আড্ডা দেবার সময় বলেছিলেন– 'সাহিত্যের সাথে নৃবিজ্ঞানের একটা দারুণ সম্পর্ক আছে'। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাই। আপনার পেশার সাথে প্যাশনের এমন একটা যুতসই মিলন তা সম্পর্কে জানার আগ্রহ আমার আছে।

শাহাদুজ্জামান : নৃবিজ্ঞানের তো একটা নেতিবাচক ইতিহাস আছে। নৃবিজ্ঞানকে একসময় উপনিবেশের জনগোষ্ঠীকে শাসনের কাজে লাগানো হয়েছে। কিন্তু নেতিবাচক ব্যবহার হয়েছে বলেই এই বিশেষ জ্ঞানকাণ্ডের শক্তি তো কমে যায়

~ www.amarboi.com ~

না। নৃবিজ্ঞানের প্রধান মেথোডলজি হচ্ছে অবজারভেশন বা পর্যবেক্ষণ। সাহিত্য সৃষ্টির জন্য এই জীবন পর্যবেক্ষণ একটা অবশ্য কর্তব্য কাজ। নৃবিজ্ঞান পড়তে গিয়ে অবজারভেশনের পদ্ধতিগত ব্যাপার অনেক কিছু শিখেছি। চোখ থাকলেই তো আর সব দেখা যায় না। দেখার ব্যাপারটাও শেখার আছে। নৃবিজ্ঞানের এই মেথোডলজির দিকটা আমার সাহিত্যের কাজে লেগেছে। তাছাড়া নৃবিজ্ঞানে অন্যের দৃষ্টিকোণকে বোঝার উপর জোর দেয়া হয়, যাকে বলে 'এমিক ভিউ'। এই বিষয়টাও সাহিত্যের জন্য জরুরি। আগেই বলেছি যে আমি গলায় স্টোথেস্কোপ ঝোলানো এ্যাপ্রন পরা হাসপাতালের ডাক্তার হবার পথ ছেড়ে এমন কিছু করতে চেয়েছি যাতে আমার মেডিকেল ডিগ্রিকে কাজে লাগিয়েও লেখালেখি, পড়াশোনা ইত্যাদি করা যায়। এই সিদ্ধান্তটা সহজ ছিল না। ডাক্তারি করেও সাহিত্য চর্চা করেছে তেমন উদাহরণ বিশ্বসাহিত্যে যেমন আছে, বাংলা সাহিত্যেও আছে। কিন্তু আমাকে ডাক্তারির চেয়ে বেশি টেনেছে অধ্যাপনা, গবেষণার পথটা। নানা ঘটনাচক্রে চিকিৎসানৃবিজ্ঞান, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি পড়বার সুযোগ এসেছে আমার। দেখেছি সেসব পড়তে আমার ভালো লাগছে।এসব পড়াশোনার সূত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ পেয়েছি। এভাবে এমন একটা পেশায় যুক্ত হয়েছি তাতে আমার লেখার কাজটাও চালিয়ে যেতে পেরেছি। তবে পেশা আর প্যাশনের এই মেলানোর ব্যাপারটা কোনো সূত্র আছে বলে মনে হয় না। আমি আমার হৃদয়ের ডাক অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। তবে সেই পথ অনুসরণ করতে আমাকে অনেক চড়াই উৎরাইয়ের ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে।

রিসাত : অধ্যাপনার জগতে আপনার অনেক ক্ষেত্রের মধ্যে 'প্যালিয়াটিভ কেয়ার' একটি। এ ব্যাপারে গবেষণায় আসার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কোনো ঘটনা কি তাড়িত করেছে? 'মৃত্যু সম্পর্কে আমার অবস্থান পরিষ্কার' এই গল্পে যে পর্যবেক্ষণ পাওয়া যায় তা কিন্তু প্যালিয়াটিভ কেয়ার লিটারেচারে রিমার্কেবল একটা সংযোজন হতে পারে।

শাহাদুজ্জামান : হ্যাঁ ঐ গল্পটা সরাসরি আমার মুমূর্ষু আব্বার স্মৃতির প্রেক্ষিতেই লেখা। আমার আব্বার অন্তিম দিনগুলোতে আমি তার কাছে ছিলাম। আমি খুব কাছ থেকে ধীরে ধীরে তার মৃত্যুর দিকে যাওয়ার যাত্রাটাকে দেখেছিলাম। মৃত্যু অনিবার্য আমরা তো সবাই জানি। কে যেন বলেছেন যে জীবন এক সুন্দর মিথ্যা আর মৃত্যু একটা নির্মম সত্য। কিন্তু বাবার মতো এত কাছের একজন মানুষের মৃত্যুকে এত কাছ থেকে দেখার কারণে আমার ভেতর জীবন এবং মৃত্যু দুটোর ব্যাপারেই নতুন করে ভাবনা তৈরি হয়েছে। আব্বার ঐ মৃত্যুর সূত্র ধরেই আমি প্যালিয়াটিভ কেয়ার বা মুমূর্ষু রোগীর সেবা বিষয়ে ক্রমশ আগ্রহী হয়ে উঠি। এখন আমি তো প্যালিয়াটিভ কেয়ার নিয়ে গবেষণাও করছি তুমি জানো। বাংলাদেশের

~ www.amarboi.com ~

একজন প্যালিয়াটিভ কেয়ার নিয়ে পিএইচডি গবেষণা করছেন তিনি আমার গল্পটা পড়ে বলেছিলেন এ গল্পে তার গবেষণার মূল কথা সব বলা হয়ে গেছে।

রিসাত একটা দার্শনিক প্রশ্ন করতে চাই দীপেশ চক্রবর্তীর 'প্রভিনশিয়ালাইজিং ইয়োরোপ' এ লৌকিকতার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আপনি চিন্তা ভাবনায় ইদানিং এই লৌকিকতা কিংবা শেকড়ের ইতিহাস নিয়ে অনেক কিছু ভাবছেন। অন্যদিকে হারারি কিংবা আরো কিছু বর্তমান ইতিহাসবিদেরা বলছেন– ভবিষ্যতে এমন সব কিছু বিপর্যয় আসছে (জলবায়ু পরিবর্তন, জৈব-প্রযুক্তির বিপর্যয়, নিউক্লিয়ার বিপর্যয়) ইত্যাদি যত ধরনের অমিল থাকুক না কেন সবাইকে এক সাথে কাজ করতে হবে। এ ব্যাপারে আপনার কোনো অবস্থান কিংবা বক্তব্য জানতে চাই।

শাহাদুজ্জামান : এটা একটা জরুরি কিন্তু জটিল প্রশ্ন। শুধু হারারি না দীপেশদাও কিন্তু সাম্প্রতিক কাজ করছেন ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে। ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে পুরো মানব সভ্যতাই এক একটা নতুন নতুন সংকটের ভেতর এসে পড়ে। জলবায়ু পরিবর্তন মানব সভ্যতার জন্য সাম্প্রতিক কালের এক বিরাট সংকট। বিষয়টা প্রাকৃতিক হলেও সংকটটা মানুষেরই সৃষ্টি। পরিবেশবিদরা যাকে বলছেন এনথ্রোপোসিন। সংকটটা আদর্শিক, নৈতিকও। কারণ এই জলবায়ু সংকট মোকাবেলা কোনো একক দেশের পক্ষে সম্ভব না। গ্রিন হাউজ এফেক্ট কমাতে হলে মানুষের ভোগবাদী জীবনের একটা পরিবর্তন আনতে হবে। এটা তো আদর্শিক প্রশ্ন। পরিবেশবাদীরা বলছেন ধনী পৃথিবীর মানুষেরা ভোগকেন্দ্রিক যে জীবনযাপন করছে পৃথিবীর সাত বিলিয়ন মানুষের যদি ঠিক একই রকম জীবন নিশ্চিত করতে হয় তাহলে পৃথিবীর মতো আরো দুটা গ্রহ দরকার। জীবনযাপনের সব সম্পদ আসে তো পৃথিবী নামের এই গ্রহটা নিংড়েই। জীবন যাপনের লাগাম টেনে ধরতে না পারলে তো জলবায়ু পরিবর্তনে কোনো বদল আনা যাবে না। সেটা আদর্শিক, নৈতিক প্রশ্ন। দীপেশ তার লেখায় দেখিয়েছেন পাশ্চাত্যের কথিত প্রগতি কেন্দ্রিক যে আধুনিক ধারণা চালু রয়েছে তার সাথে এই পরিবেশ বিপর্যয়ের সম্পর্ক আছে। পুঁজি মুনাফাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে ফলে মুনাফার জন্য পরিবেশ বিপর্যয় ঘটাতেও সে দ্বিধা করেনি। সুতরাং বিকল্প আধুনিকতার ধারণার সাথে ক্লাইমেট চেঞ্জের এই ধারণার যোগসূত্র আছে। তবে তুমি সংকটটা ঠিকই ধরছ। বিকল্প আধুনিক ধারণা চর্চা করার জন্য যেমন স্থানিকতা জরুরি কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন আন্তর্জাতিকতা। পৃথিবীর সবার জন্য একই রকম ঝুঁকি নিয়ে হাজির হয় এই ক্লাইমেট চেঞ্জের সংকট। এটা কোনো স্থানিক সংগ্রাম শুধু না। জীবনানন্দ লিখেছিলেন, 'পৃথিবী গ্রহবাসী।' আমাদের সবাইকে পৃথিবী গ্রহবাসী হিসেবেই জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টাকে মোকাবেলা করতে

~ www.amarboi.com ~

হবে। আবার আধুনিকতার ধারণাকে মোকাবেলা করতে হবে স্থানিকতা দিয়েই। দুই সংগ্রাম তো সমান্তরালভাবেই চালু রাখতে হবে। সেটা সহজ কাজ না।

রিসাত : 'কমলা রকেট' সিনেমাটা দেখার পর আমাকে আরেকজন লেখক বলেছিল 'বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প ধ্বংসের জন্য এই ধরনের সিনেমা নেটফ্লিক্সে প্রমোট করা হচ্ছে।' এই যে, আমাদের দেশে যে কোনো ক্রিটিকাল দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের ক্ষেত্রে এক ধরনের তথাকথিত 'ইমেজ' রক্ষার প্রবণতা চালু হয়েছে, এই ব্যাপারটাকে আপনি কীভাবে দেখেন? এটা শুধুমাত্র আপনার উদাহরণ দিলাম। এমন অনেক কিছুই দেখছি চারপাশে। রাজনৈতিক পরিচয়ের ক্ষেত্রে, মত প্রকাশের ক্ষেত্রে। একদিকে সরকার বলছে, তাকে সময় দিতে হবে, যারা সরকারের সমালোচনা করে তারা উন্নয়ন চায়না– এই ধরনের বাইনারি অবস্থানের অর্থ কী মনে হয় আপনার কাছে? সমালোচনার যে একটা ধূসর জায়গা আছে তা ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছে। শুধু সরকারের দিক থেকে নয়– যে কোনো ক্ষেত্রেঃ পুরো সমাজে।

শাহাদুজ্জামান : 'কমলা রকেট' নিয়ে এ মন্তব্যে মজা পাওয়া ছাড়া তো আর কিছু করার নাই। সেই হিসাবে তো সত্যজিত, মৃণাল, ঋত্বিকের প্রায় সব ছবিই ভারতের ইমেজকে বরবাদ করে দিয়েছে। এটা ঠিক যে সাধারণভাবে আমাদের সমাজে ক্রিটিকাল থিংকিং-এর চর্চা খুব বেশি আছে বলে আমার মনে হয় না। ব্যতিক্রম আছে কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই খুব উপরিতলের কথাবার্তা, চিন্তা দেখি। নানা বিষয়ে মেঠো বক্তৃতা বেশ আছে কিন্তু গভীর প্রজ্ঞা সম্পন্ন আলোচনা খুব বেশি চোখে পড়ে না। অনেকের ভেতর এমন এ্যাটিচুড দেখি যে তারা সব জেনে গেছেন এখন তাদের কাজ শুধু বাণী দেয়া। অবতার হয়ে গেলে আর তো কোনো প্রশ্নই নাই। কিন্তু আমি প্রশ্নতাড়িত মানুষ খুঁজি। খুব বেশি চোখে পড়ে না। দেশের উন্নয়নের জন্যও তো অবিরাম বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্ক, সমালোচনা দরকার। সমালোচনা একটা 'ধূসর' জায়গা, কথাটা ভালো বলেছ তুমি। কিন্তু দলীয় বা বিরোধী কেউ তো আর সেই ধূসর জায়গায় দাঁড়িয়ে বিতর্ক করে না। এটাও বুঝি যে আমরা একটা বিশেষ ইতিহাসের পথপরিক্রমার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি ফলে একটা ধূসর জায়গায় দাঁড়িয়ে খুব অবজেকটিভ সমালোচনা করা কঠিন হয়ে পড়ে অনেক সময়। একটা পক্ষ নির্ধারণ অবধারিত হয়ে পড়ে। কিন্তু লেখক শিল্পীকে তো শেষ পর্যন্ত ধূসর জায়গাতেই দাঁড়তে হয়। ফলে তাকে সবসময়ই একটা ক্রিটিকাল মন নিয়ে চারদিকে তাকাতে হয়।

রিসাত : সাহিত্যে সমালোচনার ধারাতে এখন প্রায়ই একটা 'এটেনশন সিকিং' প্রবণতা দেখতে পাই। প্রতিষ্ঠিত কোনো লেখককে ধুম করে এক বাক্যে 'কিছু

~ www.amarboi.com ~

হয়নি' টাইপের কথা বলে উড়িয়ে দেয়া হয়। আপনি কি খেয়াল করেছেন এমন প্রবণতা? এই ধরনের সমালোচনা নিয়ে আপনার কোনো মন্তব্য জানতে চাই।

শাহাদুজ্জামান : তা তো খুবই খেয়াল করেছি। তবে ব্যাপারটা যে খুব নতুন তা না। আমাদের তারুণ্যে আমরা যখন চায়ের স্টলে, বাড়িতে আড্ডা দিতাম তখনও কারো করো ভেতর এমন প্রবণতা দেখতাম। সাহিত্যের প্রতিষ্ঠিত কোনো লেখককে একেবারে দু আঙ্গুলে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিত তারা। এমন একটা অবস্থা তৈরি করত যে ঐ চায়ের স্টলটাই হচ্ছে বিশ্বসংসার এবং ঐ চায়ের স্টলে সেই হচ্ছে বিধাতা। তার রায়ের উপরই নির্ভর করবে বাংলা সাহিত্যের ভূত ভবিষ্যৎ। সবাই যাকে প্রশংসা করছে তাকে নস্যাত করাই তার বীরত্ব। চায়ের স্টল ছেড়ে এখন সেসব প্রবণতার দেখা মেলে অনলাইনে। ইংরেজিতে একটা কথা আছে 'নার্সিসিজম ফর ডিফারেন্স'। মানে শুধু নার্সিসিজম না অন্যরকম হওয়ার প্রতি নার্সিসিজম। এই যে অন্যকে খারিজ করার প্রবণতা অনেক সময় কাছের মানুষদের ভেতর একটা চমক তৈরি করে। নজরুল যাকে বলেছেন 'অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস'। তো এই সাহস দেখে অনেকে ভড়কে যায়। তার বেশ এডমায়ারারও জুটে যায়। এসব আগেও দেখেছি। তবে নতুন ব্যাপার হচ্ছে এই ফেইস বুক। ফেইসবুকে এই 'নার্সিসিজম ফর ডিফারেন্স' চর্চার একটা বেশ ভালো প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে। ধরো কেউ ফেসবুকে একটা পোস্ট দিল, 'রবীন্দ্রনাথ একজন তৃতীয় শ্রেণির লেখক' হয়তো সাথে সাথেই অনেককেই দেখা যাবে লিখছে, 'সহমত' কেউ বলবে, 'দারুণ বলেছেন' আরেকজন 'অভিনন্দন' জানাবে। ফেসবুক পোস্টে শো কেসের মূল্যবান সামগ্রীর মতো ঐ মন্তব্য টানানো থাকবে এবং একে একে বাড়তে থাকবে লাইক, লাভ ইত্যাদির সংখ্যা। কেউ হয়তো বিতর্কও জুড়ে দেবে, না এটা আপনি ঠিক বলেননি ইত্যাদি। তো ফেসবুক এ ধরনের একটা মজাদার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে পারে। কথা হচ্ছিল ক্রিটিকাল সমালোচনা নিয়ে। তার জন্য দরকার গভীর আলোচনা, মতের পক্ষে যুক্তি। রবীন্দ্রনাথকে তৃতীয় শ্রেণির লেখক কেউ বলতেই পারেন। আমি তার মন্তব্যের নিংড়ানো ব্যাখ্যা খুঁজব। কিন্তু যেটা আগে বলছিলাম সমালোচকের ভেতর অবতারের ভাব দেখা দিল তো মুস্কিল, যেন তার দায়িত্ব শুধু বাণী দেয়া। এটাও মনে রাখা দরকার যে সমালোচক ছায়া মাত্র মূল অবয়ব নন। মূল আকার না থাকলে ছায়ার কোনো অস্তিত্ব নাই। মেধাবী সমালোচনা সাহিত্যের জন্য স্বাস্থ্যকর কিন্তু তা শুধু অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহসের ব্যাপার না। আর যিনি সৃজনশীল লেখক হতে চান, তাকে শেষ পর্যন্ত কাজ দিয়েই জবাব দিতে হবে। অন্যকে খারিজ করার ভেতর দিয়ে নিজের পরিচয় দাঁড়ায় না। দাঁড়ায় নিজের লেখার ভেতর দিয়ে। আমাদের চায়ের স্টলে সবাইকে খারিজ করা তেমন বহু

~ www.amarboi.com ~

নামজাদা নার্সিসিস্ট অথচ সাহিত্য পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাওয়া মানুষদের মুখ মনে পড়ে।

রিসাত : আপনার লেখালেখির শুরু হয়েছিল মার্ক্সিস্ট নন্দনতত্ত্বের আলোকে। প্রায় ৩০ বছর পর আজকে আপনি কিসের আলোকে লিখছেন। মানুষ গড়ার একটা বাসনা ঐ নন্দনতত্ত্বে ছিল। এখনো ঐ বাসনা কি আছে? থাকলে কোন সমাজ নির্মাণের জন্য?

শাহাদুজ্জামান : আগেই বলেছি লেখালেখি শুরু করেছি তো জীবনের প্রতি কৌতূহল থেকে, জীবনের অর্থ খুঁজতে। জীবনের অর্থ খুঁজতে জীবনের খুটিনাটি ছোট ব্যাপারগুলোর দিকে চোখ রাখতে হয়, তেমনি তাকে তো একটা আইডিয়া বা দর্শনের আলোকেও দেখার দরকার পড়ে। সেই পথ ধরেই একসময় মার্ক্সবাদী দর্শনের সঙ্গে পরিচয়। আমরা এমন একটা সমাজে থাকি যেখানে প্রতি পদে বৈষম্য। মার্ক্সবাদ একটা নতুন সমজের স্বপ্ন দেখিয়েছিল আমাদের। তবে অভিজ্ঞতায় বুঝেছি পরিবর্তন একটা জটিল প্রক্রিয়া, মানুষের জীবন, সম্পর্ক ইত্যাদি এক ধূসর এলাকা। আমার মানস গঠন হয়েছে একটা সুন্দর কালেকটিভ জীবনের স্বপ্ন নিয়ে। সেই স্বপ্ন তো মরেনি। কিন্তু বুঝেছি জীবনানন্দ যাকে বলেছিলেন সেই 'শুভ মানবিকতার ভোর' অনেক দূরের স্বপ্ন। এই অবসরে মানুষের মনটাকে সত্য, সুন্দর, কল্যাণের দিকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করা যেতে পারে। সাহিত্য সে কাজটা করতে পারে। নানা অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে পৃথিবীর মানুষও তাদের ভাবনাগুলোকে রিভাইস করছে। মানুষের চিন্তার দিগন্ত খুলছে। তৃতীয় বিশ্বের মানুষের সংগ্রামের ধরন, মাত্রা বদলেছে। সেগুলো বুঝবার চেষ্টা করি। পৃথিবীর বহু দেশ দেখবার সুযোগ হলো। সব জায়গাতেই দেখেছি সাধারণ মানুষের অপার সম্ভাবনা। সেইসব সম্ভাবনাকে নতুন দার্শনিক বীক্ষার আলোকে দেখতে চেষ্টা করি। আগেই বলেছি পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট, সাব অলটার্ন, ডিকলোনাইজেশন, প্লুরাল মডার্নিটির নানা নতুন ভাবনা দিয়ে নতুন পৃথিবীকে বুঝবার চেষ্টা করি। কিন্তু এসব বড় বড় ভাবনাকে বাদ দিলেও স্রেফ জীবনের প্রতিদিনের ছোটখাটো যে বিস্ময়কর আনন্দ, দুঃখের উপলক্ষ তৈরি হয় তার দিকেই তাকিয়ে থাকি। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন 'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে, তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।' ফলে লেখার উপলক্ষের তো শেষ নাই। কিছুদিন আগে ময়মনসিংহের হাওর অঞ্চলে ঘুরলাম। ভৈরব থেকে সাত ঘণ্টার লঞ্চ জার্নি করে পৌঁছালাম কলিমপুর, সেখান থেকে অষ্টগ্রাম। জীবনের কী যে অসাধারণ জঙ্গমতা দেখলাম! ফিরবার পর থেকেই মনে ঘুরছে কবে যে এই অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখব। তো জীবনের দিকে তাকিয়ে অবাক হওয়া তো আমার শেষ হয়নি, সেই অবাক হবার গল্প শোনাবার ইচ্ছাও মরে

~ www.amarboi.com ~

যায়নি। লিখি এই লোভে যে লিখতে লিখতে আশ্চর্য এই জীবনটাকে দেখার, একে নিয়ে ভাবার সুযোগ পাব।

রিসাত : সাহিত্য অংগনে কিছু মানুষ আছে যারা সাহিত্যের জন্য জীবন দিয়ে দিতে রাজি থাকেন (প্রতীকী অর্থে বলছি)। আপনার মতো একজন পুরোদস্তুর সাহিত্যমগ্ন মানুষ সেইসব মানুষদের ইংগিত করে আমাকে একদিন বলেছিলেন– 'সাহিত্য কি জীবনের চেয়ে বড় হতে পারে?না, হতে পারে না'–এই কথাটা আমি প্রায়ই ভাবি কেন বলেছেন? এই বক্তব্যের গভীরতায় যেতে চাই। সাহিত্য, জীবন এই দুই কে আপনি কীভাবে এক করেন? আবার কোথায় আলাদা করেন?

শাহাদুজ্জামান : জীবনের চেয়ে বড় কিছুই না। শিল্পসাহিত্য এসব তো জীবনকে সার্ভ করার জন্যই। জীবনকে আরো নানা পেশার মানুষই সার্ভ করে, লেখক তাদের মতোই একজন। সাহিত্যের জন্য একটা উঁচু আসন রাখার কোনো কারণ আমি দেখি না। সাহিত্যের জন্য জীবন দিয়ে দেয়া যেতে পারে তার মানে এই না যে সে জীবনের চেয়ে বড়। জীবনের অনেক কাজের মতোই সাহিত্য একটা কাজ। অনেক লেখককে দেখেছি লেখা ছাড়া অন্য কাজকে নীচু করে দেখতে। তারা মনে করেন যে কাজ এ্যাবস্ট্রাক্ট না সেটা কোনো কাজ না। তাহলে তো কৃষকের কাজ কোনো কাজই না। আমি এ কথাটাই বলতে চাই যে সাহিত্যের কাজটাকে মহান এক কর্মকাণ্ড ভেবে, জীবনের অন্য সব মাত্রাকে ছোট করে দেখলে লেখক জীবনটাও ভারসাম্য হারাবার সম্ভাবনা থাকে। মৌমাছি অনেক সময়ে নিজের তৈরি মধুতেই ডুবে মরে।

রিসাত : একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি। লেখক হুমায়ূন আহমেদ নিয়ে আপনি কখনো তেমন কিছু বলেননি। খুব হালকাভাবে বলেছেন।একজন কথাসাহিত্যিক হিসেবে লেখক হুমায়ূন আহমেদের মূল্যায়ন শুনতে চাই। কেনই বা তিনি জনপ্রিয়? এর পেছনে কোনো সমাজবিজ্ঞান কি আছে?

শাহাদুজ্জামান : হুমায়ূন আহমদ আমাদের সাহিত্য জগতে একজন প্যারাডক্স। সিরিয়াস এবং জনপ্রিয় ধারার সাহিত্যের যে প্রচলিত ডাইকোটমি আছে তাকে উনি একটা চ্যালেঞ্জের ভেতর ফেলে দেন। তার এতটা জনপ্রিয় ইমেজের কারণে তিনি অনেক সময়েই সাহিত্যের সিরিয়াস আলোচনায় উপেক্ষিত থেকে গেছেন। বাংলাদেশের সাহিত্যের প্রেক্ষিতে তার অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে বলে আমি মনে করি। স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত জীবনকে ঠিক যেভাবে তিনি সাহিত্যে এনেছেন তার আগে এভাবে আমাদের দেশের সাহিত্যে তা ছিল না। তার বাক্য গঠন, ভাষা ব্যবহারেও কলকাতার সাহিত্যের প্রভাব বিশেষ ছিল না। মানুষের একটা ইনহ্যারেন্ট গল্পের তৃষ্ণা আছে সেই তৃষ্ণা তিনি মেটাতে

~ www.amarboi.com ~

পারতেন। তার চরিত্রগুলো একেবারেই বাংলাদেশের বলে চেনা যায়। সাধারণ পাঠকের কাছে বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন বলতে কলকাতার যে লেখকরা পরিচিত ছিলেন তাদের গল্পের প্রেক্ষাপট, চরিত্র, পথ ঘাট কোনোটাই আমাদের বিশেষ চেনা না, মিল কেবল এই বাংলা ভাষায়। হুমায়ূন বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের একেবারে চেনা চেহারাটা সাহিত্যে তুলে আনলেন। সব মিলিয়ে ব্যাপক পাঠক তাকে গ্রহণ করল। একসময় আমরা ট্রেনে বাসে, লঞ্চে দেখতাম নিমাই ভট্টাচার্য, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় এদের বই ব্যাপক বিক্রি হতো। আর বাংলাদেশে জনপ্রিয় বই বলতে ছিল মাসুদ রানা। সাধারণ পাঠক কলকাতার সেইসব লেখকদের কাছ থেকে ক্রমশ সরে এল। হুমায়ূন আহমেদের বই মফস্বলে, গ্রামে পৌঁছে গেল। তার একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে আমাদের প্রকাশনায়। বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পের বিকাশেও হুমায়ূন আহমেদের ভূমিকা আছে। তার প্রথম দিকের বইগুলো আমার বিশেষ প্রিয়। তার নন্দিত নরকে নামের ছোট বইটাতে তিনটা মৃত্যু ঘটে এবং এমন একটা ছোট পরিসরে এতগুলো মৃত্যুর ঘটনা অসাধারণ নির্মোহ ভঙ্গিতে তিনি উপস্থিত করেছেন। তার নিশিকাব্য নামের ছোটগল্প বইয়ের গল্পগুলো খুব শক্তিশালী বলে আমি মনে করি। তার 'ফেরা' নামে গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে লেখা উপন্যাস আমার পছন্দের একটা বই। একটা মেধাবী সাহিত্য পরিমণ্ডলে তিনি সাহিত্য শুরু করেছিলেন। আহমদ শরীফ তার নন্দিত নরকে বইটার ভূমিকা লিখেছিলেন। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন রফিক কায়সার, মেধাবী সমালোচক যিনি কমলকুমার মজুমদারে উপর প্রথম পূর্ণাঙ্গ বই লিখেছিলেন। হুমায়ূন আহমদের বই 'শঙ্খনীল কারাগার' রফিক কায়সারের একটা কবিতার নাম । আশির দশকের গোড়ায় আমি 'বাংলা প্রগতিশীল সাহিত্য' বিষয়ক এক সেমিনারে পেছনের সারিতে বসে আহমদ শরীফ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখদের বক্তৃতা শুনছিলাম। মনে আছে হুমায়ূন আহমেদ চুপচাপ এসে পেছনের সারিতে বসেই সবগুলো বক্তৃত শুনেছিলেন। আমি এসব বলছি এটা উল্লেখ করতে যে তিনি চারণ ভঙ্গিতে সাহিত্যে আসেননি, সব জেনেশুনেই এসেছেন। একটা বিশেষ ধারায় তারপর তিনি নিজেকে নিযুক্ত করলেন। তিনি তার গল্প বলার শক্তিকে প্রধান পুঁজি করলেন। তিনি টেলিভিশন নাটকে যুক্ত হলেন। তার নাটকের চরিত্র বাস্তবের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠল। তার সৃষ্ট বাকের ভাই তো গণ হিস্টিরিয়া তৈরি করেছিল। শরৎচন্দ্রের তৈরি চরিত্র শ্রীকান্তের বেলায় তেমন ঘটেছে। এসব নিঃসন্দেহে শক্তির ব্যাপার। তবে তিনি তার শক্তির অপচয়ও করেছেন বলে আমি মনে করি। তিনি শেষ দিকে নেহাত এন্টারটেইনার হয়ে উঠলেন। যতক্ষণ পড়ছি ততক্ষণ তার বই আমাকে হয়তো আনন্দ দিচ্ছে তারপর তার কোনো স্মৃতিই আর মনে থাকছে না। অনেকটা ম্যাজিক শোর মতো। মুহূর্তের আনন্দ। সেই মুহূর্তের আনন্দ দিতে তিনি বহু অযত্নের বই লিখেছেন।

~ www.amarboi.com ~

তার শেষের অনেক বই পড়ার চেষ্টা করেছি কিন্তু এগোতে পারিনি। জনপ্রিয়তার জাল তাকে পেয়ে বসেছিল। পাঠকপাঠিকাকে তিনি একটা আরামের ভেতর রাখার ফর্মুলা পেয়ে গিয়েছিলেন, সেই আরামে রাখার নানা চেষ্টা তিনি করে গেছেন। কিন্তু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখায় জীবনের জটিলতার গভীর তল যেমন নিংড়ে উঠে, চিন্তাকে চ্যালেঞ্জ করে। সেই চালেঞ্জের ভেতরও আনন্দ আছে। কিন্তু হুমায়ূন শেষের দিকে লেখায় সেই প্রাণ আমি পাইনি। আহমদ ছফা তার ঘনিষ্ঠ ছিলেন তিনি এক পর্যায়ে এসে বলেছিলেন হুমায়ূনের লেখা চানাচুরের মতো, খেতে ভালোই লাগে কিন্তু পেট ভরে না।

রিসাত : আমি লক্ষ করেছি, আপনি তরুণদের সাথে খুব মেশেন, তাদের কথা শুনতে চান। দেশে গেলে আপনি নানা তরুণ গোষ্ঠীর ভেতর গিয়ে বক্তৃতা দেন। আপনি অনেক তরুণদের হায়ার স্টাডির ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করেছেন আমি জানি। তরুণদের ভাবনা শোনার এই প্রবণতা, তাদেরকে প্রমোট করার এই ইচ্ছা সিনিয়ারদের ভেতর সচরাচর দেখি না। কোন ভাবনা থেকে আপনি তা করেন সেটা জানতে চাই।

শাহাদুজ্জামান : আমি তো সময়ের সাথে থাকতে চাই। তরুণ তরুণীদের সাথে কথা বললে আমি সমকালের পালসটা বুঝতে পারি। সেটা খুব জরুরি আমার কাছে। নতুন বাংলাদেশ তো তাদের ভেতরই সুপ্ত হয়ে আছে। আমি তাই সুযোগ পেলেই যেমন আমার অভিজ্ঞতা তরুণদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করি তেমনি তাদের কথাও শুনতে চাই।

রিসাত : নতুনদের মধ্যে যারা কথাসাহিত্যে লেখালেখি করছে তাদের কার লেখা আপনার ভালো লাগে?

শাহাদুজ্জামান : আমি নতুনদের লেখা সমসময়েই পড়বার চেষ্টা করি। অনেক লেখার ভেতর সম্ভাবনা দেখি। বিচ্ছিন্নভাবে কারো কারো নির্দিষ্ট কিছু লেখা চমৎকার লাগে তবে তাদের লেখায় মানের ধারাবাহিকতা অনেক সময় খুঁজে পাই না। তবে বিশেষভাবে যদি নাম বলতে বলো তাহলে আমি বলব সাম্প্রতিককালে সুমন রহমান আর সাগুফতা শারমিন তানিয়ার গল্প আমার ভালো লাগছে। তাদের ঠিক নতুন লেখক হয়তো বলা যাবে না। তবে তারা আমার পরের প্রজন্মের তো বটেই। দুজনের লেখাতেই শক্তি আছে। সুমনের একটা বৈশ্বিক দৃষ্টি আছে, পৃথিবীর দিকে, সমসাময়িক কালের দিকে তার খুব সজাগ পর্যবেক্ষণ আছে। সুমন কবিতা লেখেন এবং তিনি পপুলার কালচারের ভালো একডেমিকও। তার গল্পে একাধারে কবিতার নাজুকতা আর মননের ঋজুতার ভালো সমন্বয় আছে। সাগুফতা শারমিন তানিয়ার লেখাতেই শক্তি আছে। তার ভাষার একটা নিজস্ব

~ www.amarboi.com ~

আবহ আছে। বাংলা শব্দের অপার ঐশ্বর্যের সদ্ব্যবহার করেন তানিয়া। জীবনের অনেক তুচ্ছ খুটিনাটির দিকে তার নজর আছে। অনেক অভিনব বিষয়েও গল্প লিখেছেন তিনি। তার গল্প আমি আগ্রহের সাথে পড়ি।

রিসাত : লেখক শাহাদুজ্জামান–অধ্যাপক শাহাদুজ্জামান–পারিবারিক শাহাদুজ্জামান– তিন ক্ষেত্রেই একজন সার্থক মানুষ আপনি। লেখকদের যে একটা ক্যালাস, চালচুলোহীন জীবন তার পালটা হিসেবে আপনি অনেকের আইডল। এই যে ব্যাল্যান্স, এই ব্যাল্যান্সটুকু তো আপনার অনেক প্রিয় লেখকেরাই করতে পারেননি। আপনার গল্পটা শুনতে চাই।

শাহাদুজ্জামান : সাফল্য, সার্থকতা এসব তো খুব ইলিউসিভ ব্যাপার। আপাতভাব আমার নানা সাফল্যগুলো চোখে পড়ছে কিন্তু এর পেছনের নানা সংগ্রাম, না পাওয়ার ব্যাপারও আছে। সাফল্য দেখা যায়, সংগ্রাম দেখা যায় না। আমার পেশাগত একটা প্রাপ্তি হয়তো আছে এখন, আমার লেখালেখির একটা পাঠক গোষ্ঠীও আছে। এসবকে একধরনের সার্থকতা হয়তো বলা যায়। কিন্তু এই বাহ্যিক প্রাপ্তিই তো একজন মানুষের পরিচয়ের সবটুকু না। কতরকম চড়াই উৎরাই পার হতে হয়েছে এই পথ চলায়। আমি আমার জীবনকে একটা জার্নি হিসেবেই দেখি।

আমার পড়াশোনার সময়কার জীবন কিন্তু খুব এলোমেলো ছিল। মেডিকেলের পড়ায় গ্যাপ দিয়েছি। ডাক্তারি পড়ব না ঠিক করেছিলাম। সেটা খুবই কনফিউশনের একটা সময়। আমার মধ্যবিত্ত পারিবারিক পরিমণ্ডলে আমি তখন তো রীতিমত ব্যর্থ এক মানুষ। অনেক গভীর যন্ত্রণার দিন সেসব। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই কথা– 'এ জীবন লইয়া কি করিব, কি করিতে হয়' এই প্রশ্ন নিয়ে ছুটছি তখন। উত্তর হাতে নাই। উৎভ্রান্তের মতো সময় কেটেছে। আমার সাথের বন্ধু বান্ধবরা সব পাস করে বেরিয়ে গেছে আর আমি পড়া বাদ দিয়ে নানা সব পাগলামি করছি। আমার দিকে তারা করুণার চোখেই তাকিয়েছে তখন। তারপর একসময় ডাক্তার হলাম কিন্তু ডাক্তারের যে টিপিকাল ইমেজ, গলায় স্টেথো ঝুলিয়ে রোগী দেখা তা করলাম না। পাস করে গ্রামে গ্রামে ঘুরে লোকেরা টয়লেট বানিয়েছে কিনা, হাত ধোয় কিনা, এসব নিয়ে কাজ কর্ম করেছি। ডাক্তার হিসেবে এসব তো অনেকের কাছেই অধঃপতন। আমার ডাক্তার বন্ধুরা তখন সব নানা ডাক্তারি হায়ার ডিগ্রি নিচ্ছে, যশ, অর্থ উপার্জন করছে। আর আমি তখন এক বখে যাওয়া ডাক্তার যে কিনা ফিল্ম বানাবে বলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শেষে এক পর্যায়ে পড়তে গেলাম এনথ্রোপলজি। এসব তো নেহাত মাথা খারাপ লোকের কাজ। স্রোতের বিপরীতে চলার সেইসব একাকী সংগ্রামের দিনগুলোর গল্প তো আড়ালেই আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লেখালেখি করছি সেই তরুণ বয়স থেকেই কিন্তু সেগুলো খুব সিরিয়াস সব বিষয় যা গুটিকয় লিটল ম্যাগাজিনের পাঠক পাঠিকা ছাড়া কেউ পড়ে না। সুতরাং সার্থকতার কথা যা বলছ তার ধারে কাছে ছিলাম না আমি। তবে আমার নিজের উপর আস্থা ছিল। আমি আমার প্রাণের আনন্দের ব্যাপারগুলো ছেড়ে দিয়ে শুধু মাত্র একটা জীবিকা অর্জনের জন্য জীবন যাপন করতে চাইনি। আবার মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান হিসেবে আমার একটা দায়িত্বের ব্যাপারও আছে। আমি দায়িত্বহীন একটা জীবনও যাপনও করতে চাইনি। আমি নিজের ভেতর যুদ্ধ করেছি কী করে জীবন আর জীবিকাকে মেলাব। আমার সেই সময়ের মনের অবস্থাটা হয়তো কিছুটা টের পাবে আমার 'মিথ্যা তুমি দশ পিঁপড়া' গল্পের প্রথম চিঠিটায়। আমি ভেবেছি কী করে আমার সহজাত আগ্রহের ব্যাপারগুলোকে, অন্যান্য অভিজ্ঞতাকে আমার জীবিকার সাথে মেলানো য়ায়। নানা পথ ঘুরে শেষে এই গবেষণা আর অধ্যাপনার জীবিকায় এসেছি। এতে একটা মোটামুটি ডিসেন্ট জীবন যাপন করে লেখা পড়ার সাথে থাকা যেতে পারে।

আমার প্রাণের তাগাদা ছিল ক্রিয়েটিভ কাজের সেটা আমি ছাড়তে চাইনি। কিন্তু নানারকম কাজ না করে লেখালেখিতেই মনোনিবেশ করলাম। কিন্তু লেখাকে পেশা করার কথা ভাবিনি কারণ জানি তাতে হয়তো অনেক কম্প্রোমাইজ করতে হবে। আমি ঠিক করলাম নিজের প্রাণের আগ্রহ ছাড়া কোনো ফরমাইসি লেখা কখনো লিখব না। তো এভাবেই ধীরে যাত্রা শুরু করলাম। লেখা কোনো প্রতিযোগিতার ব্যাপার না। এখন এসব বলছি ঠিকই কিন্তু এসব খুব যে হিসাব নিকাশ করে করেছি তা না। আমি আমার প্রাণের ডাককে অনুসরণ করেছি। তবে সেক্ষেত্রে আমার কাছের অনেক মানুষের সহযোগিতা পেয়েছি। আমার কিছু বন্ধু, আমার স্ত্রী। আমার বাবা মাও আমার সেইসব বিভ্রান্তির দিনে আমাকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। তবে লেখাকে যখন সিরিয়াসলি নিয়েছি তখন এটা বুঝেছি যে ক্যালাস জীবন যাপন করে এসব হবে না। আর পেশা আর প্যাশনের এই হিসাব মেলাতে আমাকে অনেক অর্গানাইজড হতে হবে। আমি মুরাকামির কথাটা খুব মানি যে লেখকের জীবন ডিসিপ্লিনড হওয়া দরকার। লেখকের জীবন খুব পরিশ্রমী জীবন। মুরাকামি তো লেখালেখি করার জন্য নিয়মিত ম্যারাথন দৌড়ান।

তবে লেখালেখির জন্য আমাকে অনেক কিছু ত্যাগও করতে হয়েছে। লেখালেখি তো ভীষণভাবে প্রাণশক্তি কেড়ে নেয়। যে প্রাণশক্তি আমি লেখায় ব্যয় করেছি তা আমি জাগতিক সাফল্যের পেছনে ব্যয় করলে হয়তো অন্যরকম অনেক বস্তুগত অর্জন হতো। তাছাড়া লেখালেখিতে মগ্ন থাকতে গিয়ে অনেক কাছের মানুষ যে মনোযোগ দাবি করে তা দেয়া হয়ে ওঠে না। আমার বাবা, মা, ভাই বোন, স্ত্রী সন্তানের অনেক দাবীই মেটাতে পারিনি। সেখানেও কত মান, অভিমানের চড়াই উৎরাই থাকে। আমি প্রায় তিন বছর ধরে 'একজন কমলালেবু' লিখেছি। টানা

~ www.amarboi.com ~
গবেষণা করেছি, লিখেছি দিনের পর দিন। যেহেতু বিদেশের একটা ইউনিভার্সিটিতে চাকরি করি সেখানে অনেক কাজ আর দায়িত্ব। লেখার কাজটা তাই আমাকে করতে হতো সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে। ফলে এসময়টায় আমার দুই ছেলেকে যতটা সময় দেয়া দরকার ছিল তা মোটেও দিতে পারিনি। এসময়টা ওরা পার করেছে একটা বয়োসন্ধির কাল। আমার সঙ্গ থেকে ওরা বঞ্চিত হয়েছে। মনে আছে ওদেরকে গল্প করেছি যে আমি একজন কবিকে নিয়ে উপন্যাস লিখছি যে ট্রামের নিচে পড়ে মারা গেছেন। ওরা যতটা আমাকে কাছে চায় সেটা পেত না বলে মনে আছে এক ছেলে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তোমার ঐ পয়েট কবে ট্রামের নিচে পড়বে?' ওদের ধারণা কবি ট্রামের নিচে পড়লেই আমার লেখা শেষ হবে। তো এসবে মন খুব বিষণ্ন হয়েছে । একজন কমলালেবু নিয়ে যখন কেউ নির্মম কোনো মন্তব্য করে তখন মনের খুব গভীরে ক্ষত তৈরি হয়। এখন প্রবাসে আছি, প্রবাস জীবনেও নানা চাপা বেদনা আছে। তো তথাকথিত সাফল্যের নেপথ্যে অনেক না পাওয়ার গল্প আছে, সংগ্রাম আছে। নিজের সার্থকতা নিয়ে তাই আমি ভাবি না। আমি নিজেকে সব সময় ইংরেজিতে যাকে বলে গ্রাউন্ডেড রাখতে চাই। প্রতিদিনের ছোটখাটো আনন্দ, বেদনা, বিস্ময়ের ভেতর জড়িয়ে রাখতে চাই।

আর একের জীবনের সাথে অন্যের জীবনকে মেলানোতেও বোধহয় বিশেষ লাভ নাই। আমার গল্পটা হয়তো আমার একান্ত নিজস্বই। আমার গল্পের সঙ্গে অন্যের গল্পকে মেলানোর তো সুযোগ নাই। আর অন্যকে পরামর্শ দেয়া কঠিন কাজ কারণ জীবন এক একজনের কাছ এক একরকমভাবে ধরা দেয়। নতুন প্রজন্মের কাছে আমার বলার কথাগুলো হয়তো অনেকটুকুই ধরা আছে আমার 'মামলার সাক্ষী ময়না পাখি' বইটার শেষ গল্প 'নাজুক মানুষের সংলাপ' গল্পে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কথা- তিন

[এই কথোপকথন মাসউদ আহমাদের সঙ্গে। মাসউদ আহমাদ গল্পকার। তিনি 'গল্পপত্র' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এছাড়া জীবনানন্দ দাশ বিষয়ে 'জীবনানন্দ' নামের একটি পত্রিকাও সম্পদনা করেছেন তিনি। এই কথোপকথন 'জীবনানন্দ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ২০১৮ সালে। এই আলাপে মূলত জীবনানন্দ দাশের সাহিত্য এবং জীবন কেন্দ্রিক আমার বই 'একজন কমলালেবু' বইটির বিষয়, প্রকরণ, লেখার প্রক্রিয়া ইত্যাদি নিয়ে কথা হয়েছে।]

মাসউদ আহমাদ : জীবনানন্দ দাশকে উপজীব্য করে লেখা আপনার উপন্যাস 'একজন কমলালেবু' প্রথম প্রকাশিত হয় প্রথম আলো ঈদসংখ্যা ২০১৬ তে, পরের বছর বই হয়ে বাজারে আসে প্রথমা প্রকাশন থেকে। উপন্যাসটি লেখার কতদিন আগে আপনি এর কাহিনি নিয়ে ভেবেছেন এবং লিখলেন কতদিন ধরে?

শাহাদুজ্জামান : জীবনানন্দ আমার ওপর ভর করেছিলেন সেই কৈশরে। আমি যখন ক্যাডেট কলেজে পড়ি–সম্ভবত ক্লাস নাইনে, তখন আমাদের বাংলা শিক্ষক রফিক কায়সার তাঁর 'আট বছর আগে একদিন' কবিতাটা একদিন ক্লাসে আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। বলা যায়, প্রায় তাৎক্ষণিক ঐ কবিতা আমাকে দখল করে নেয়। স্কুল পাঠ্য নানা যে কবিতা তখন পড়ছি তা থেকে এ যে ভিন্ন একটা ব্যাপার, সেটা টের পাই। ঐ থুত্থুরে অন্ধ প্যাঁচা, বুড়ি চাঁদ আমাকে একটা অন্য জগতে নিয়ে যায়। তার কবিতার জগতের যে মেজাজ তা আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এমনিতে পারিবারিকভাবেই সাহিত্য-আগ্রহ আমার তৈরি হয়েছিল। আমার মা বাংলা সাহিত্যের শিক্ষক, আব্বা খুবই সাহিত্য অনুরাগী। নিজে লিখতেন। আব্বাও খুব কবিতার ভক্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি এই বিশেষ ধারার কবিতা যাকে তখন বলা হতো 'আধুনিক কবিতা' তার ভক্ত ছিলেন না। আব্বার কাছে বরং রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল শুনেছি। জীবনানন্দ আমাকে এক ভিন্ন স্বাদের কবিতার জগতে নিয়ে যায় এবং আমার মনে হয়, তাঁর কবিতার সাথে আমি যেন অনেক

~ www.amarboi.com ~

বেশি নিজেকে যুক্ত করতে পারছি। জীবনানন্দের কবিতা এরপর একরকম গোগ্রাসে পড়েছি। এর বহু বছর পর, আমি নিজে যখন লিখতে শুরু করি তখন জীবনানন্দের নানা বাক্যবন্ধ, রূপক, উপমা আমার লেখায় চোরাগোপ্তা ঢুকে পড়ে। আমার গল্পের নাম, বইয়ের নামের ভেতরও রয়ে যায় জীবনানন্দের প্রভাব। ১৯৯৯ সালে জীবনানন্দের জন্মশত বর্ষে আমার যে গল্পের বইটা বেরোয় তার নাম 'পশ্চিমের মেঘে সোনার সিংহ' এই লাইনটা জীবনানন্দের একটা গল্প থেকে ধার করা। সেই বইয়ের শুরুতে '১৮৯৯' নামে একটা অণুগল্প আছে যা মূলত গল্পকার জীবনানন্দকে স্মরণ করেই। সে বছর জীবনানন্দের অনেক নতুন অপ্রকাশিত লেখাপত্র প্রকাশিত হয়। বিশেষ করে তাঁর গদ্য। জীবনানন্দকে কবি বলেই জেনেছি এতকাল, সেসময় তাঁর গল্পের, উপন্যাসের সাথে আমার বিশেষভাবে পরিচয় ঘটে। আমি বিস্মিত হই তাঁর কথাসাহিত্য রচনার প্রতিভায়। জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে জীবনানন্দের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কেও অনেক নতুন তথ্য প্রকাশিত হয়। সত্যি বলতে, তাঁকে নিয়ে একটা উপন্যাস লিখবার ভাবনা আমার সেই সময়েই প্রথম আসে, সেই ১৯৯৯ সালে। কিন্তু সেটা ভাবনা আকারেই ছিল। জীবনানন্দকে নিয়ে উপন্যাস লিখবার ব্যাপারে সিরিয়াসলি ভাবতে শুরু করি ২০১০ এর দিকে। ইতোমধ্যে আমার 'ক্রাচের কর্নেল' প্রকাশিত হয়েছে। জীবনীভিত্তিক উপন্যাস লেখার একটা অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। আমি ঠিক করি, জীবনানন্দ নিয়ে বইটা এবার লিখতে শুরু করব। নানারকম ভাবনা থেকে বইটা লেখার সিদ্ধান্ত নেই। আমার প্রিয় একজন লেখককে নিংড়ে জানা এবং আমার উপরে জীবনানন্দ যে ভর করেছেন তা থেকে মুক্ত হবার একটা উপলক্ষ ছিল এই বই লেখা। তাছাড়া আমি আমার নিজের লেখক সত্তার সাথেও মোকাবেলা করতে চেয়েছি আরেকজন লেখকের মুখোমুখি হয়ে। এই বই লেখা অনেকটা আমার নিজেকে চেনার প্রক্রিয়ারও একটা অংশ। প্রস্তুতি হিসেবে আমি তখন জীবনানন্দের সব লেখাপত্র যোগাড় করতে শুরু করি। বিচ্ছিন্নভাবে তার লেখাপত্র তো পড়া ছিলই এবার তাঁর কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ডায়েরি এবং তাঁকে নিয়ে লেখা যতরকম বই–যতটা সম্ভব যোগাড় করি এবং সিস্টেম্যাটিকভাবে পড়তে শুরু করি। আমি বিদেশের একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করি, ফলে আমার নানা কসরৎ করে সাহিত্যের জন্য সময় বের করতে হয়। আমি কাজের ফাঁকে বছর তিন চারেক ধরে জীবনানন্দ বিষয়ক বইপত্র শুধু পড়েছি। বহু লেখা, বই একাধিকবার পড়েছি। তারপর কলকাতা গেছি, বরিশাল গেছি জীবনানন্দের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট জায়গাগুলোর স্পর্শ পেতে। তাঁর জীবন এবং ভাবনাকে নিজের মধ্যে আয়ত্তে আনতে আমার বছর তিন, চারেক লেগেছে। এরপর আমি জীবনানন্দ বিষয়ে আমার নিজের একটা যাত্রা হিসেবে একজন কমলালেবু বইটা লিখতে শুরু করি। লিখতেও বছর দুয়েক সময় লেগেছে।

~ www.amarboi.com ~

মাসউদ : এই উপন্যাসের দুটো ভার্সন আমরা পেয়েছি–প্রকাশিত বই ও পত্রিকায়, এটা কেন হলো? আর একটি বিষয়–আপনার লেখার একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কোনো একটি লেখা লিখিত হওয়ার পরে আবার লেখা, বারবার লেখা; এই উপন্যাসের ক্ষেত্রেও কি তেমনটি হয়েছে?

শাহাদুজ্জামান : আসলে এই উপন্যাসের বেশ কয়েকটা ভার্সন আমি লিখেছি। যেমন বললেন, আমার অন্য লেখার মতো এই বইটার ক্ষেত্রেও বারবার রিভাইস করতে হয়েছে। সত্যি বলতে, এই বইটা নিয়ে বরং বেশিই টানাপোড়েনে ছিলাম। জীবনানন্দ-বিষয়ে যাবতীয় তথ্য, ভাবনা যোগাড় করার পর কীভাবে তা উপস্থাপন করব সেটা আমাকে বেশ ভাবিয়েছে। বইয়ের কনটেন্ট আমার জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু এর ফর্মটা নিয়ে আমি বেশ চ্যালেঞ্জে ছিলাম। ফর্ম নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে আমি পছন্দ করি। আমার ছোটগল্পগুলোতে লক্ষ করবেন আমি ফর্মের নানারকম চর্চা করেছি। উপন্যাসে ফর্মের নিরীক্ষা তুলনামূলকভাবে দুরূহ। এই বইটার যে প্রথম ভার্সন ছিল সেটা এখনকার ভার্সনের চেয়ে একেবারেই ভিন্ন। সেখানে আমি বেশ কতগুলো কাল্পনিক চরিত্র তৈরি করেছিলাম, যাদের পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্কের ভেতর দিয়ে জীবনানন্দকে উন্মোচন করার চেষ্টা ছিল। ফর্মটাও ছিল ভিন্ন। বইটা শুরু করেছিলাম দুজন কাল্পনিক চরিত্রের ভেতর চিঠি চালাচালি দিয়ে। সেই ফর্মে অনেক দূর লিখেছিলাম। কিন্তু একপর্যায়ে টের পেয়েছি, ঐ সৃষ্ট চরিত্রগুলোর নিজস্ব বিকাশ-পরিণতির জন্য বইটাতে অনেকটুকু স্পেস দিতে হচ্ছে, তাছাড়া তাতে বইয়ের মূল ফোকাসও অনেকটা ব্যাহত হচ্ছে। আমি তারপর সেইসব কাল্পনিক চরিত্রগুলোকে বাদ দেই। শুধুমাত্র জীবনানন্দের জীবন এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষজনের ভেতরেই চরিত্রগুলোকে সীমিত রাখি। একসময় আরো একটা ভার্সনে লিখেছিলাম, যেখানে আমি কল্পনা করেছিলাম যে জীবনানন্দের সাথে আমার দেখা হয়েছে; তারপর তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেই আমি তাঁকে নিয়ে বইটা লিখছি। এসব ইমারিজনারি ব্যাপারগুলো পরে বাতিল করি। এরপরের ভার্সনে কাল্পনিক চরিত্র বাদ দিলেও ফর্মে খানিকটা নিরীক্ষা করি। আমি লিনিয়ার স্টোরি টেলিং না করে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের ন্যারেশনকে মিলিয়ে ফেলি। আমি তাঁর ট্রাম দুর্ঘটনার দৃশ্য দিয়ে গল্পটা শুরু করে তাঁর শৈশবে ফিরে যাই, আবার শৈশব থেকে ফিরে আসি দুর্ঘটনার পর হাসপাতালে ভর্তি অবস্থায় তাঁর অন্তিম মুহূর্তে, সেখান থেকে ফ্ল্যাশব্যাক করে আবার চলে যাই তাঁর যৌবনের দিনে; আবার ফ্লাশ ফরোয়ার্ড করে চলে আসি হাসপাতালে। এভাবে বইটা অনেকদূর লিখেছিলাম। সেই ভার্সনেরই অংশবিশেষ ছাপা হয়েছিল প্রথম আলোর ঈদসংখ্যা ২০১৬ সালে। তখন নামটাও ছিল ভিন্ন–'যে মানুষ কমলালেবু হতে চায়'। কিন্তু পরে এই ফর্মটাও বদলে ফেলি। নামটাও বদলে ফেলি। এই বইটার সম্ভাব্য প্রায় এক ডজন নাম আমি ঠিক

~ www.amarboi.com ~

করেছিলাম। অনেক ভেবে চিন্তেই আমি 'একজন কমলালেবু' নামটা নির্বাচন করি। আসলে লেখা তো একটা অর্গানিক প্রক্রিয়া, লিখতে লিখতেই আমার নিজের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল এই বই নিয়ে আমার যাত্রার পথ। আমার মনে হচ্ছিল, ফর্মের নিরীক্ষা করে একধরনের ইন্টেলিকচুয়াল এক্সারসাইজ হয় বটে, কিন্তু সেটা এই বইয়ের মূল উদ্দেশ্যকে বিশেষ সাহায্য করে না। আমি শেষে গল্প ন্যারেশনের ক্ষেত্রে নীরিক্ষার চিন্তা বাদ দেই। আমি তার দুর্ঘটনা দৃশ্য থেকে গল্প শুরু করে চলে যাই তাঁর শৈশবে এবং তারপর ধারাবাহিকভাবে এক রকম লিনিয়ার ন্যারেটিভের মাধ্যমে তাঁর জীবনের পরিণতির দিকে এগুতে থাকি। এতে করে আরো নিবিড়ভাবে জীবনানন্দের জীবন, তাঁর সত্ত্বার নানা আলোড়নের সাথে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পাই। এই ভার্সনটাই যে সবচেয়ে ভালো হয়েছে তা হয়তো বলা যাবে না, কিন্তু লিখতে লিখতে এই ধারাতে লেখাকেই তখন আমার যথার্থ মনে হয়েছে। অন্যভাবে লিখলে কেমন দাঁড়াত ব্যাপারটা, সেটা এখন তো আর বলা সম্ভব না। তবে আমি শুরু থেকে একটা ব্যাপার নিশ্চিত ছিলাম যে, আমি জীবনানন্দের জীবনী লিখতে বসিনি। আমি আমার মতো করে জীবনানন্দের জীবনকে পুনর্নির্মাণ করেছি। ফলে তাঁর জীবনের যাবতীয় তথ্য সম্বলিত ধারাবিররণী দেওয়ার কোনো দায় আমার ছিল না। এ বই জীবনানন্দকে নিয়ে আমার নিজের ব্যক্তিগত যাত্রা। যেভাবে আমি জীবনানন্দের জীবনকে কম্পোজ করেছি সেখানে লেখক হিসেবে আমার স্টেটমেন্ট আছে। একজন কমলালেবুতে লেখক হিসেবে আমিও হাজির আছি। বিটুইন দ্য লাইন পড়লে হয়তো দেখবেন–এ বই শুধু জীবনানন্দের গল্প না, আমারও গল্প। এই দুই গল্প মেলাতে গিয়ে তাই আমাকে বেশ কয়েকটা ভার্সনে লিখতে হয়েছে।

মাসউদ : আপনার লেখালেখির একটা কৌশল এই যে, যে কোনো রকম লেখা লিখিত হওয়ার পর, ছাপতে দেওয়ার আগে আপনি কাছের মানুষদের পড়ান এবং তাদের মতামত জেনে নেন; এটা কেন করেন? একজন কমলালেবুর ক্ষেত্রেও কি এমন ঘটেছে?

শাহাদুজ্জামান : হ্যাঁ, কমলালেবুর ব্যাপারেও তা হয়েছে। আমি কমলালেবু বইটার যে বিভিন্ন ভার্সনের কথা বলছিলাম–সেগুলো আমি আমার কাছের কিছু মানুষদের পড়িয়েছি এবং পরিবর্তন করবার সময় তাদের মতামতগুলোকে বিবেচনায় নিয়েছি। আসলে লেখক হিসেবে আমি তো আমার লেখার ভেতর ডুবে থাকি, ফলে লেখার সাথে আমার একটা গভীর আবেগগত সম্পর্ক থাকে। এই আচ্ছন্নতার যেমন শক্তি আছে, সীমাবদ্ধতাও আছে। একজন নিরপেক্ষ পাঠক যার সাথে এই লেখাটার কোনো পূর্ব আবেগগত সম্পর্ক নাই, তিনি যদি লেখাটা পড়েন তখন তার যে প্রতিক্রিয়া হয় তা লেখক হিসেবে আমার জন্য খুব কাজের।

~ www.amarboi.com ~

বিদেশের বড় প্রকাশনা সংস্থার সবসময় এডিটর থাকেন। এডিটররা একটা পাণ্ডুলিপি নির্মোহভাবে দেখেন। তারা লেখার টেকনিক্যাল ব্যাপার যেমন দেখেন তেমন এর ভাবনা, বিষয় নিয়েও মতামত দেন। তারা নেহাত প্রুফ রিডার নন। তারা সাহিত্যবোদ্ধা। লেখায় বানান, ভাষা, তথ্যের ধারাবাহিকতা বিষয়ে তারা মতামত যেমন দেন, তেমনি বইয়ের কোনো চরিত্র, ভাবনা, প্রেক্ষাপট নিয়েও তারা লেখকের সাথে বিতর্ক করেন। 'কাইট রানার' খ্যাত আফগান লেখক খালেদ হুসাইনীর এক সাক্ষাৎকারে পড়ছিলাম, কী করে তার এডিটরের আলাপের প্রেক্ষিতে তিনি তার পাণ্ডুলিপি আমূল বদলে ফেলেছিলেন। এডিটর একজন লেখকের ক্রিটিক্যাল ফ্রেন্ড। আমাদের দেশে প্রকাশনার জগতে এডিটর ধারণাটা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠেনি। ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু এডিটর কাজ করেন জানি। লেখক হিসেবে আমি এমন একজন ক্রিটিক্যাল ফ্রেন্ডকে খুব প্রয়োজন বোধ করি। আমার কিছু কাছের মানুষ আছে যাদের সাহিত্যরুচির ব্যাপারে আমার আস্থা আছে। আমি আমার লেখা ছাপাবার আগে তাদের পড়তে দেই। কারণ আমি জানি তারা নেহাত বন্ধুকৃত্য করবে না, শুধু আমাকে খুশি করবার জন্য প্রশংসা করবে না। তারা আমাকে খুব নির্মমভাবে সমালোচনা করে। সেটা আমার জন্য খুব কাজের। একজন কমলালেবুর পাণ্ডুলিপি আমি আমার সেইসব ক্রিটিক্যাল বন্ধুদের পড়িয়েছি এবং তাদের পরামর্শ নিয়েছি।

মাসউদ : একজন কমলালেবুতে জীবনানন্দই প্রধান চরিত্র; আর তাঁর সংসার ও পরিপার্শ্ব, তাঁর লেখকজীবনের অভিঘাতও। কিন্তু এসবের সমান্তরালে আপনি উপন্যাসের কাঠামো ব্যবহার করে যেন একটি গবেষণাপত্র তুলে ধরেছেন–এর কী ব্যাখ্যা দেবেন? ঐতিহাসিক বা জীবনভিত্তিক উপন্যাসে তথ্য ও ইতিহাস-সমর্থিত-সত্য ধারণ করা দরকারি বিষয়। কিন্তু তথ্য-সূত্র-টীকা ও দীর্ঘ উদ্ধৃতি যদি পাঠকের পাঠকে ব্যাহত ও ভারাক্রান্ত করে, লেখকের দায় বা মুক্তিটা কীভাবে হতে পারে?

শাহাদুজ্জামান : জীবনীভিত্তিক উপন্যাস লেখার জন্য গবেষণা তো অনিবার্য। এই বইটা লিখবার জন্য আমার দীর্ঘদিন ধরে পঠন-পাঠন করতে হয়েছে। একাডেমিকভাবে গবেষণা আমার কাজের ক্ষেত্র, ফলে আমি পদ্ধতিগতভাবে গবেষণা করেছি। ইতিহাস বা জীবনীভিত্তিক গবেষণার জন্য অন্তত দুটো সূত্র থেকে তথ্য যাচাই করতে হয়। তথ্যের সত্যতার জন্য আমি যে কারণে যতগুলো সূত্র থেকে সম্ভব তথ্য যাচাই করেছি। এছাড়া জীবনানন্দের মনোজগৎকে বুঝতে তাঁর কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্পগুলোকে, বারবার পড়তে হয়েছে। তাঁর ব্যক্তিজীবন, লেখকজীবনের সমান্তরাল পরিক্রমাকে বোঝার চেষ্টা করেছি। এক্ষেত্রে তাঁর লেখাপত্র ছাড়াও তাঁর চার হাজার পৃষ্ঠার ডায়েরি খুব কাজে দিয়েছে

~ www.amarboi.com ~

যা ভূমেন্দ্র গুহ সম্পাদনা করেছেন। বিশেষ করে ত্রিশ দশকে যখন তিনি গল্প উপন্যাস লিখতে শুরু করেছেন, সে-সময়কার তাঁর মনোজগৎটা বুঝবার জন্য তাঁর ডায়েরিগুলো খুবই সাহায্য করে। তাঁর ডায়েরিতে লেখা একটা ভাবনাকে দেখতে পেয়েছি–একই সাথে কবিতা, গল্প এবং উপন্যাসে রূপান্তরিত করেছেন জীবনানন্দ। ডায়েরির পাতার তারিখের সাথে কোনো একটা বিশেষ কবিতা বা গল্প লেখার তারিখ মিলিয়ে দেখেছি। খুব শ্রমসাধ্য কাজ এসব; কিন্তু এটা ছিল আমার জন্য এক চমৎকার খেলার মতো। তো গবেষণা আমি পুরোদস্তুর করেছি। কিন্তু আমি কোনো গবেষণাপত্র লিখতে বসিনি। গবেষণার তথ্য রূপকথার গল্পের সেই ব্যাঙের মতো যাকে রাজকন্যা চুমু দেওয়াতে সে রাজপুত্র হয়ে ওঠে। নেহাত তথ্য তো ব্যাঙের মতোই, তাকে সুদর্শন রাজপুত্র কবে তুলবার জন্য দরকার সাহিত্যিক ছোঁয়া। আমি সে চেষ্টা করেছি। আমি নিজে ফিকশন এবং নন ফিকশন দুরকম লেখাই লিখি এবং এই দুই ধারার লেখাকে ব্লেন্ড করার চেষ্টা করি। যাকে আমি ডকু-ফিকশন বলেছি। আমার এই ব্লেন্ডিং সর্বাংশে সফল হয়েছে সে দাবি আমি করি না। বইটাকে আরো পরিশীলিত করার সুযোগ বরাবরই রয়ে গেছে। কিন্তু একজন কমলালেবু কোনভাবে গবেষণাপত্র না। গবেষণাপত্রের আবেদন মূলত মানুষের চিন্তার কাছে, আবেগের কাছে না। গবেষণাপত্রের দায় থাকে তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর। আমার বইটা কোনো সিদ্ধান্ত দেয় না, বরং তা শেষ হয়েছে প্রশ্নে। 'একজন কমলালেবু' পড়ে আবেগ আক্রান্ত হয়ে অগণিত পাঠক আমাকে মেইল করেছেন। গবেষণাপত্র পাঠ করে কেউ আবেগে বিহবল হন না। একজন কমলালেবুর তথ্য, সূত্র, টীকা পাঠকে ভারাক্রান্ত করেছে এমন মন্তব্য অবশ্য আমি পাইনি। তবে বইটি উপন্যাস না জীবনীগ্রন্থ–তা নিয়ে বিতর্ক শুনেছি।

মাসউদ : যে কোনো ধরনের উপন্যাসে লেখক তাঁর স্বভাবনা ও কল্পনার স্বাধীনতাকে কাজে লাগান, কিন্তু আপনি পুরো উপন্যাসজুড়ে সত্য ও টেক্সুয়াল বিবরণের উপর নির্ভর করেছেন বলে মনে হয়েছে। এতে বিশেষ কোনো সমস্যা নেই। তবে অনেকেই সে-কারণে এই উপন্যাসকে জীবনীগ্রন্থ হিসেবে আখ্যা দিতে পছন্দ করছেন...

শাহাদুজ্জামান : পুরো উপন্যাসজুড়ে শুধু সত্য এবং টেক্সুয়াল বিবরণের উপর নির্ভর করেছি–কথাটা বোধহয় পুরোপুরি ঠিক না। নানা জায়গায় কল্পনা দিয়ে সেতু রচনা করতে হয়েছে আমাকে। তবে যেটা বলছিলাম–একটা বিশেষ ভাবনা থেকেই আমি এ বইটা লিখতে শুরু করি। সেই প্রক্রিয়াতে বইটার ধরন নির্দিষ্ট হয়েছে। আমার কাছে শিল্পের ব্যাপারে সীমাহীন সততা, অসম্ভব নিষ্ঠা, অভূতপূর্ব পরিশ্রমের মূর্তিমান উদাহরণ জীবনানন্দ। তৃতীয় বিশ্বের এমন একজন সাহিত্যিকের সংগ্রামকে বুঝে ওঠা আমার জরুরি মনে হয়েছে। সাহিত্য যে কী

~ www.amarboi.com ~

গভীর অতলে ডুব দেবার ব্যাপার আমরা যেন তা আজকাল ভুলতে বসেছি নানা বায়বীয় প্রণোদনায়। আমার তাই মনে হয়েছে, এই সময়ে দাঁড়িয়ে সাহিত্যিক হিসেবে জীবনানন্দকে বোঝা আমাদের দরকার। আমি তাই সবরকম কাল্পনিক চরিত্র বাদ দিয়ে, সব রকম নিরীক্ষা বাদ নিয়ে ডুব দিয়েছি শুধুই জীবনানন্দ নামের ঐ জলাশয়ে। ইচ্ছা করেই তাই সত্যনিষ্ঠ থাকতে চেষ্টা করেছি তাঁর জীবনের ব্যাপারে। কিন্তু আবারও বলছি, সত্য তথ্যনির্ভর কোনো জীবনীগ্রন্থ রচনার ইচ্ছা থেকে এই বই আমি লিখিনি। জীবনানন্দের বস্তুনিষ্ঠ জীবনী লিখেছেন প্রভাতকুমার দাস, সাহিত্যিক জীবনী লিখেছেন ক্লিনটন বুথ সিলি। নতুন করে সে কাজ করবার কোনো দরকার আছে বলে আমি মনে করিনি। সেইসব বইয়ের সাথে মিলিয়ে দেখলেই আমার বইয়ের সাথে পার্থক্যটা ধরা পড়বে। একজন কমলালেবু জীবনানন্দকে নিয়ে আমার একান্ত ব্যক্তিগত একটি যাত্রার বয়ান। জীবনানন্দের জীবনের যাত্রাটা জটিল, সর্পিল। আমি তাঁর সেই দুরূহ যাত্রাকে ধরতে গিয়ে তাঁর কবিতা, গল্প, ডায়েরি, প্রবন্ধ, চিঠি, বক্তৃতা–একটির সঙ্গে আরেকটিকে বুনবার চেষ্টা করেছি। আগেই বলেছি, ভালোভাবে লক্ষ করলে দেখবেন–একজন কমলালেবু বইতে যতটা জীবনানন্দ আছেন আমিও আছি তাঁর পাশাপাশি। আমি তাঁর লেখা নিয়ে, ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করেছি আবার আমিই উত্তর দিয়েছি। ডায়েরিতে কেন তিনি একটা কথা লিখছেন, ডায়েরির একটা কথার সাথে কবিতার একটা লাইন কীভাবে মিলে যাচ্ছে, সেখান থেকে কী করে আবার একটা গল্পের জন্ম হচ্ছে এসব খুঁটিয়ে আলাপ করেছি। তাকে নিয়ে কে কী বলছে কেন বলছে সেগুলোর ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করছি। জীবনানন্দ-বিষয়ক নানা প্রসঙ্গে বিবিধ ব্যাখ্যা হতে পারে, সেখান থেকে একটা নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা আমি নির্বাচন করছি। এ ব্যাখ্যা একান্ত আমার নিজস্ব। জীবনানন্দের মৃত্যু একটা প্রতীকী হত্যাকাণ্ড কিনা সে প্রশ্ন আমি তুলছি। এসবই আমার জীবনানন্দ-যাত্রার অংশ। আমি তাঁকে যেভাবে বুঝেছি সেভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছি, যেভাবে দেখেছি সেভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছি। লেখক হিসেবে আমি এই বইয়ে নিজেকে লেখক হিসেবে আড়াল করিনি। আমি সেখানে হাজির আছি। একজন কমলালেবু যতটা জীবনানন্দ দাশের গল্প, ততটাই জীবনানন্দের দিকে আমার তাকানোর গল্প। ফলে এটা নেহাত জীবনানন্দের আত্মজীবনী না। এছাড়া আমি আমার অন্যান্য লেখাতে বলেছি যে, সাহিত্যের নানা শাখার দেয়াল ভেঙে ফেলাতে আমার আগ্রহ আছে। গল্পের সাথে কবিতা, নাটক বা প্রবন্ধের চরিত্র মিলিয়ে দিতে আমার আপত্তি নাই। বিশ্ব প্রেক্ষাপটেও তো সাহিত্যের সংজ্ঞা ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। যেমন ধরা যাক, নোবেল বিজয়ী বাইলোরুশের লেখিকা সলভিয়েনা আলেক্সেভিচ সাংবাদিকতাকেই একটা উৎকৃষ্ট সৃজনশীলতায় নিয়ে গেছেন। গানের গীতিকার বব ডিলানও নোবেল পেলেন সাহিত্যে। আবার ধরেন, উপন্যাসের চরিত্রও তো কালে কালে

~ www.amarboi.com ~

বদলেছে। কয়েক শতক আগে উপন্যাস বলেই তো কোনো মাধ্যম ছিল না। আবার একসময় ইয়োরোপীয় লেখকরা উপন্যাসের প্রধান শর্ত বলে কিছু বিষয়কে দাঁড় করিয়েছিলেন। কিন্তু ল্যাটিন আমেরিকার ঔপন্যাসিকরা উপন্যাসের ইয়োরোপীয় সেই শর্ত মানেননি। চেক লেখক মিলান কুন্ডেরা বলছেন, নতুন যুগের উপন্যাসের মূল কাজ হচ্ছে 'Discovery of prose', গদ্যের নব আবিষ্কার। প্যারিস রিভিউ পত্রিকার এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলছেন উপন্যাসের আছে "...tremendous synthetic power, that it could be poetry, fantasy, philosophy, aphorism, and essay all rolled into one". কুন্ডেরা উপন্যাসের কোনো নির্দিষ্ট শর্তের বদলে সেখানে জ্ঞানকাণ্ড, রসকাণ্ডের সব শাখাকে মিলিয়ে ফেলবার কথা বলছেন। উপন্যাসের সংজ্ঞাকে উন্মুক্ত রাখছেন। আমি নিজেও বিশেষ ক্যাটাগরির বদলে আমার লেখাগুলোকে বরং 'সাহিত্যকর্ম' হিসেবেই দেখি। সুতরাং আমার এই বইয়ের ক্যাটাগোরাইজেশনের সমস্যা থেকে গেলেও অসুবিধা দেখি না।

মাসউদ : উপন্যাস লেখার প্রয়োজনে আপনি বরিশাল ও কলকাতায় গিয়েছেন তাঁর স্মৃতি-স্পর্শ লেগে থাকা জায়গা ও ছবি দেখতে; সৃজনশীল লেখকের জন্য সরেজমিন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন কতখানি গুরুত্বপূর্ণ?

শাহাদুজ্জামান : যে প্রেক্ষাপট নিয়ে একজন লেখক লিখছেন তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকার গুরুত্ব তো আছেই। তবে তা কোন মাত্রার তার নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম আছে বলে মনে হয় না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো এক লেখায় লিখেছিলেন–পদ্মা নদীর মাঝি লেখবার আগে তিনি কিছুদিন মাঝিদের সাথে বিড়ি-সিগারেট খেয়েছেন, গল্পগুজব করেছেন এই যা। এর বেশি কিছু না। মাঝিদের প্রাত্যহিক জীবনের নানা অনুষঙ্গের খোঁজখবর করতে তাদের মাঝে সময় কাটানো মানিকের কাজে লেগেছে। আবার আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে দেখেছি, তাঁর খোয়াবনামা উপন্যাসটা লিখবার আগে বহুবার বগুড়া-গাইবান্ধা এলাকায় গেছেন। আমি তখন কাজের সূত্রে গাইবান্ধা এলাকায় থাকতাম। ইলিয়াস ভাইকে নিয়ে ঐসব এলাকায় ঘুরে বেড়িয়েছি। দেখেছি, তিনি কীভাবে মানুষজনের সাথে কথাবার্তা বলে নানা রকম তথ্য সংগ্রহ করেছেন। একজন কমলালেবু লিখবার জন্য আমি সরেজমিনে খুব বেশি ঘোরাঘুরি করিনি। আমি মূলত প্রাপ্য লেখাপত্রের উপর নির্ভর করেছি। তবে সরেজমিন অভিজ্ঞতাও আমার ছিল। আমার বাবার কাজের সূত্রে আমরা বরিশালে ছিলাম বেশ কয়েক বছর। ফলে বরিশাল শহর, বিএম কলেজ, কীর্তনখোলা, বগুড়া রোড–জীবনানন্দের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট এসব জায়গাগুলো আমার চেনা। কলকাতা আগে বহুবার গেলেও একজন কমলালেবু লিখবার সময় বিশেষভাবে গিয়েছিলাম জীবনানন্দের

~ www.amarboi.com ~

স্পর্শ-লাগা জায়গাগুলো দেখতে। ঐ জায়গাগুলোর একটা ফিল নিতে। ল্যান্সডাউন রোডের তাঁর বাড়িটা খুঁজে বের করে সেখানে গেছি। জানলাম, এখন তার মালিক কলকাতার একসময়ের চলচ্চিত্র নায়িকা দেবশ্রী। সরু গলির ভেতর যে বাড়িটায় তিনি থাকতেন–দেখলাম, তার দরজা বন্ধ। দরজায় পুরনো কড়া। আমার ধারণা, এই কড়া সেই সময়েরই। আমি দরজার কড়াটা নেড়ে চেড়ে দেখলাম। জীবনানন্দ মাইলের পর মাইল হেঁটে অনেক রাত করে কোনো কোনো দিন বাড়ি ফিরে এই দরজাতেই কড়া নাড়তেন হয়তো, নিচু স্বরে মেয়ে মঞ্জুকে ডাকতেন। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে–সেসব সময়টাকে ভাববার চেষ্টা করেছি। রাসবিহারী রোডের যে জায়গাটাতে ট্রামের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল সে জায়গার আশপাশটা ঘুরছি। শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে গিয়েছি, যেখানে জীবনানন্দ শেষ দিনগুলোতে ছিলেন। যেখানে তিনি মারা গেছেন, সেই হাসপাতালকে এখন তাঁর নামে নামকরণ করা হয়েছে। হাসপাতালের এমাজেন্সি রুমে গেলাম যেখানে জীবনানন্দ এডমিটেড ছিলেন। উঁকি দিয়ে দেখলাম– কাকতালীয়ভাবে ডাক্তাররা কোনো এক অ্যাক্সিডেন্ট রোগীকেই পরীক্ষা করছেন সেদিন। করিডোরে হাঁটলাম–যেখানে জীবনানন্দের বোন সুচরিতা একটা ফলের ঝুড়ি নিয়ে বসে থাকতেন। কলকাতায় সরেজমিনে যাওয়া আমার জন্য ছিল 'একজন কমলালেবু' লেখার একটা মানসিক পরিমণ্ডল তৈরি করার উপলক্ষ। একটা বেদনার স্মৃতি অবশ্য আছে এ প্রসঙ্গে। কলকাতায় ভূমেন্দ্র গুহের সাথে আড্ডা দেবার জন্য দিনক্ষণ ঠিক করে রেখেছিলাম–তার সঙ্গে আগে কথা বলে। যেদিন গেলাম, সেদিনই তিনি হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে আইসিইউতে ভর্তি হলেন এবং তার পরদিন মারা গেলেন। কী গভীর মমতায় জীবনানন্দের পাণ্ডুলিপিগুলোকে পুনর্লেখন করেছেন তিনি। জীবনানন্দকে নিয়ে কত গল্প করার ছিল তার সঙ্গে। একটা বড় সাধ অপূর্ণ রয়ে গেল আমার।

মাসউদ : বাস্তবের সত্য ও সামাজিক দায়কে ছাপিয়ে লেখকের হৃদয়ে থাকে আর-এক-রকমের সত্য; আপনার গল্পে তা প্রকাশ পায় এক ধরনের দর্শন–বলাই বাহুল্য, মার্ক্সীয় ভাবসমেত–এর পেছনে কী প্রেরণা কাজ করে? জীবনের নানা জিজ্ঞাসা, কৌতূহল ও ভাবনাতাড়িত দর্শন আপনার লেখায় মিশে থাকে; এটা কি আপনার স্টাইল নাকি স্বতঃস্ফূর্ত সৃজনমানসের প্রকাশ?

শাহাদুজ্জামান : আমার যাবতীয় লেখাপত্রের মূলে রয়েছে কৌতূহল, জিজ্ঞাসা। জীবনের নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে এবং তার সঙ্গে মোকাবেলা করতেই আমার লেখালেখি। সে হিসেবে সেটা তো আমার স্বতঃস্ফূর্ত সৃজনমানসেরই প্রকাশ। আর সামাজিক দায় বা মার্ক্সীয় দর্শনের যে কথা বলছেন তার একটা প্রেক্ষাপট তো আছেই। আমি যে সময় লেখালেখি শুরু করেছি তখন পৃথিবী স্নায়ুযুদ্ধের কবলে,

~ www.amarboi.com ~

পৃথিবী সমাজতন্ত্র এবং পুঁজিবাদী শিবিরে বিভক্ত। আর বাংলাদেশ তখন সামরিক শাসনের অধীনে। দেশকে সামরিক শাসনমুক্ত করা জরুরি মনে হয়েছে তখন আমাদের, তৃতীয় বিশ্বের একজন তরুণ হিসেবে আমি একটা বৈষম্যহীন সমাজের স্বপ্ন দেখেছি। ফলে মার্ক্সবাদ আমাকে আকর্ষণ করেছে। ফলে শিল্পসাহিত্যের চর্চার সাথে রাজনীতি, সামাজিক দায়ের প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমার কাছে। এখনও তেমন একটা বৈষম্যহীন সমাজের স্বপ্ন দেখি; তবে স্নায়ুযুদ্ধের সেই সময়ের রাজনীতি তো এখন বদলে গেছে। ফলে মার্ক্সবাদী দর্শনের আবেদনকেও নতুন করে ভেবে দেখবার দরকার আছে। উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্ব দিয়ে আমাদের বাস্তবতাকে বোঝা এখন বিশেষভাবে জরুরি বলে মনে করি।

মাসউদ : জীবনানন্দকে নিয়ে এই যে দীর্ঘ কাজ আপনি করে উঠেছেন–তাঁর একটি ছবি তো আপনার মনে আঁকা হয়েছে, সেই ছবিটা কেমন দেখতে?

শাহাদুজ্জামান : একজন কমলালেবু লিখতে গিয়ে একরকম জীবনানন্দের সান্নিধ্যেই থেকেছি একটা লম্বা সময়। মানুষটাকে বুঝবার চেষ্টা করেছি। একজন মানুষকে পুর্ণাঙ্গ বোঝা তো দুষ্কর, তার কতরকম ছায়া সত্তা থাকে; তবু তাঁকে অনেকটা বুঝেছি বলেই মনে হয়ে। তাঁর একটা ছবি তো মনের ভেতর তৈরি হয়েছেই। তাঁর মনের ছবি, দেহের ছবি। তাঁর একটা পরিচিত পোট্রেট ছবি আছে। স্টুডিওতে তোলা একটা ছবি যা ভূমেন্দ্র তাঁর ট্রাঙ্কে পেয়েছিলেন। সেই ছবিতে তাঁর চোখটা বিশেষভাবে টানে আমাকে। চোখের দৃষ্টির ভেতর একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে। মনে হয় তিনি যেন পথ ভুলে এই পৃথিবীতে এসেছেন। তাঁর অন্য কোথাও থাকার কথা ছিল, অন্য কোনো সময়ে। আসলে জীবনানন্দ সময়ের অনেক আগেই যেন পৃথিবীতে এসেছিলেন। কিছু কিছু প্রাণি থাকে তাদের ঘ্রাণশক্তি বা দৃষ্টিশক্তি প্রখর। তারা অনেক দূরের ঘ্রাণ পায়, কিংবা দেখতে পায় বহুদূরের কোনো দৃশ্য। জীবনানন্দকে পড়ে আমার মনে হয়েছে, তিনি যে সময়ে দাঁড়িয়েছিলেন তার থেকে বহুদূরের পৃথিবীর ঘ্রাণ তিনি পেতেন, দৃশ্য তিনি দেখতে পেতেন। বিশ শতকের প্রথম অংশে কেটেছে তাঁর জীবন, কিন্তু সেই সময়ে তাঁর দেশের এবং সারা পৃথিবীর মানবসত্তার নির্যাস তিনি ধারণ করেছিলেন–টের পেয়েছিলেন আগামী শতাব্দীর মানুষ কোন বোধের দোলাচলের ভেতর দিয়ে যাবে। আমাদের কাছে তাই তাঁর লেখা মনে হয় আমাদের সময়েরই একবারে নাড়ির সাথে যুক্ত। অসম্ভব মেধাবী একজন মানুষ। তাঁর প্রবন্ধ, ডায়েরিগুলো পড়লে বোঝা যায়–কী ব্যাপক তাঁর পঠন-পাঠন। সাহিত্য ছাড়াও তাঁর পঠন-পাঠন পদার্থবিদ্যা, ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি নিয়ে। এনসাইক্লোপেডিক তাঁর জ্ঞানজগৎ। কিন্তু শুধু মনন তাঁকে শাসন করেনি, মানুষের মনের নাজুকতার নিবিড় পর্যবেক্ষক তিনি। সেই মনন, সেই মনকে ধরতে গিয়ে

~ www.amarboi.com ~

তিনি বাংলা ভাষার গতিপথকে বদলে দিয়েছেন। তৈরি করেছেন একেবারে নিজস্ব এক সাহিত্যভুবন। ভাষায় বিস্ময়কর সব ইমেজ তৈরি করেছেন। তাঁর মতো এমন একজন অনন্য মেধাবী মানুষ তাঁর সমসময়ে

বিশেষ ঘনিষ্ঠজন যে কাছে পাননি তাতে অবাক হইনি। যে 'বোধ', যে 'বিপন্ন বিস্ময়' নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়াতেন তাতে নিঃসঙ্গতা তাঁর অনিবার্য পরিণতিই ছিল বোধহয়। তিনি ভেতর-গোটানো, মুখচোরা মানুষ ছিলেন বলেই সবাই জানিয়েছেন। এমনকি যে বুদ্ধদেব তাঁর সাহিত্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপাত করছেন তাকেও তিনি এড়িয়ে চলতেন। তাঁর সময়ে যত কথিত স্টার লেখক, তাদের তিনি এড়িয়ে চলতেন, কোনো সাহিত্যপরিমণ্ডলেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন না। তারা যেসব ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন সেগুলো হয়তো নিরর্থকই মনে হতো তাঁর কাছে। তিনি আরো বহুদূরের ঘ্রাণ নিয়ে তখন ব্যস্ত। তাছাড়া সাধারণভাবে তাঁর যাকে বলে সামাজিকতার দক্ষতা, সেটাও বিশেষ ছিল না। বেকারত্ব, দারিদ্র্য, তাঁর দাম্পত্য অসুখ–সব তাঁকে আরো পর্যুদস্ত করে ফেলেছিল। তিনি দেখতে শুনতেও ছিলেন খুবই সাদামাটা। সঞ্জয় ভট্টাচার্য যখন প্রথম তাঁকে দেখেন তখন তার মনে হয়–এই চেহারার লোক এমন অসাধারণ কবিতা লিখতেই পারেন না। বুদ্ধদেব তাঁকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, উনি যখন কাগজ কলম নিয়ে বসেন তখন তাঁর চেহারা পাল্টে যায়। তবে জীবনানন্দ নানা পাকচক্রে পড়া তাঁর নিজের জীবনযাপনকেই আবার একধরনের দূরত্বে দাঁড়িয়ে দেখেছেন এবং নিজের সঙ্গেই সাহিত্যিক মোকাবেলা করেছেন। বাইরে লাজুক হলেও ভেতরে ভেতরে তিনি ছিলেন খুব আত্মবিশ্বাসী একজন মানুষ, বিশেষ করে তাঁর সাহিত্যের বেলায়। অবলীলায় দুর্দান্ত সব সাহিত্যিক নিরীক্ষা করেছেন তিনি তাঁর কবিতায়, গল্পে। একাকী মানুষ ছিলেন ঠিকই আবার এও দেখতে পাই, বিশ্বস্ত মানুষ পেলে তিনি আড্ডা দিয়েছেন বিস্তর। ভূমেন্দ্রের সাথে তিনি কলকাতার বাসে বাসে ঘুরে গল্প করেছেন, তরুণ পাঠক প্রভাকর সেনের সাথে বহুবার কফিহাউজে বসে তার নিজের লেখা নিয়ে গল্প করেছেন। তাঁর কৌতুকপ্রিয়তার গল্পও করছেন তাঁর ঘনিষ্ঠজনরা। আমার ধারণা, যদি তাঁকে পেতাম তাঁর সঙ্গে আমি একটা চমৎকার আড্ডায় মেতে উঠতে পারতাম। সেটা তো একেবারে অবিশ্বাস্য কল্পনাও না, কারণ তিনি আমার প্রজন্মের চাইতে একেবারে অসম্ভব দূরত্বেও ছিলেন না। অকালে প্রয়াত না হলে আমি যখন লেখালেখি শুরু করেছি সেই আশির দশকে, তাঁর বেঁচে থাকা তো অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। হয়তো বৃদ্ধ হতেন তবু তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ তো থাকত। কল্পনা করি, হয়তো কলকাতার কফিহাউজে তাঁর সঙ্গে গল্প করছি, তিনি বরিশালে আসতে না পারার আক্ষেপ করছেন। হয়তো বরিশালের ভাষায় আমাকে বলছেন–'মোর বাড়ি বরিশাল মোর দাদা চহিদার' বলে তার সেই বিখ্যাত কাঁধ ঝাঁকানো হাসি হাসছেন।

~ www.amarboi.com ~

মাসউদ : 'একজন কমলালেবু' কীভাবে লেখা হলো ব্যাখ্যা করে অন্তরালের গল্পে আপনি জানিয়েছেন, একজীবনে যতবার যতভাবে জীবনানন্দ আপনার উপর ভর করেছেন, ধরা দিয়েছেন–তা বলতে চেয়েছেন এ উপন্যাসে। সবটুকু বলতে পেরেছেন বলে মনে হয়?

শাহাদুজ্জামান : না, সবটুকু মোটেও বলতে পারিনি। জীবনানন্দকে তার পুরোটা নিয়ে ধরতে চেয়েছি, কিন্তু বইটা লিখবার পর মনে হয়েছে তাঁর জীবনের আরো বহু চোরা গোপ্তা মাত্রায় আলো ফেলা হয়নি। বইটাকে একটা বিশেষ কাঠামোতে বাঁধতে গিয়ে অনেক কথাকে বাদ দিতে হয়েছে আমাকে। তাঁর জীবনের এক একটা পর্ব নিয়েই এক একটা পৃথক বই হতে পারে। একজন কমলালেবু নিয়ে একটা বিশেষ যাত্রা আমি শুরু করেছিলাম এবং একসময় মনে হয়েছে, এ যাত্রাটা শেষ করা দরকার। তাই বইটা শেষ করেছি। আগেই বলেছি যে বইটা নিয়ে আরো কয়েকটা ভিন্ন যাত্রা আমি শুরু করেছিলাম। যাত্রার সেই পথ ধরলে হয়তো বইটা অন্য রকম হতো, মেজাজে আঙ্গিকে। মাঝে মাঝে মনে হয় তাঁকে নিয়ে সেই ভিন্ন যাত্রাগুলোও যদি করা যেত বেশ হতো। কিন্তু জীবন তো আমাদের ছোট। কত কিছু করবার ভাবনা হয়, সময় কোথায়?

মাসউদ : একজন মানুষ সবার প্রিয় হন না। জীবনানন্দও সবার প্রিয় ছিলেন না। আপনি তাঁর ভীষণ অনুরাগী। সেক্ষেত্রে তাঁকে যখন উপন্যাসের ক্যানভাসে ধরলেন, তাঁকে নিয়ে নানা মত ও মন্তব্য আছে ভালো মন্দ মিলিয়ে, আপনি তাঁকে কোন এঙ্গেলে ধরলেন?

শাহাদুজ্জামান : আমি তাঁকে কোন এঙ্গেলে ধরেছি তার উত্তর তো আছে আমার উপন্যাসেই। আমি জীবনানন্দের অনুরাগী বটে, তার মানে তো এই নয় যে আমি কেবল তার গুণকীর্তন করবার জন্য একটা বই লিখছি। নানা ভালো-মন্দ মিলিয়েই তো একজন মানুষের সত্তা। আমি জীবনান্দের সেই সত্তাকে ধরতে চেষ্টা করেছি। তিনি ভালো মানুষ না মন্দ মানুষ ছিলেন সে বিচারের কাঠগড়ায় তাকে দাঁড় করাবার জন্য তো লিখতে বসিনি। জীবনানন্দের জীবনের নানা মাত্রার খোঁজ পেয়েছি যা প্রচলিত সামাজিকতার মাপকাঠিতে হয়তো গ্রহণযোগ্য না। যেমন ধরা যাক, তিনি বেশ্যালয়ে গেছেন সে কথা ডায়েরিতে লিখেছেন। জীবনানন্দের যে ইমেজ অনেকের মনে আছে তাতে এ ধরনের একটা তথ্যকে গ্রহণ করা বেশ অস্বত্তির। আমি চাইলে এই তথ্যকে আমার বইয়ে উল্লেখ নাও করতে পারতাম। কিন্তু তিনি কোন তীব্র এক মানসিক সংকটের ভেতর ডায়েরির ঐ কথাগুলো লিখছেন সেই প্রেক্ষিতটা আমি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি বিস্তারিতভাবে। জীবনানন্দের ভেতর ঈর্ষা ছিল, স্ট্যাটাস অ্যাংজাইটি ছিল–এসব কথা লিখেছি। আমি একজন মানুষকে তাঁর সামগ্রিকতায়

~ www.amarboi.com ~

ধরতে চেয়েছি। একজন মানুষ শুধুমাত্র তার নিরঙ্কুশ ভালোত্ব দিয়ে একজনের প্রিয় হয় না। নানা সীমাবদ্ধতা নিয়েও একজন মানুষ প্রিয় হয়ে উঠতে পারে। জীবনীভিত্তিক উপন্যাস লেখার একটা ঝুঁকি হচ্ছে যাকে নিয়ে লেখা হচ্ছে তাঁর ব্যাপারে অন্ধ প্রেম। সে ব্যাপারে আমি সতর্ক থেকেছি।

মাসউদ : লেখার সময় পাঠকের কথা কি আপনার মাথায় থাকে–সম্ভাব্য কোন শ্রেণির পাঠক আপনার লেখা পড়বে? এ উপন্যাসে নানা ধরনের লেখার সূত্র ও যোগসূত্র বেঁধে দিয়ে আপনি একটা ধূসর এলাকার সন্ধান তৈরি করতে চেয়েছেন; আপনার পাঠক কি ধরতে পারছে বলে মনে করেন? পাঠকদের প্রতিক্রিয়া বিষয়ে কিছু বলুন?

শাহাদুজ্জামান : পাঠকের কথা মাথায় রেখে ঠিক লিখি না কখনো। তবে তেমন পাঠক প্রত্যাশা করি, যারা তাদের পাঠের চেনা ভূগোল থেকে বেরিয়ে এসে নতুন পথে হাঁটবার ব্যাপারে আগ্রহী। একজন কমলালেবু বইটার পাঠ-প্রতিক্রিয়া পেয়েছি বিস্তর এবং বেশ অভূতপূর্ব মাত্রাতেই বলব। এখন তো পাঠকের সাথে যোগাযোগ খুবই সহজ। তারা ইমেইলে, ফেইসবুকে সরাসরি তাদের প্রতিক্রিয়া জানান। একজন কমলালেবু নিয়ে এমন অগণিত মন্তব্য আমি পেয়েছি এবং এখনও অবিরাম পাই; বইটা ২০১৭ সালের বইমেলাতে প্রকাশিত হয়েছে এবং মেলার ভেতরই এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তারপর অবিরাম নতুন মুদ্রণ হচ্ছে। পাঠক যে ব্যাপক আগ্রহ নিয়ে বইটা পড়ছে সেটা বোঝা যায়। বইটা নিয়ে নানা তর্ক বিতর্ক আমি অনলাইনে, অফলাইনে দেখেছি, শুনেছি। বইটা নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বহু পাঠক রিভিউ লিখেছেন। সাধারণভাবে বহু পাঠক আমাকে জানিয়েছেন, তারা এই বইয়ের মাধ্যমে জীবনানন্দকে নতুন করে চিনেছেন, নিবিড় করে জেনেছেন। বহুজন জানিয়েছেন বইটা পড়ে কতটা আবেগ আপ্লুত হয়েছেন তারা। নানা বিচিত্র প্রতিক্রিয়াও পেয়েছি। একজন পাঠক আমাকে জানিয়েছেন, এই বইটা পড়বার পর থেকে তিনি কমলালেবু খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন, কারণ কমলালেবু হাতে নিলেই তার মনে হয় তিনি জীবনানন্দকে হাতে নিয়েছেন। একজন কর্পোরেট ব্যবসায়ী যার অতিব্যস্ত জীবনে সামান্য ফুসরতও নেই, তিনি অফিসে যাওয়া-আসার পথে গাড়িতে বইটা শেষ করে জানিয়েছেন–এই বইটা পড়ে মনে হয়েছে এটা যেন তারই গল্প। এক অর্থে আমাদের সবার ভেতর তো গোপনে একজন জীবনানন্দ বাস করেন যে এইসব প্রতিদিনের গ্রন্থি মাংসের জীবন থেকে ছুটি চায়। আবার অনেক বিরূপ প্রতিক্রিয়াও পেয়েছি। বিশেষ করে যারা মনে করেন জীবনানন্দ-বিষয়ে তারা বিশেষভাবে জ্ঞাত, তাদের কেউ কেউ মনে করেছেন একজন কমলালেবু বইতে নতুন কিছু তারা পাননি। তাদের কারো

~ www.amarboi.com ~

কারো মতামতের ভেতর কিছু গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ দেখেছি, আবার অনেকের মন্তব্য থেকে বুঝেছি তারা বইটা পুরো না পড়েই বা বিশেষ কোনো একটা অংশ পড়েই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। অনেক আলোচনার ভেতর দু একটা সমৃদ্ধ রিভিউ আমি পেয়েছি যাতে নেহাত উচ্ছ্বাস বা নিন্দার বিপরীতে একটা বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা আছে যাতে এই বইয়ের শক্তি এবং সীমাবদ্ধতা কথা তারা বলেছেন। অনেকে আবার দেখেছি, আমি যেভাবে জীবনানন্দকে উপস্থাপন করেছি সেটা তাদের ভালো লাগেনি, তারা যেভাবে জীবনানন্দকে বুঝেছেন তার সঙ্গে এই বইয়ের মিল হয়নি বলে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। বইটার প্রথম দিককার সংস্করণে বেশ কিছু ছাপার ভুল ছিল সে ব্যাপারে অভিযোগ করেছেন অনেকে। সেসব ছাপার ভুলগুলো শুধরে নেওয়া হয়েছে পরবর্তী সংস্করণে। দু একজন পাঠকপাঠিকা ফেসবুকে দাবি করেছেন, বইটাতে তথ্যগত ভুল আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখেছি তারা কোনো একটা বিশেষ সূত্র থেকে হয়তো একটা তথ্য পেয়েছেন। কিন্তু আমি আগেই বলেছি, তথ্য ব্যবহারের ব্যাপারে আমি একাধিক সূত্র থেকে নিশ্চিত হয়েই ব্যবহার করেছি, ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে অভিযোগ আমার সঠিক মনে হয়নি। তবে নতুন সংস্করণে দু একটা ব্যাপারের তথ্য সংযুক্তি এবং কারেকশন আমি করেছি যা কোনো কোনো পাঠকপাঠিকা চিহ্নিত করেছেন। যারা মনোযোগ দিয়ে পড়ে পরামর্শ দিয়েছেন; তাদের ধন্যবাদ জানাই। কেউ কেউ আবার বইটার নাম নিয়ে ধন্দে পড়েছেন। 'একজন কমলালেবু' নামটা তাদের কাছে অদ্ভুত মনে হয়েছে। কিন্তু আগেই বলেছি, আমি বহু ভেবেই বইটার নামকরণ করেছি। ব্যাপার হচ্ছে একটা বই প্রকাশ হবার পর তা পাঠকপাঠিকার সম্পত্তি। একটা বইয়ের নানা রকম পাঠ থাকে। বই পাঠের পর পাঠকপাঠিকাদের আনন্দ বা আভিযোগ প্রকাশের এই তাড়না থেকে বুঝতে পারি, বইটা একটা অভিঘাত তৈরি করেছে। এই অভিঘাতগুলো আমার পরবর্তী লেখায় কাজে দেয়। আমি সাধারণত আমার বইয়ের প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে কখনো পাল্টা প্রতিক্রিয়া জানাই না। কিন্তু ভুল অভিযোগ করে একটি অত্যন্ত অরুচিকর প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলাম। সেই অভিজ্ঞতারটা খুব দুঃখজনক। আমার এক বন্ধুকে মজা করে বলছিলাম, চার প্রজাতির পাঠকপাঠিকার দেখা পাই। একদল কোকিল প্রজাতির। কোনো বই পাঠে যদি তাদের আনন্দ জাগে তারা সরবে সেই আনন্দের কথা চারদিকে জানায়। একদল আছেন প্রজাপতি প্রজাতির। তারা একটা বইয়ের কাছে আসেন শুধু মধু আহরণে। নীরবে মধু পান করে চলে যান আবার মধু না পেলেও কোনো উচ্চবাচ্য না করে চুপচাপ চলে যান অন্য ফুলে। আরেক ধরনের পাঠকপাঠিকা আছেন মশা প্রজাতির। তারা একটা বইয়ের কাছে আসেন শুধু কামড়বার জন্য। তারা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টান ফাঁক

~ www.amarboi.com ~

খুঁজবার জন্য–কোথায় কামড় বসানো যাবে। আবার আছেন মৌমাছি প্রজাতির পাঠকপাঠিকাও, যারা যদিও মধুর খোঁজেই আসেন কিন্তু বিরক্ত হলে হুল ফোটাতেও ছাড়েন না।

মাসউদ : আপনার গল্প-উপন্যাসের গদ্য একটু অন্য রকম–কবিতাগন্ধী নয়, তবুও কাব্যিক দ্যোতনা তো আছে; আপনি কি কবি হতে চেয়েছিলেন, অথবা কবিতা পাঠের অভিঘাত গদ্যে ছায়া ফেলে? এটা কি স্বেচ্ছাকৃত, না স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসে?

শাহাদুজ্জামান : না, কবি হতে চাইনি কখনো। কৈশরে কিছু কবিতা লেখার চেষ্টা করেছিলাম। তারপর আর কখনো কবিতা লেখার তাগিদ বোধ করিনি। যখন থেকে সিরিয়াসলি লিখতে শুরু করেছি, গদ্যই লিখেছি শুধু। কিন্তু কবিতার আমি অবিরাম পাঠক। সব সময় কবিতা পড়ি। শব্দের সবচেয়ে মহার্ঘ ব্যবহার কবিতায় হতে পারে। ভালো কবিতা যে আশ্চর্য আবহ তৈরি করতে পারে সে আবহে ডুবে যেতে চাই। ভালো কবিতায় বুঁদ হতে চাই। আমার অবিরাম কাব্যপাঠ হয়তো আমার গদ্যেও ছায়া ফেলে। আমি আগেই বলেছি, সাহিত্যের নানা শাখা এক জায়গায় এসে মিললে আমার আপত্তি নাই। আমার কিছু গদ্য কবিতাগন্ধী হয়তো কিন্তু সেটাকে আমি দুর্বলতা হিসেবে দেখি না, বরং গদ্যের একটা সম্ভাবনা হিসেবেই দেখি। কবিতার প্রতি ভালোবাসা থেকেই আমি আমার সবচেয়ে প্রিয় কবি জীবনানন্দকে নিয়ে উপন্যাস লিখেছি।

মাসউদ : আপনি শুরু থেকেই, সেই ১৯৯৬ তে প্রকাশিত 'কয়েকটি বিহ্বল গল্প'তেও দেখেছি, গল্পের কাঠামো ব্যবহার করে কিছু ক্ষেত্রে না-গল্পও লিখে আসছেন; গল্পে সরাসরি কোনো গল্প পাওয়া যায় না, কিন্তু দার্শনিক ভাবনা ও আলোকপাত উঠে আসে। এ নিয়ে আপনার বিবেচনা জানতে চাই। এই কৌশল কি একজন কমলালেবুতেও ব্যবহার করেছেন?

শাহাদুজ্জামান : গল্পের প্রচলিত আদি মধ্য অন্ত কাঠামো ভাঙার ব্যাপারে আমার বরাবরই আগ্রহ ছিল। আমি যেসব বিষয়ে লিখতে চাই, যেভাবে লিখতে চাই তার জন্য আমি নানা নতুন ফর্ম খুঁজেছি। আমি এ ব্যাপারে যেমন বিশ্বের শিল্পসাহিত্য দিয়ে প্রভাবিত হয়েছি তেমনি আমাদের লোকজীবনের গল্প বয়ান থেকেও প্রভাবিত হয়েছি। আমি যখন গল্প লিখতে শুরু করি সেসময় আমি নাটক, চলচ্চিত্র, চিত্রকলা ইত্যাদি মাধ্যমেও খুব আগ্রহী ছিলাম। নাটকে ব্রেখটের ফর্ম ভাঙার ব্যাপারটা আমাকে খুব প্রভাবিত করেছিল। চলচ্চিত্রে গদারও সেসময় নানা নিরীক্ষাধর্মী ফর্মে কাজ করেছিলেন সেগুলো নিয়ে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। চিত্রকলায় ইমপ্রেশনিস্টদের নিরীক্ষা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। পরে যখন

~ www.amarboi.com ~
কাজের সূত্রে গ্রামে-গঞ্জে ঘুরেছি তখন দেখেছি আমাদের লোকজীবনে, লোকশিল্পে ফর্ম ভাঙার নানা চর্চা আছে। যাত্রায়, পালা গানে এমনকি গ্রামে বিভিন্ন কবিরাজি ঔষধ বিক্রির মজমায় ক্যানভাসাররা কীভাবে গল্পে ফর্মকে ভাঙে, আমি তা আমি মনোযোগ দিয়ে দেখেছি। আমাকে তা আকর্ষণ করেছে। আমার নিজের লেখায় তার প্রভাব পড়েছে। আমি খুব সরল ন্যারেটিভে যেমন গল্প লিখেছি তেমনি ফর্ম ভাঙার সেইসব প্রথা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে গল্পের আঙ্গিকের নানা নিরীক্ষা করেছি। আর অনেক সময়েই গল্পে গল্প বলার চাইতে পাঠক পাঠিকাকে শুধুই একটা ভাবনার ভেতর রেখে দেবার চেষ্টাও আমি করি। আর আগের একটা প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছি যে, একজন কমলালেবু বইটাতে আঙ্গিকের নানা পরীক্ষার চেষ্টা করেছিলাম; কিন্তু পরে সে সিদ্ধান্ত বাদ দেই বইটার উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখেই।

মাসউদ : এই মুহূর্তে জীবনানন্দকে নিয়ে আপনার নতুন কোনো ভাবনা ও লেখার পরিকল্পনা আছে কি?

শাহাদুজ্জামান জীবনানন্দ-বিষয়ে বেশ কিছু ভাবনা, তথ্য, 'একজন কমলালেবু'তে ব্যবহার করিনি। সেসব নিয়ে গল্প, ছোট নিবন্ধ লেখার ইচ্ছা আছে ভবিষ্যতে।

মাসউদ : সবিনয়ে বলি–জীবনানন্দ দাশ, তাঁর সময় এবং সেই সময়ের কুশীলবদের নিয়ে আমি একটি উপন্যাস লেখার চেষ্টা করছি বছর কয়েক ধরে। ২০১৫-র গোড়ায় গল্পকার পারভেজ হোসেনের নিকট জানতে পারি, আপনি তাঁকে নিয়ে উপন্যাস লিখছেন। তখন বেশ হতাশ বোধ করি, এই ভেবে যে, শাহাদুজ্জামানের মতো শক্তিমান গল্পলেখক যদি এ বিষয়ে লেখেন, আমার আর লেখার মানে হয় না। কিন্তু ২০১৬-তে প্রথম আলো ঈদসংখ্যায় আপনার উপন্যাসটি পড়ে মনে বল পাই, যে, আপনি যেভাবে লিখেছেন, তাঁর জীবন ও দিনযাপনের ছবি যেভাবে এবং যে কাঠামোতে উপস্থাপন করেছেন–আমি তা লিখব না। আমার অভিনব এবং অন্যকিছুও বলার আছে। আমার প্রচেষ্টা এখনো অব্যাহত আছে। এক্ষনে জানতে চাই, এই সময়ে একজন নবীন লেখক যদি জীবনানন্দকে বিষয় করে উপন্যাস লিখতে চায়, আপনার পরামর্শ কী?

শাহাদুজ্জামান : জীবনানন্দকে নিয়ে নানারকম লেখা তো অব্যাহত থাকবেই। একজন লিখেছেন বলে অন্য কেউ লেখা থামিয়ে দেবার তো অর্থ নেই। আমি যখন জীবনানন্দকে নিয়ে লিখতে শুরু করি তখন আমি দেখবার চেষ্টা করেছি অন্য কে তাঁকে নিয়ে কী লিখেছেন, কীভাবে লিখেছেন। আমার মনে হয়েছে, অন্যরা যা লিখেছেন তাতে আমার বলার কথাটা উঠে আসেনি। আমার নতুন কিছু বলার

লেখা নিয়ে কথা-৫

~ www.amarboi.com ~
আছে এবং নতুনভাবে বলার আছে। এই ভাবনা থেকেই আমি একজন কমলালেবু লিখেছি। নতুন কোনো লেখক যদি মনে করেন জীবনানন্দকে নিয়ে তার আরো নতুন কিছু বলার আছে, এ যাবৎ যা লেখা হয়েছে তাকে ছাপিয়ে আরো নতুন কিছু তিনি লিখবেন, নতুনভাবে লিখবেন, নতুন করে ভাবাবেন তাহলে নিশ্চয়ই তিনি লিখবেন।

মাসউদ : সাক্ষাৎকার দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

শাহাদুজ্জামান : আপনাকেও ধন্যবাদ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কথা-চার

[এই কথোপকথন হয়েছে সুমন রহমানের সঙ্গে। সুমন রহমান কবি এবং গল্পকার। এই আলাপটা মূলত হয়েছে আমার সাম্প্রতিক গল্পের বই 'মামলার সাক্ষী ময়না পাখি' এবং সুমনের বই 'নিরাপরাধ ঘুম' নিয়ে পারস্পরিক মূল্যায়নকে ভিত্তি করে। সেই সূত্র ধরে সাহিত্যের বিবিধ প্রসঙ্গেও কথা হয়েছে। এই কথপোকথনটি ছাপা হয়েছে 'বণিক বার্তা' পত্রিকার ঈদ সংখ্যা 'সিল্লরুটে' ২০১৯ সালে।]

সুমন রহমান : ছোট গল্প মরে যাচ্ছে কি না–এমন একটা প্রশ্ন তুলেছিলেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস । আমার মনে হয়, এটি দিয়েই আমরা আলাপ শুরু করতে পারি। আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই এই লেখাটির কথা?

শাহাদুজ্জামান : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই মনে আছে। উনার যে ভাবনা কাজ করেছিল বলে আমার মনে হয় সেটা এই যে আমাদের সমাজের তো নানারকম বাঁক তৈরি হচ্ছে, সেগুলো গল্পে উঠে আসছে কিনা। তাছাড়া তখন সেই নব্বই দশকে যখন তিনি লেখাটা লিখেছেন ছোট গল্পের বই তেমন একটা কিন্তু বেরুত না। সেসময়টা ছোট গল্পের একটা সংকট চলছিল। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প যে নতুন দিগন্ত নিয়ে হাজির হয়েছিল বাংলা সাহিত্যে–সে শক্তির অস্তিত্ব এখনও আছে কি না–এই প্রশ্নই তুলেছিলেন ইলিয়াস। । দুর্দান্ত সব বিষয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কাজ করেছেন। সম্প্রতি আমি রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ নিয়ে হিন্দিতে একটা ফিল্ম সিরিজ করেছে সেটা দেখছিলাম। বহুদিন আগে পড়া গল্পগুলো নতুন করে স্বাদ নিলাম। গল্পে দারুণ শক্তিশালী সব থিম ডিল করেছেন তিনি। খুব পরিচিত গল্পগুলো যেমন–শাস্তি, বা দুই বোন। এ গল্পগুলোর ভেতর যে গভীর মোরাল ডিলেমা ডিল করা হয়েছে সেটা তো দারুণ। তাছাড়া তার গল্পে সেই সময়টাকে গভীরভাবে পাওয়া যায়। আজকের পাঠক পাঠিকা বাংলা গল্পে এইসময়ে বোধ, দ্বিধা, দ্বন্দ্বগুলো পাচ্ছেন কি না–এ প্রশ্নটাই হয়তো আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তুলতে চেয়েছেন। না পেলে গল্প তো ক্রমে মরেই যাবে। রবীন্দ্রনাথ যখন গল্প লিখেছেন সেসময়

~ www.amarboi.com ~

বিশ্বসাহিত্যের দিকে তাকালে দেখব–চেখভ, মোঁপাসা, ও হেনরি তারা গল্পে সারপ্রাইজ এলিমেন্টের উপর জোর দিয়েছেন অথচ রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সে ব্যাপারটায় বিশেষ জোর দেন নাই। তিনি থিমের উপর জোর দিয়েছেন। সেটা বেশ পাওয়ারফুল ব্যাপার। তারপর ধীরে ধীরে গল্পে ফর্মের পরিবর্তন এল। লাতিন আমেরিকার গল্পের কথাই যদি বলি, প্রচলিত ফর্ম-এ অনেক পরিবর্তন হয়েছে সেখানে। গল্পের ন্যারেটিভে চেঞ্জ হয়েছে। সারা পৃথিবীর গল্পই এরপর নানা এক্সিপেরিমেন্টের ভেতর দিয়ে গেছে। ছোটগল্প শুধুমাত্র গল্পই বলবে না, বরং এক ধরনের নতুন অ্যাসথেটিক অ্যাচিভমেন্টের দিকেও যাত্রা করবে এই প্রত্যাশাটা তৈরি হয়েছে। বাংলা ছোটগল্প সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারছে কিনা তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। ইলিয়াস যখন এ কথাগুলো বলছেন তখন সমসাময়িক জীবনকে নতুন এসথেটিকস দিয়ে ধরার নমুনা যে বাংলা ছোটগল্পে খুব একটা ছিল তা বলা যায় না। মনে আছে সেই আশির দশকে এসব প্রশ্ন দিয়ে যখন তাড়িত হচ্ছি তখন কলকাতার সুবিমল মিশ্র নানা এ্যান্টি ন্যারেটিভ গল্প লিখে বেশ চমকে দিয়েছিলেন। কোলাজ ফর্মে গল্প লিখতেন তিনি। তারপর বইয়ের নামকরণেও নানা র‍্যাডিকেল ব্যাপার করেছেন। যেমন তার বইয়ের নাম 'দু তিনটা উদোম বাচ্চা ছুটোছুটি করছে লেবেল ক্রসিং বরাবর'। রীতিমত একটা বাক্যই বইয়ের শিরোনাম। তার এইসব পরীক্ষা তখন সাহস দিয়েছিল। কলকাতায় গিয়ে তার সাথে লম্বা আড্ডাও দিয়েছিলাম। আমাদের এখানে শহীদুল জহিরের ভেতর সেই চেষ্টা ছিল। শহীদুল কন্টেন্ট, ফর্ম এবং ভাষা তিনটা ক্ষেত্রেই নতুন এসথেটিক্স তৈরির চেষ্টা করেছেন। ইলিয়াস ভাইয়ের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে অর্থাৎ আসলেই ছোট গল্প মরে যাচ্ছে কি না এ আশংকার জবাব শহীদুল জহির বেশ শক্তির সঙ্গে দিয়েছেন বলে আমার মনে হয়। ধরেন, তার লেখা 'ইন্দুর বিলাই খেলা' গল্পটির কথা। এখানে তিনি ভিজুয়াল বিষয়টিও যুক্ত করেছেন। ইঁদুরের ছবি এঁকে একটা ভিজুয়াল ফরম্যাটও ব্যবহার করেছেন। এটা নিয়ে তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। তার মতে, আরেকটি মিডিয়ামের ল্যাঙ্গুয়েজ আমি সাহিত্যের ভাষায় ঢোকাব না কেন? উনি গল্পের বা সহিত্যের বাউন্ডারিটা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

সুমন রহমান : সেক্ষেত্রে শহীদুল জহিরের সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতার জায়গা যেটি বলে মনে হয় আমার কাছে–সেটা হচ্ছে তাঁর অ্যাসথেটিক ফর্ম বা জাদুবাস্তবতার বিষয়টিকে তিনি আনক্রিটিক্যালভাবেই গ্রহণ করছেন। এটা তার ছোটগল্পে কম কিন্তু আছে। উপন্যাসে প্রবল আকারেই চোখে পড়ে। কার্পেন্তিয়ের, ইয়োসার মতো লেখকদের প্রভাব রয়েছে তার লেখায়। তবে আমি মনে করি তিনি এটি অ্যাডাপ্ট করেছেন খুব ক্রিয়েটিভলি। বলা যায় বাংলাদেশি ফর্মে তিনি আনতে পেরেছেন যদিও অনেক জায়গায় ওভার ইউজ রয়েছে। অন্যদিকে, ফর্মের

~ www.amarboi.com ~

ব্যাপারে তাঁর এক ধরনের অবসেশনও তৈরি হয়েছিল বোধ করি। প্রয়োজন নেই এমন অনেক জায়গায়ও তিনি এই জাদুবাস্তবতার চর্চা করে গেছেন।
তাঁর মনোযোগ মূলত ফর্মের উপর ছিল। ছোট গল্পে হয়তো এটা মানা যায় যে তিনি ফর্মের দিক থেকে নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। সেক্ষেত্রে গল্পই মুখ্য না বরং ফর্মটাই মুখ্য। এই যেমন তিনি লিখেছিলেন আগারগাঁ কলোনিতে নয়নতারা ফুল নেই কেন? এখানে স্টোরি তো নাই এখানে পুরোটাই ফর্ম। ফর্মের উপরই তাঁর কাজ করা।

শাহাদুজ্জামান : : জাদুবাস্তবতার অতি ব্যাবহার অনেক জায়গায় তিনি করেছেন তা হয়তো ঠিক। কিন্তু ঐ নয়নতারা গল্পটার ব্যাপারে আমি অবশ্য দ্বিমত পোষণ করেছি। ওখানে গল্প যে নেই তা কিন্তু না বরং আমার কাছে তো খুবই শক্তিশালী কন্টেন্ট বলেই মনে হয়েছে। নয়নতারা ফুল গাছ থাকা না থাকাকে প্রশ্ন হিসেবে এনে গল্পটা শুরু করে খুব ফ্যাসিনেটিং জায়গায় গিয়ে উনি শেষ করেছেন। গল্পের একটা অংশে ছিল– সবাই এসে ঢিল ছুড়ত সে গাছে, সেখানে প্রজাপতি আসত। সেসময় মার্শাল ল' চলছিল দেশে। গাছে ঢিল ছোড়া বন্ধ হলো। কীভাবে বন্ধ হলো? কারণ ঐ সময় নতুন প্রজেক্টে হিসেবে চিড়িয়াখানা করা হলো তারপর লোকজন সব চিড়িয়াখানা দেখতে চলে গেল। সেখানে থেকে প্রজাপতিও সব চলে গেল। খুবই ইন্টারেস্টিং আয়রনি আছে গল্পটাতে। মার্শাল ল' বিষয়টাকে যে এমন একটা জায়গা থেকে দেখা যেতে পারে, অর্থাৎ তার এ ভিশন আমার কাছে খুব উপভোগ্য মনে হয়েছে।

সুমন রহমান : অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে আমি এমন অ্যাডাপটেশনকে দোষ দেব না। দোষ দেই না এইজন্য যে, এতটুকুও তো আমাদের নাই। সেই অর্থে এটা অবশ্যই ভালো কিছু। ফিল্মের কথাই যদি বলি, আন্ডারগ্রাউন্ড নামে এমিলি কস্তুরিকার যে ফিল্মটা রয়েছে, সে ফিল্মের শুরুটা হলো : বোমা ফেলা হচ্ছে চিড়িয়াখানায় এমন একটা দৃশ্য দিয়ে। সাধারণত আমরা কি দেখি–বম্বিং হয় লোকালয়ে; কিন্তু এখানে দেখানো হলো চিড়িয়াখানায় বম্বিং হচ্ছে। চিড়িয়াখানার বন্দি অবুঝ প্রাণিরা বম্বিংয়ের সময় কী করছে সেটা দেখিয়ে আস্তে আস্তে এদিকে নিয়ে আসা। কার্পেন্তিয়ের-এর এ ধরনের অনেক এক্সপেরিমেন্টাল গল্প আছে। শহীদুল জহিরের গল্পগুলো পড়ার সময় আমার মনে হয় তিনি কার্পেন্তিয়ের থেকে অনেক কিছুই গ্রহণ করেছেন।

শাহাদুজ্জামান : তিনি অবশ্যই সেখান থেকে নিয়েছেন। অ্যাডাপটেশন ছিল তো বটেই। কিন্তু অনেকেই তার মৌলিকত্বের প্রশ্ন তুলেছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি খুব একটা কনসার্ন না মৌলিকত্ব নিয়ে। ঐ অর্থে মৌলিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলতে গেলে বলা যায় জগতে বহু সাহিত্যই মৌলিক না। শেক্সপীয়রের বহু নাটকই

~ www.amarboi.com ~

ইয়োরোপের নানা ফোক স্টোরির এডাপটেশন। তবে এখানে তার অবজারভেশনটা মৌলিক নিঃসন্দেহে।

শহীদুল জহিরকে আমি খুবই আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করি। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস আমাকে *জহিরের জীবন ও রাজনৈতিক* বাস্তবতা বইটি দিয়েছিলেন। সেসময় তার সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাও ছিল না। একজন লেখককে তো অন্যজন থেকে আলাদা করা যায় কীভাবে তিনি জীবনটাকে এক্সপেরিয়েন্স করছেন এবং তা প্রকাশ করছেন। লেখকের গল্পের ভেতর দিয়ে, তার লেখনীর ভেতর দিয়ে তার দেখার চোখ টের পাওয়া যায়। শহীদুল জহিরের সেই দেখার চোখ বেশ ইউনিক। কমল কুমার যখন আমি প্রথম পড়ি তখন তার লেখার ভাষা খানিকটা ঝামেলায় ফেললেও সে ভাষা ভেদ করে যখন উনার দেখার চোখ দেখছিলাম তখন মনে হয়েছে উনার দেখার চোখ একদম নতুন। নতুন করে মানুষকে দেখা, জীবনকে দেখা যায়। জল নামে তার একটা গল্প আছে যে গল্পটা মূলত একটা চোরের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা। সেখানে তিনি লিখেছিলেন এক চোরের বউ তাকে কুপির আলোতে খেতে দিয়েছে, এ দৃশ্যের ছায়া গিয়ে পড়েছে দেয়ালে। সে ছায়া মূলত কুপির আলোর কারণে আরো বিবর্ধিত রূপ নিয়েছে। নিমঅন্নপূর্ণা গল্পে দুর্ভিক্ষপীড়িত এলাকায় পাখির জন্য খাঁচায় যে খাবার রাখা হয়েছিল পাখির সেই খাবার চুরি করে খাচ্ছে একজন–দুর্ভিক্ষকে দেখার এই চোখ একদম ইউনিক। বাংলা ছোট গল্পে সেই ইউনিক চোখে কনটেমপোরারি সময়কে দেখার চর্চা হচ্ছে কিনা–ইলিয়াস ভাইয়ের প্রশ্নে ব্রডলি সেই আশংকাটাই ছিল।

সুমন রহমান : কমল কুমারের ক্ষেত্রে বলা যায় তিনি ভীষণ এক্সপেরিমেন্টাল। ভাষার এক্সপেরিমেন্টের কারণে কন্টেন্টের নিরীক্ষা চোখে পড়ে না। অথচ কন্টেন্টে উনি এরচেয়ে বেশি এক্সপেরিমেন্টাল। আপনার প্রথম বই যখন বেরোয় তখন তো আপনি শহীদুল জহিরের বই পড়েননি?

শাহাদুজ্জামান : আমার প্রথম বই তো বের হলো ৯০-এর মাঝামাঝি সময়ে, ১৯৯৬ তে। কাছাকাছি সময়ে বইটা (জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা) আমাকে ইলিয়াস ভাই দিয়েছিলেন। তার ছোটগল্প পড়েছি অনেক পরে।

সুমন রহমান : তার প্রথম বই জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা ৯০-এর প্রথম দিকে বের হয়েছে। সেসময় কারো চোখে তেমন পড়েনি সেটা। সে সময় আপনি যখন গল্প লেখেন তখন তো শহীদুল জহির নেই, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস আছেন, হাসান আজিজুল হক আছেন। আপনি একেবারেই তাদের ধারে কাছে গেলেন না। আপনার বই কয়েকটি বিহ্বল গল্প। সেসময়ের গল্পগুলো থেকে সূক্ষ্ম পার্থক্য আপনি ধরে রেখেছেন আপনার গল্পে। বলা যায়, এটাই আপনার প্রধান অস্ত্র। গল্প পঠনের আমাদের যে ইতিহাস–মানে বাংলা পাঠকের এটা পশ্চিমবঙ্গের

~ www.amarboi.com ~

গল্পে এভাবে নেই। তারা মূলত চমকিত করে প্লট দিয়ে, টুইস্ট দিয়ে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পে এমনটা থাকে না, হাসান আজিজুল হকের গল্পে এমনটা থাকে তবে সেটা এত বেশি রাজনৈতিক যে এটা অরাজনৈতিক ব্যক্তি মানুষের কিংবা রাজনীতিহীন ব্যক্তি মানুষের গল্প হিসেবে দাঁড়ায় না। যদিও উনার প্রথম দিকের গল্পগুলোতে নুয়ান্স ছিল। আপনার ওই বইটার লেখার সময় অর্থাৎ এ ধরনের গল্প লেখার সিদ্ধান্ত নিলেন কেন?

শাহাদুজ্জামান : আসলে আমি যখন লেখা শুরু করেছিলাম তখন খুব যে কনসাসলি এমন কিছু লিখেছি তা না। তবে আমার মনে হয়– আমার শিল্প সাহিত্যের যে অভারঅল ওরিয়েন্টেশন তার সাথে আমার গল্পের চরিত্র তৈরির একটা সম্পর্ক আছে। আমি কিন্তু সাহিত্যে এসেছি অন্য একটি মাধ্যম থেকে, আমি খুবই সক্রিয় ছিলাম ফিল্মে, থিয়েটারে। আমি সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম না সেভাবে। অনেকেরই যেমন থাকে ছোট বয়সে, কিশোর বয়সে, তরুণ বয়সে বিভিন্ন কবিতা, গল্প লেখে। আমার এমন কিছুই ছিল না। আমার প্রথম লেখা ছিল নন-ফিকশন, মার্ক্সিস্ট এসথেটিকস নিয়ে। আমি সাহিত্য নিয়ে কাজ করব এটা ভেবে আসিনি। আমার আগ্রহ এবং সম্পৃক্ততা ছিল চলচ্চিত্রের সঙ্গে, থিয়েটারের সাথে। এছাড়া পেইন্টিংয়ের সঙ্গে, চিত্রশিল্পীদের বিভিন্ন গ্রুপের সঙ্গে আমার বিচরণ ছিল। তবে আমি পাঠক ছিলাম সাহিত্যের। প্রচুর পড়তাম। আমার যেটা মনে পড়ে, আমি বেশ আগ্রহবোধ করেছিলাম অন্য মিডিয়ার ফর্ম ভাঙার বিষয়টাতে। তখন আমরা খুব আলাপ আলোচনা করতাম ফ্রেঞ্চ পরিচালক জাঁ লুক গদার নিয়ে। তিনি যে ফিল্মের ন্যারেটিভ ভাঙছেন এ বিষয়গুলো নিয়ে। এছাড়া থিয়েটারের ক্ষেত্রে ব্রেখটের ভাবনা দিয়ে প্রভাবিত ছিলাম। এরা সব মার্ক্সিস্ট আর্টিস্ট। তিনিও নাটকে ন্যারেটিভ ভেঙেছেন। সামাজিক বিদ্রোহের সাথে আর্টের বিদ্রোহকে মেলানোর চেষ্টা ছিল। আমার মনে আছে ঢাকায় ব্রেখটের উপর একটা ওয়ার্কশপ করিয়েছিলেন জার্মান নাট্যকার আলেকজান্ডার স্টিলমার্ক আশির দশকের শেষের দিকে। আমি সেটাতে অংশগ্রহণ করেছিলাম। সেখানে আমি ব্রেখটের এ্যালিনেশন থিওরির ব্যাপারে জানতে পারি। ঐ ওয়ার্কশপের পরই ব্রেখটের ঐ ন্যারেটিভ ভাঙার ব্যাপারটাতে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি আমার প্রথম গল্প লিখি অগল্প। গল্পের কাহিনি ভেঙে যে একটা নতুন এসথেটিক্স হতে পারে সে ব্যাপারটা আমাকে ভাবিয়েছিল। অগল্প-এ আমি সেই চেষ্টা করেছি। তখন ফিল্ম সোসাইটি শুরু করি, নানারকম ফিল্ম থিওরি পড়ি। সেখানেও এ্যান্টি-ন্যারেটিভ ফিল্মের কথা পড়ি, দেখি নানা ছবি। পেইন্টিংয়ের প্রতি আগ্রহের কারণে অ্যাবস্ট্রাকশনের হিস্ট্রি তখন পড়ছি, জানছি। তো অন্য মিডিয়াগুলোর মধ্যে যে ডিবেট চলছে, একটা লিনিয়ার ন্যারেটিভের বাইরে আসার যে চেষ্টা চলছিল তা আমাকে খুব অনুপ্রাণিত করেছে। আমার প্রথম দিককার গল্পে ফর্মের দিক থেকে

~ www.amarboi.com ~

আদি-মধ্য-শেষ এমন ধারাবাহিক গল্প বলার ব্যাপারে কোনো কমিটমেন্ট নাই। তো, যেটা বলছিলাম, এসবের ইন্সপিরেশন এসেছিল ব্রেখট, গঁদার এদের থেকে অনেকটা। তাছাড়া আমার কোন ইচ্ছা ছিল না পূর্বসূরিদের পুনরাবৃত্তি করা। নতুন কিছু করার ইচ্ছা ছিল। বাংলা সাহিত্যে এই এক্সপেরিমেন্ট সুবিমল মিশ্রের ভেতর দেখেছি তা আগে বলেছি। পরে অবশ্য দেখেছি আমাদের লোকসাহিত্যের এমন এ্যান্টি-লিনিয়ার স্টোরিটেলিং-এর বহু উদাহরণ আছে। পরবর্তীকালে ফর্মের দিকে আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি রাস্তার ক্যানভাসারদের কাছ থেকে। ক্যানভাসার যারা ওষুধ ইত্যাদি বিক্রি করে তাদের গল্প বলার স্কিল দুর্দান্ত।

তবে কনটেন্টের ব্যাপারে আমি প্রভাবিত হয়েছিলাম সেসময়ে সমকালীন প্রেক্ষপটটা দিয়ে। আশি দশক জুড়ে আমার রাজনৈতিক, দার্শনিক ভাবনার ভিত্তিটা তৈরি হয়েছে মার্ক্সবাদের জায়গা থেকে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অনুকূলে শিল্পসাহিত্য চর্চা করব সেই প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। কিন্তু সিরিয়াসলি লেখালেখি শুরু করব ঠিক করেছি সেই নব্বই দশকের গোড়ায়, যখন সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন ভেস্তে গেল। সোভিয়েতের পতন, বার্লিন ওয়ালের পতন এসব ঘটে গেছে। সেটা ইমোশনালি আমার জন্য খুব স্ট্রাইকিং ছিল। যে বয়সে আসলে ভাবতাম যে সমাজতন্ত্রের জন্য জীবন দিয়ে দিতেও বাঁধবে না অথচ দেখলাম পুরো আইডিয়াটার ভেতরই কেমন ধ্বস নামল। সমাজতন্ত্রের ধারণা ব্যর্থ হলো কি হলো না সেটা ভিন্ন বিতর্ক, কিন্তু দার্শনিক অনেক প্রশ্নকে পুনর্বিবেচনা করার প্রয়োজন পড়ল। এছাড়া আমার ব্যক্তিগত জীবনেও নানা ঘটনা ঘটেছে তখন। আমি তো মিডল ক্লাস, এক ধরনের এলিট আপব্রিংগিং-এর ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম। সেময় আমি প্রথম গ্রামে কাজ করতে শুরু করলাম। এমনিতে গ্রামে দাদাবাড়ি নানাবাড়ি গিয়েছি, কিন্তু একদম গ্রামীণ জীবনের এক্সপেরিয়েন্সগুলো নিতে পেরেছি সেই চাকরি করার সময়।

সুমন রহমান : তাহলে আপনি কি গ্রামে গিয়েছিলেন গল্প লেখার জন্যই?

শাহাদুজ্জামান : না, না, গ্রামে গল্প লেখতে যাইনি। মেডিকেল থেকে পাস করে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম চেম্বারে বসে টিপিক্যাল ডাক্তারি করব না, ক্লিনিকে বসব না। আবার–মাথার ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছিল যে আমি তো ডাক্তারি পাস করেছি আমাকে তো সে জ্ঞানটা ব্যবহার করতে হবে, জীবিকার জন্য কিছু করতে হবে। তখন সৌভাগ্যক্রমে ব্র্যাকের পাবলিক হেলথ রিলেটেড একটি কাজ পেয়েছিলাম। বলা যায়, কো-ইনসিডেন্টালি ব্র্যাকের গ্রাম-স্বাস্থ্যের একটি প্রোগ্রামে কাজ করা সুযোগ হলো। প্রথমত আমি তো কখনো এভাবে গ্রামে গিয়ে থাকিনি। ফলে মনে করছিলাম হয়তো পারব না। আবার মনে কৌতূহলও ছিল যে যাই, একটা অভিজ্ঞতা নেই। তখন ভাবছিলাম, বেশিদিন হয়তো টিকতে পারব না। কিন্তু

~ www.amarboi.com ~

সেটি ছিল আমার জন্য একদম চোখ খুলে দেয়ার মতো ব্যাপার। যে দায়িত্বে গিয়েছিলাম সে দায়িত্বের কারণে একটা মোটর সাইকেল আমাকে দেয়া হয়েছিল। উত্তরবঙ্গের নানা জেলায়-উপজেলায় আমি যেতাম, একেকটা ইউনিয়নে গিয়ে অনেকদিন থেকেছি। সে কাজে আমি বেশ আনন্দ পেয়ে গেলাম। বলা যায়, নেশার মতো হয়ে গেল। ফলে আমি সেখানে থাকলাম কয়েক বছর। টানা পাঁচ বছর গ্রামেই কাজ করলাম। রাজশাহী, রংপুর তারপর ময়মনসিংহ অঞ্চলে কাজ করেছি অনেকদিন। গ্রামে থাকার কারণে বাংলাদেশ সম্পর্কে আমার অনেক ফর গ্রান্টেড আইডিয়াগুলো ভেঙে গেছে। জীবন সম্পর্কে, বাংলাদেশ সম্পর্কে যে ধারণা নিয়ে আমি বড় হয়েছি সেটা পরিবর্তন হয়েছে। একটা অক্ষর-কেন্দ্রিক জ্ঞানজগতের ভেতর আগে ছিলাম। কিন্তু গ্রামে ঐ দীর্ঘদিন থাকা আমাকে যাকে বলে হার্ড কোর রিয়েলিটিটা চিনিয়েছে। বাংলাদেশের শক্তি আর দুর্বলতা দুটারই পরিচয় পেয়েছি। আমার অনেক পূর্বধারণা ভেঙেছে। এইসব অভিজ্ঞতা আমাকে প্রবন্ধ থেকে গল্প লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আমি তো শুরু করেছিলাম প্রবন্ধ, অনুবাদ এসব লেখা দিয়ে। তো আমি যখন গল্প লিখতে শুরু করেছি তখন সত্যি বলতে আমার ভেতর একটা দ্বিধা কাজ করেছে। যে রাজনৈতিক আদর্শিক ট্রেনিং হয়েছিল সেই আদর্শে তখন ধ্বস নেমেছে, জীবনকে যে একটা ইন্টেলেকচুয়াল পারসেপেকটিভ দিয়ে এতকাল দেখতাম গ্রামে গিয়ে দেখেছি জীবন তার চেয়েও জটিল। ঠিক তখনই জীবনের নুয়ান্সেসগুলো আমার কাছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। তখন আমার কাছে জীবনের এই ধূসর এলাকাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হতে শুরু করল। আমার প্রথম বইয়ের গল্পে জীবনের এই ধূসর এলাকাই তাই প্রাধান্য পেয়েছে। আমি যখন সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করছিলাম প্রথম বইটার নাম কী দিব, আমার তখন মনে হয়েছে 'বিহ্বল' শব্দটা আমার এই বইয়ের প্রতিটা গল্পেরই কি-ওয়ার্ড। আমি আসলে তখন আনসেটেলড, আনডিসাইডেড। ফলে যতই দিন গিয়েছে ততই এই আনসেটেলড ব্যাপারটাই আমার কাছে জীবনের এসেন্স মনে হয়েছে।

সুমন রহমান : এটা একজন সাবেক মার্কসিস্টের জন্য অবধারিত নিয়তি বোধ করি। মার্কসিজম তো সেটেল করায় মানুষকে। আপনি ডায়ালেক্টিস জেনেছেন, এটার পর এটা করতে হবে–মোটামুটি সব কিছুই সেটেলড। তো যখন আপনি সেই ফ্রেমওয়ার্ক থেকে বেরিয়ে আসলেন তখন স্বাভাবিকভাবেই আপনি আনসেটেলড হবেন। সে অর্থে এ বইটাতে আমরা এ ধরনের একটা আনসেটেলনেস আমরা দেখি। যেটা কোনভাবেই আপনার গল্পে প্রভাব ফেলেনি। জানি না ওই মুহূর্তে আপনি আল মাহমুদ পড়ছেন কি না, তার গল্পের মধ্যে কিন্তু এ রকম একটা বিষয় থাকে। বিহ্বলতা জিনিসটাকে আমরা দুটো ভাগে পড়তে পারি। একটা হচ্ছে আনসেটেলনেস এবং অন্যটা বিপন্নতার কাছাকাছি। বলা যায়,

~ www.amarboi.com ~

বিহ্বলতা হলো একটা স্কেল যার শুরুতে আনসেটেলনেস আর শেষে বিপন্নতা। আপনার গল্পগুলো এই স্কেলের মধ্যে কোথাও না কোথাও আছে। এ বিষয়টি বাংলাদেশের গল্পকারদের মধ্যে আল মাহমুদ এবং হুমায়ূন আহমেদের গল্পেও খুঁজে পাওয়া যায়। হুমায়ূন আহমেদকে গল্পকার হিসেবে আমার কাছে বেশ শক্তিশালী মনে হয়। আসলে তার ফর্মই ছিল ছোট গল্প। তিনি সত্যি সত্যিই ভালো ছোট গল্প লেখার চেষ্টা করেছেন। এমনকি তার উপন্যাসগুলোও যে এক্সেপটেড হয়েছে তা কিন্তু এ স্কেলটার কারণেই। যে স্কেলটা এসেছেই আসলে মার্কসিজমের হ্যাঙওভারের পরে। আমাদের দেশের মার্কসিস্ট চর্চার মধ্যে দুর্বলতা, ভীরুতা ও বিহ্বলতার জায়গা তেমন ছিল না। একজন মার্কসিস্ট হবেন, যেমন নিকোলাই অস্ত্রোভস্কির ইস্পাত, মাদার কারেজের মতো চরিত্র। যেখানে ভালনারেবিলিটির কোনো স্থানই নেই। অথচ লিটারেচারে জীবনের ভালনারেবিলিটি জিনিসটা প্রজেক্ট করার ব্যাপারটি সবসময় সেলিব্রেট করা দরকার। এরকম একটা জায়গায় দাঁড়ানো–বিশেষ করে আপনি মার্কসিস্ট নন্দনতত্ত্ব পড়েছেন, মার্কসিজম পড়েছেন এবং মার্কসিস্ট ফিল্ম দেখার আপনার যে লম্বা অভিজ্ঞতা–সবমিলিয়ে আমার কাছে মনে হয়েছে আপনি সজ্ঞানে এ বিষয়টি ধরেছেন। সজ্ঞানে বলছি এ কারণে যে– শহীদুল জহিরের ক্ষেত্রে যেমন আমার কাছে মনে হয়েছে, প্রতিটি মুভ বেশ সচেতন–অনেকটা দাবা খেলার মতোই। প্রত্যেকটা কন্সট্রাকশন বলা যায় কনশাস কন্সট্রাকশন। উনি ফর্ম কোত্থেকে নিবেন, কীভাবে ভাঙচুর করবেন– সবকিছুতেই তিনি বেশ কনশাস। কিন্তু আপনি যখন ওই ভালনারাবিলিটি বা আনসেটেলনেসটা গ্রহণ করছেন সেটা মনে হয়েছে যেন আপনি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই গ্রহণ করেছেন।

শাহাদুজ্জামান : এ বিষয়ে আমি পুরোপুরিই আপনার সাথে একমত। যেটা আপনি বললেন ঠিকই যে একধরনের মার্কসিস্ট ডিটারমিনিজম থেকে আমাদের শুরুটা হয়েছিল। আমি তখন রীতিমত ক্লাসও নিতাম মার্কসিস্ট এসথেটিকস নিয়ে। কেন কাফকা এবং কাম্যু এত বিরাট লেখক হওয়া সত্ত্বেও মহান হতে পারলেন না সেটা নিয়ে আলোচনা করতাম। তারা পারলেন না কারণ তারা জীবনের ব্যাপারে কনফিউজড, পৃথিবীর উত্তরণের যে একটা পথ আছে এ নিয়ে তাদের কোন স্পষ্ট আস্থা নাই। কিন্তু একজন মার্কসিস্টকে তো আশাবাদী হতেই হবে। কাফকা, কাম্যুর ভেতর আশাবাদ নাই এ কারণে তারা মহৎ লেখক না তারা খুবই বড়মাপের লেখক হওয়া সত্ত্বেও। এসব কথা তখন বলতাম। ক্রমান্বয়ে এ ধরনের ভাবনা-প্রক্রিয়ার দুর্বলতা টের পেয়েছি। টের পেয়েছি শুধু আশার পতাকা ওড়ানোই জীবন না। দ্বিধাও জীবনের একটা কোর এলিমেন্ট। কোনো কাঠামোবদ্ধ আদর্শ তো জীবনের এই স্ববিরোধিতা, ধূসরতা ধারণ করতে পারে না। একজন রাজনীতিবিদের পক্ষে একটা ধূসর এলাকায় দাঁড়িয়ে কথা বলা তো চলে না, তাকে

~ www.amarboi.com ~

সাদা বা কালোতে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তার তো একটা নির্দিষ্ট এজেন্ডাকে ফুলফিল করতে হবে। কিন্তু লেখক পারে সেই ধুসর এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকতে, এই এ্যামবিউটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে। এটা সাহিত্যের শক্তি।

সুমন রহমান : আমার কাছে তাই মনে হয়েছে। যেহেতু আমিও একই সময়ে বা একটু পরে এই বিশ্বাসে সামিল হয়েছিলাম। আমি যেটা দেখছি যে, সোভিয়েত-পতনের পরবর্তী সময়ে লিটারেচার কিংবা সোসাইটিতে যে মার্কসিজম ব্যাক করবে না সে সিদ্ধান্ত নিতেই আমাদের আরো পাঁচ সাত বছর লেগে গিয়েছিল। তার আগে পর্যন্ত আশায় ছিলাম যে এটা কোনো না কোনো ফর্মে হয়তো থাকবে। ভাবতাম, ঠিক আছে, সোসাইটিতে না আসুক কিন্তু আমাদের চিন্তা প্রক্রিয়ায় হয়তো থাকবে। এটা নিঃসন্দেহে এপিস্টোমোলজির ব্যাপার এবং এটাকে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায়ও নাই। কারণ তখন যতরকমের ক্রিটিক্যাল লেখাপত্র আছে সবই তো মার্কসিস্ট আইডিওলজি থেকে। এমনকি পোস্ট-মার্কসিস্ট যাদের বলা হচ্ছে তারাও মার্কসিস্টই। ফলে একটা বিশ্বাসের জায়গা তৈরি হচ্ছিল যে সোসাইটিতে মার্কসিজমের জায়গা নাই কিন্তু আমাদের মগজে এটা থাকবে।

শাহাদুজ্জামান : খুবই ঠিক। যেটা বলছিলাম যে দ্বিধা জীবনের একটা বড় ব্যাপার। সত্যিকার অর্থে আমি তো সাহিত্য করতে আসি নাই। পপুলার সাহিত্য তো দূরের কথা সাহিত্যিক হব এমন ভাবনাও মাথায় ছিল না। লেখালেখি করার ব্যাপারে আমার দ্বিধা ছিলো। তবে কোনভাবে আমার অভিজ্ঞতার কথাগুলো বলার একটা তাড়না ছিল। আপনি হুমায়ূন আহমেদের কথা বলেছিলেন। তার প্রথম দিকের গল্পগুলো যেমনটা বলা যেতে পারে নিশিকাব্য–আমার বেশ পছন্দের বই। সেখানে প্রাণের একটা ছোঁয়া আছে। সেটা কোনো ইডিওলজি তাড়িত না। আল মাহমুদের গল্পের চেয়ে আল মাহমুদের কবিতার অনেক বড় ভক্ত আমি। এই সেদিন তার 'খড়ের গম্বুজ' কবিতাটা পড়ছিলাম। কী অসাধারণ কবিতা! তো যে কথা বলছিলাম গল্প লেখা আমার কাছে বড় কথা না, বড় কথা হচ্ছে আমি আমার ভেতরের কথাগুলো এক্সপ্রেস করতে পারছি কি না। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা, আমার ভেতরের প্রশ্নগুলো গল্পে নাড়াচাড়া করতে পারছি কিনা সেটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। একথার সূত্র ধরে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করি, আপনি তো আমার একটু পরের জেনারেশন, শুরু করেছিলেন কবিতা দিয়ে, পরে গল্প লেখার বিষয়ে আগ্রহী হয়েছিলেন কেন?

সুমন রহমান : আমার কবিতা হচ্ছে স্টোরি-বেজড কবিতা, ন্যারেটিভ কবিতা। কবিতায় আমি গল্প বলি, গল্প বলাটা আমি খুব পছন্দ করি। আমার কাছে মনে হয়

~ www.amarboi.com ~

যে কোনো ফরম্যাটেই একটা গল্প বলতে হয়। পেইন্টিংয়েও একটা গল্প বলতে হয়, সিনেমায় তো বটেই। ভেঙে ফেললেও গল্প আসলে থাকে সেখানে। অ্যাবস্ট্রাক্ট একটা ব্যাপার তো আছেই সেটা ভিন্ন কথা। সিনেমাতেও অ্যাবস্ট্রাক্টিজম খুব চলে। অনেক কবিতা আছে যেমন তাল, লয়, ছন্দের উপর ভেসে যাওয়া তাতে অন্তঃমিলে যে শব্দটি আসবে এটা একধরনের ধ্বনির দ্যোতনা তৈরি করে। আমি গোড়া থেকে আসলে এটাকে আমার ফর্ম হিসেবে দেখতে পাইনি। আমার কাছে মনে হয়েছে গল্পই বলে যাব। অনেক পরে আমার মনে হলো কবিতাতে যদি আমি গল্প বলি তাহলে এখন গল্প দিয়ে গল্প বলে দেখা যেতে পারে। সেসময় ঘটনাচক্রে আবার আমি বাংলাদেশের সমসাময়িক গল্প পড়তে শুরু করলাম। একটা বই রিভিউ করলাম। করার পর মনে হলো যে, কবিতায় তো গল্প বলা একটু কঠিন কারণ এখানে অনেক বিধিনিষেধ-তাল-লয়ের মধ্যে গল্পটা বলতে হচ্ছে। সেখানে তো সোজাসুজি গল্প বলা যাচ্ছে না। সেখানে গল্পের মধ্যে যদি সুন্দর করে একটা গল্প বলা যায়, আরো ফ্রি ফ্লোয়িং ফর্ম নিয়ে বলা সম্ভব সেখানে গল্প এত ক্লিশে হবে কেন? তখন আমার মনে হলো গল্প লিখে দেখা যেতে পারে আসলে এটা কেমন দাঁড়ায়। এটা ছিল আমার দিক থেকে একটা সাহিত্যিক এক্সপেরিমেন্ট। আচ্ছা ঠিক আছে একটা গল্প লিখে দেখি তো কিরকম হয়।

শাহাদুজ্জামান : আপনি প্রথম গল্প কোনটা লিখেছিলেন?

সুমন রহমান : প্রথম গল্পটা ছিল ডেঙ্গুচর্চার দিন। প্রথম বইয়ের প্রথম লেখাটাই প্রথম গল্প। আমার প্রথম বই হচ্ছে গরিবি অমরতা সে বইয়ে আমি আসলে দেখলাম যে রবীন্দ্রনাথের যে সংজ্ঞা তা আমি মানতে চাচ্ছি না।

শাহাদুজ্জামান : কোন অর্থে মানতে চাচ্ছেন না?

সুমন রহমান : মানতে চাচ্ছি না এই অর্থে–আমি দেখলাম যে আমার গল্পের মধ্যে উপন্যাসের বেশ সম্ভাবনা আছে। এটা অনেকটা এমন যে একটা বড় উপন্যাসকে জোর করে ছোট্ট পরিসরে হাজির করা হয়েছে, এমন মনে হয়। পরে আমি দেখলাম যে, এটা এক ধরনের ন্যারেটিভ স্টাইল। তখন আমি আসলে সে অর্থে রুলফো বা সিঙ্গার পড়িনি। পরে রুলফো এবং সিঙ্গার পড়ার পর মনে হলো যে ছোট গল্পের শক্তি হচ্ছে তার র'নেস। নতুন সেনসিবিলিটি তৈরি করার মধ্যেই এর শক্তি নিহিত। এটা কবিতারও শক্তি ফলে ফর্মের দিক থেকে আমার কাছে মনে হয়েছে এটি তো কাছাকাছি ফর্ম, একই রকম আনন্দ পাওয়ার কথা। অন্যদিকে আল মাহমুদও একই রকম। তাঁর অনেক কবিতা আছে সেসব মূলত গদ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শাহাদুজ্জামান : তা তো ঠিকই। তার প্রত্যাবর্তনের লজ্জা কবিতাটা তো একটা গল্পই। আপনার ভাবনা আমি রিলেট করতে পারছি। আমি এখানে একটু বলে রাখি–নানা মিডিয়ার নিরীক্ষার কথা বলছিলাম। সেই সূত্রে বলতে চাই যে আমি ল্যাটিন আমেরিকার কিছু গল্পকারের নিরীক্ষা দিয়েও প্রভাবিত ছিলাম। যেমন বোর্হেস আমাকে অনেক সাহস দিয়েছে, আর কর্তাজার আরেকজন। তিনি ফর্ম নিয়ে অনেক এক্সপেরিমেন্ট করেছেন। আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমি কখনো কবিতা লিখিনি। কিন্তু আমি কবিতার পাঠক। আপনি আমার গল্পে যে নুয়ান্সেসের কথা বললেন আমার মনে হয় সেটা কিছুটা হয়েছে কবিতার প্রভাবে। আপনি যেমনটা বললেন আমার কাছেও মনে হয় কবিতার অভিজ্ঞতা আর গল্পের অভিজ্ঞতার কাছাকাছি হতে পারে। আমার গল্পগুলোতেও আমি এক ধরনের কবিতার অভিজ্ঞতাও দিতে চাই।

সুমন রহমান : অদ্ভুত ব্যাপার! আপনার সাথে আমার পার্থক্যের জায়গা হচ্ছে আমি কবি হয়েও যখন গল্প লিখি আমি কবিতার এসেন্স ব্যবহার করতে প্রায়ই পারি না। অনেক সময়ই ইচ্ছা করে, কিন্তু পারি না। অথচ আপনার গল্প কিন্তু উঠে এসেছে কবিতা থেকে। একদমই কবিতা হচ্ছে ফাউন্ডেশন। কবিতার উপরে দাঁড়ানো গল্পগুলো। আবার ঠিক কাব্যিকতা যাকে বলে, সেটিও করেন না আপনি। কবিতার এসেন্স যেটা–মিস্ট্রি আর পোয়েট্রি এর উপরে আপনি একটা স্টোরি বিল্ড আপ করেন। এতে যে বিষয়টি হয়–স্টোরি না থাকলেও সমস্যা নেই। অনেক সময় পাওয়ারফুল অবজারভেশনেরও দরকার নাই। কবিতার শক্তিই এটিকে টেনে নিয়ে যায়।

শাহাদুজ্জামান : আমার কাছে যেটা মনে হয়– একেকটা লিটারারি জঁরার পাথর্ক্যটা মূলত সেটা পাঠের অভিজ্ঞতায়। কবিতা একটা অভিজ্ঞতা, উপন্যাস একটা অভিজ্ঞতা, এমনকি ছোটগল্পও একটা ভিন্ন অভিজ্ঞতা। বলতে পারেন আমি গল্পের ভেতর কবিতার অভিজ্ঞতাকে মিলিয়ে দিতে চাই। আল মাহমুদ কিংবা জীবনানন্দ, যেমন কবিতার ভেতর গল্পের এক্সপেরিয়েন্সটা ব্লেন্ড করেন। জীবনানন্দের আট বছর আগের একদিন, ক্যাম্পে–একেকটা গল্প, হাওয়ার রাত তো গল্পই একরকম।

সুমন রহমান : আপনার প্রথম বইয়ের প্রথম গল্পটি–এক কাঁঠাল পাতা আর মাটির ঢেলার গল্প–এটা তো কবিতা। এটাকে আপনি কবিতা হিসেবে ছাপলেও সমস্যার কিছু নেই, আবার গল্প আকারে ছাপলেও সমান অভিনিবেশ দিতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শাহাদুজ্জামান : হ্যাঁ। এমনকি এটা আমি কবিতা হিসেবে আবৃত্তি করতেও শুনেছি। এটা কেউ কেউ আমার দুর্বলতা হিসেবে দেখে যে উনি কবিতা আর গল্পের পার্থক্য বুঝেন না। আপনার কী মত সে বিষয়ে আমি জানি না।

সুমন রহমান : আমার কাছে মনে হয় যে কোনো শিল্পেরই অন্তিম লক্ষ্য সঙ্গীত হয়ে ওঠা। মার্কসিস্টরা অনেক আগে থেকেই এটা বলে। মার্ক্সিজিমের অনেক কিছু না মানলেও এ জিনিসটা আমি মানি। আপনার গল্প নিয়ে যেহেতু ফিল্মও হয়েছে একটা কথা বলি, আমার কাছে মনে হয় ফিল্ম খুব ক্ষুধার্ত মিডিয়াম। সে গিলতে পারে না, এমন কোনো মিডিয়া নাই বললেই চলে। মোটামুটি সব শিল্পমাধ্যম থেকেই সে স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রহণ করতে পারে। সেটা নিছক ধার দেনা নয়, প্রায় ডাকাতি। ফিল্মের কমিউনিকেট করার ক্ষমতা, এর ব্যাপ্তি এত বেশি–এরকম একটা জায়গায় গল্পকার হিসেবে বা সাহিত্যিক হিসেবে আমরা বিপন্ন। বহুদিন ধরেই এটা নিয়ে আমার চিন্তা যে, কী করা যায়। একটা ভালো পথের পাঁচালী লিখলেন বিভূতিভূষণ কিন্তু মানুষজন এখন সত্যজিতের পথের পাঁচালীই দেখবে। কারণ সত্যজিতের সিনেমায় বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালীর যে অ্যাসথেটিক এক্সপেরিয়েন্স–তার প্রায় অনেকটুকুই পূরণ হয়। না হলেও সম্ভবত একই ব্যাপার ঘটত। দেড়-দুই ঘণ্টার সিনেমা দেখে যদি একটা কনটেন্টসহ কাছাকাছি ধরনের অ্যাসথেটিক এক্সপেরিয়েন্স পেয়ে যান তাহলে বই আপনি কেন পড়বেন? পাশাপাশি, আমি আরো যেটা দেখলাম, আমাদের আগের জেনারেশনের বেশির ভাগ সাহিত্যিকই ফিল্মের জন্য রমণীয় হয়ে উঠা গল্পের দিকে ঝুঁকতে শুরু করল। যেন সাহিত্যের অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে চলচ্চিত্রের ভাষায় প্রকাশিত হওয়া! আমার কাছে তখন মনে হলো, উল্টা দিকে হাঁটব। সাহিত্যকে চলচ্চিত্রের জন্য কঠিন করে ফেলব যাতে সাহিত্য ট্রান্সলেটেড না হতে পারে। তা না হলে সিগনেচার রাখা যাবে না। এটা করতে গিয়ে আমার সামনে দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়ালেন অরুন্ধতী রায়। অরুন্ধতীর বই দ্য গড অব স্মল থিংস মনে হয় ১৯৯৭ সালে বের হয়েছিল। তারপর বিশ বা বাইশ বছর হয়ে গেল। ভারতের দুটো বড় বড় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, তামিল এবং মুম্বাই–দুটোই অরুন্ধতীকে ঔন করে। শর্টলিস্টেড বা পুরস্কার পাওয়া হেন কোনো বই ভারতে নাই–যা ফিল্মে যায়নি। কিন্তু অরুন্ধতীর বুকার পুরস্কার পাওয়া বই নিয়ে কেন ফিল্ম করা যাচ্ছে না? কারণ হচ্ছে, এটির পোয়েটিক হাইট। এটি নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরি করতে হলে সেরকম ফিল্ম-মেকারই হতে হবে। সবাই তো বুনুয়েল বা তারোকাভস্কি না যে শুধুমাত্র ইমেজ দিয়ে সে স্থানে চলে যাবেন; বা এখনকার বাজারি ফিল্মে সেটা সম্ভবও না। আমার গল্পগুলো আমি যখন লিখি তখন আমি দেখলাম যে খুব কম গল্পই আসলে ফিল্মে ট্রান্সলেট করার মতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শাহাদুজ্জামান : এটা ইন্টারেস্টিং অবজারভেশন আপনার। বিশেষ করে যদি গল্পটাকে কবিতার দিকে যাত্রা করানো যায় সেটা ফিল্মে আনা ডিফিকাল্ট। আমার যেমন কাঁঠাল পাতা আর মাটির ঢেলার গল্প–এটা নিয়ে দুয়েকজন তরুণ চিন্তা করেছিল ফিল্মের জন্য। কিন্তু আমার মনে হয় ওই গল্পটাকে ফিল্মের ল্যাঙ্গুয়েজে আনা খুবই কঠিন। আপনার প্রথম বইয়ের *গরিবি অমরতা* যে গল্পটা এটা আমার পছন্দের গল্প। এটার ভেতরে যে এক্সপেরিয়েন্সের জায়গা আছে, যে বেদনার অনুভূতি আছে, কবরের পাশে বাবার সাথে যে রিলেশনশিপের আবহ তৈরি হয়েছে সেই অনুভূতি কবিতার কাছাকাছি। সেটা ঐ গল্পের শক্তি, এটাকে ফিল্মে আনা কঠিন। কোথায় পড়েছি যে মার্কেজ একটা উইল পর্যন্ত করে গিয়েছেন যে তার *হান্ড্রেড ইয়ারস অব সলিচ্যুড* নিয়ে ফিল্ম করা যাবে না। তিনি মানুষের মনে এই বইটার সাহিত্যিক এক্সপেরিয়েন্সই ধরে রাখতে চান। সেটা তিনি করেছেন লিটারেচারের মোরাল কপিরাইট রাখার জন্য। নিকস কাজানজাকিসের *জোরবা দ্য গ্রিক* বইটি নিয়ে ভালো চলচ্চিত্র হয়েছে কিন্তু তারপরও এ উপন্যাস পাঠের অভিজ্ঞতা একেবারেই ভিন্নরকম। তো আপনি যা বললেন, পথের পাঁচালী লোকে এখন পড়ে না সেখানে পাঠক হিসেবে কিছুটা লসও আছে। পাঠকের যাতে এ লসটুকু না হয় সেটাই মার্কেজ বন্ধ করতে চেয়েছেন। পাঠককে পড়তে হবে যেভাবেই হোক। আবার অন্য আলোচনায় বলা যায়, লিটারেচার যেসব জায়গায় প্রবেশের সুযোগ পায় সেটা যদি ঠিকঠাক এডাপ্ট করা যায় তাহলে ফিল্ম সমৃদ্ধ হয়। আসলে আপনাকে সে স্পেসটুকু রাখতে হবে। ফিল্মের জন্য এতটা শত্রুভাবাপন্ন হওয়াও একদম অনুচিত হবে। ফিল্ম তাহলে গল্প পাবে কোথায়? ফিল্মমেকার আসলে সে অর্থে খুব ভালো স্টোরি টেলার নাও হতে পারে। হয়তো তিনি বেশ টেকনিক্যালি এফিসিয়েন্ট পারসন তার কাছে একটা ভালো স্টোরি থাকলে চমৎকার কিছু করতে পারেন। আমাদের দেশে যে সমস্যাটা হয় যারা ফিল্ম টেকনিক, ফিল্মের ল্যাঙ্গুয়েজ ভালো বোঝেন কিন্তু তারা যে স্টোরি টেলিং এ ভালো হবেন তা তো না। আমার *কমলা রকেট* গল্পটি নিয়ে নূর ইমরান মিঠু যে চলচ্চিত্র তৈরি করেছে সেখানে সে মূলত গল্পের শক্তিকে ব্যবহার করেছে। গল্পটি সে চলচ্চিত্রের ভাষায় নিয়ে যেতে পেরেছে।

সুমন রহমান : আমার কিছু গল্প রয়েছে যা হয়তো ফিল্মে নেয়া সম্ভব। কিন্তু আপনার গল্পে আবার দুরকম বিষয় রয়েছে। আপনার কিছু গল্প রয়েছে যা আসলেই ফিল্ম হিসেবে দুর্দান্ত কিছু হবে এবং কয়েকটি হয়তো করে দেখানোও সম্ভব হয়েছে। আমার কাছে মনে হয় আপনার লেখা *ইব্রাহিম বক্সের সার্কাস* বেশ ভালো ফিল্ম হতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শাহাদুজ্জামান : এ গল্পটার স্ক্রিপ্ট আসলে করা হয়েছে। আমিই করেছি। তিনজন ইতোমধ্যেই আগ্রহী হয়েছিলেন ফিল্মটা করতে কিন্তু শেষ পর্যন্ত করতে পারেননি।

সুমন রহমান : আপনার মামলার সাক্ষী ময়না পাখি এ বইটা সম্পর্কে আমার ধারণা হচ্ছে–এ বইটি সেলফ-রিফ্লেক্টিং। আপনার একটা বই আছে *অন্য এক গল্পকারের গল্প নিয়ে গল্প*। এই নামটি মূলত যা বোঝায়–আমার কাছে মনে হয় মামলার সাক্ষী ময়না পাখি এ ধরনেরই একটি বই। যেখানে আপনি শুধু গল্প বলেন নাই, গল্পকারকেও বলছেন। আপনার লেখা এ যাবৎকালে যত বই পড়েছি আমার কাছে সবচেয়ে বেশি এক্সপেরিমেন্টাল মনে হয়েছে মামলার সাক্ষী ময়না পাখি বইটিকে। কখনো মনে হয়েছে কোনো গল্প নাই এখানে কিন্তু একটা পারস্পেকটিভ আছে। আবার কখনো মনে হয়েছে এখানে দুর্দান্ত একটা গল্প আছে, কোনো ভণিতা নেই। খুব সাধারণ একটা গল্প। এ ধরনের গল্পগুলো আপনি কেন লিখতে শুরু করলেন বা কবে থেকে লিখতে শুরু করলেন?

শাহাদুজ্জামান : এ বইটা আমার অন্য বইগুলো থেকে একদম ভিন্ন আমি বলব না তবে আপনি যে বললেন এ গল্পগুলোতে এক ধরনের সেলফ-রিফ্লেকশন আছে সেটা ঠিক।

সুমন রহমান : হ্যাঁ। আপনি এখানে উপস্থিত শুধু গল্পকার হিসেবেই না বরং গল্পকারের ক্রিটিক হিসেবেও। অর্থাৎ একই সঙ্গে গল্প এবং গল্পের ক্রিটিক।

শাহাদুজ্জামান : এ বইটা লিখতে গিয়ে আমি বলব হ্যাঁ আমি সম্ভবত আমার মনের ভেতরের পৃথিবীর কাছে আসতে পেরেছি। আমি বহুদিন ধরেই তো লিখে যাচ্ছি। কিন্তু আমি বারবারই যেটা বলেছি এই যে আমি বেঁচে আছি, জীবন যাপন করছি, এই অভিজ্ঞতার একদম নির্যাসকে লেখায় ছুঁতে পাচ্ছি কি না, সেটা আমি ভাবি। আমার মনে হয় আমি লেখা দিয়ে আমরা ভাবনা, অভিজ্ঞতার যে জায়গায় ঢুকতে চাচ্ছি সেখানে ঢুকতে ঠিক পারি না এখনো। কিছু কিছু জিনিস ভাবনা দিয়ে, অনুভূতি দিয়ে, চিন্তা দিয়ে বুঝতে পারি কিন্তু সব অক্ষরে আনতে পারি না। ক্রমশ এটা বুঝেছি যে জীবনের ভেতর একটা ডিপ আনপ্রেডিকটেবলিটি আছে, ডিপ ডার্কনেস আছে। এই বইয়ের গল্পগুলোর ভেতর এ ব্যাপারগুলোর মুখোমুখি হতে চেয়েছি আমি। আমার এ গল্পগুলো সাধারণভাবে বললে জীবনের এই আকস্মিকতা এবং জীবনের এক ধরনের আঁধার এগুলোকেই মোকাবেলা করতে চেয়েছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সুমন রহমান : ডার্ক হিউমার তো যথেষ্ট রয়েছে। কিন্তু এই বই পড়ে আমি বেশ আনন্দ পেয়েছি। আপনি এ বইয়ে অনেকগুলো গল্প বলেছেন যেগুলো গল্প হিসেবে লেখার সাহসই আমি করব না, অনেকেই করবে না। খুব সাধারণ বিষয় কিন্তু আপনি বললেন, আর এখানে একটা ডিসকার্সিভ ডেপথ তৈরি হয়ে গেল। এবং সেটা দাঁড়িয়ে গেল গল্প হয়ে। আপনি আসলে অনেক বেশি সহজ করে লিখেন। আগের গল্পগুলোতে আপনি যেমন অনেক বেশি সতর্ক ছিলেন এটাতে আপনি আর সেভাবে সতর্ক হচ্ছেন না। এ গল্পগুলো পড়ে আমার মনে হয়েছে আপনি অনেক বেশি সহজ হয়ে উঠেছেন। যেমনটা বলা যায় শেষের গল্পটি নাজুক মানুষের সংলাপ–এটা খানিকটা ফিলোসফিকাল, প্লেটোনিক ডায়ালগ। এখানে আপনি দেখেন রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের যে ফর্ম–সেটা কিন্তু না এটা। পোস্ট-ট্যাগোরিয়ান ফর্ম। এখানে অনেকগুলো গল্প রয়েছে যা এ ফর্মটিকেই অনুসরণ করেছে। কোথায় শুরু করতে হবে কোথায় শেষ করতে হবে এ বিষয় নিয়ে ভাবছেই না। এই যে একটা ইজিনেস চলে আসা। আমার কাছে এটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, দৃষ্টান্ত দিয়ে বলি, পিকাসো তার ছবি থ্রি প্রস্টিটিউটস দুবার বা তিনবার এঁকেছেন। উনার ব্লু পিরিয়ডে আঁকা ছবিটা বেশ গর্জিয়াস। আর পিংক পিরিয়ডে খালি দু তিনটা লাইন আর কিছুই না। পিংক পিরিয়ড যেন ব্লু পিরিয়ডের মেমোরি মাত্র! একই ছবি তিনি আঁকছেন, একই নাম, কিন্তু শুধু কয়েকটা লাইন। তখন হয়তো তিনি ভেবেছেন এত কারুকার্যের প্রয়োজন নেই। আমার তখন মনে হয়েছে–এটাই কি তাহলে ম্যাচিউরিটি? সেই যে গিনজবার্গের একটা বিখ্যাত কবিতা আছে, নাম ম্যাচিউরিটি। কবিতাটি হচ্ছে এমন যে–আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমি বিয়ার খেয়ে সবুজ পিত্ত বমি করতাম। আরেকটু বড় হয়ে মদ খেয়ে আমি লাল রক্ত বমি করতাম। আর এখন আমি বাতাস বমি করি। এটাই হচ্ছে ম্যাচিউরিটি। একটা সময় আসে আপনি যখন আপনার হাতের যাবতীয় কারুকাজ দেখিয়ে ফেলেছেন এখন আপনি নিজেই আসলে গল্প। নিজেকে হাজির করা, নিজেকে হাজির করলেই গল্প হয়ে যাবে। আপনার বয়সী অনেক লেখক তিনশ গল্প লিখলেও, প্রতিবার আনকোরা গল্পই লিখতে চান। তার শিড়দাঁড়ার টানটান ভাব, পেশি শক্ত হয়ে গেছে তার, ঘাড়ের রগ লাফাচ্ছে এমন একটা জিনিস কিন্তু বোঝা যায়। আমার পছন্দের একটা বই হচ্ছে আইজ্যাক সিঙ্গারের গিম্পেল দ্য ফুল। এ বইটি হচ্ছে খুব সাধারণভাবে বাইবেলকে মৌল্ড করা গল্প। বাইবেলে শয়তানের যে ধারণা, পাপপুণ্যের যে ধারণা এসব নিয়ে। লেখক এসব বিষয়কে প্লট হিসেবে নিয়েছেন। শয়তান একটা মেয়েকে সিডিউস করছে। এটা নিয়ে তিনি গল্প লিখলেন। কীভাবে সিডিউস করল, তার কী শাস্তি হচ্ছে পরকালে, ইত্যাদি ইত্যাদি। খুবই ধর্মীয় বাতাবরণের মধ্যে থেকে সাহিত্য করা। মামলার সাক্ষী ময়না পাখি, জনৈক স্তন্যপায়ী প্রাণী... এ গল্পগুলো অনেক রিফ্লেকটিভ।

লেখা নিয়ে কথা-৬

~ www.amarboi.com ~

এটাকে পোস্টমডার্ন ফর্ম বলা যায়। পোস্টমডার্ন ফর্মই আসলে সেলফ-কনশাস ফর্ম। এ যাবৎকালে বাংলা গল্পে এ দশাটা এখনও খুব বেশি দেখিনি।

শাহাদুজ্জামান : আপনার অবজারভেশনের সাথে একমত। আপনি বলছেন–হয়তো এটা ঠিকই–আমি এক ধরনের ইজ ফিল করেছি গল্পগুলো লেখার সময়। আমার এত বছরের গল্প লেখার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি এ গল্পগুলো লিখতে আমার এফোর্ট দিতে হয়েছে কম। এটা ম্যাচিউরিটি কি না জানি না তবে এটা বেশ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। প্রথম দিকে যখন লিখছি তখন ধরেন এক ধরনের পারফর্মেটিভ পারসোনা ছিল। অনেকটা এমন যে দুই ঘোড়ায় পা রেখে চলতে হবে। একটা সাহিত্যের ঘোড়া আরেকটা পারফর্মেন্সের ঘোড়া। গল্পটা ঠিকমত দাঁড়াচ্ছে কিনা, সাহিত্যের যে মানচিত্র আছে তার মধ্যে কোথায় সেটা লোকেটেড, এই যে ব্যাপারগুলো সেগুলো খেয়াল করার ব্যাপার ছিল। কিন্তু এটা আপনি খুব ঠিকই বলেছেন যে এ গল্পগুলো যখন আমি লিখেছি একদম চাপের বাইরে থেকে লিখেছি। মোটামুটি দুটো কারণ হয়তো আছে এর পেছনে: একটা হচ্ছে যে সাহিত্যের মানচিত্রে আমার গল্পগুলোর স্থান সম্পর্কে একটা ধারণা আমার হয়েছে; আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে জীবনের ব্যাপারে ধারণাগুলোও হয়তো আগের চেয়ে খানিকটা খোলাসা হয়েছে। গল্পে তো একটা স্লাইস অব লাইফ তুলে আনা হয়। আমরা যে জীবন যাপন করে যাচ্ছি সেখান থেকে একটা অংশ নিয়ে রিফ্লেকশন ঘটানো। রিফ্লেকশনের তো দুটো ধাপ রয়েছে রেট্রো-রিফ্লেকশন এবং ইন্ট্রা-রিফ্লেকশন। একটা হচ্ছে ঘটে যাওয়ার পর রিফ্লেক্ট করা আরেকটা হচ্ছে ঘটনাটা যখন ঘটছে তখনই রিফ্লেক্ট করা। আমার এ গল্পগুলোর মধ্যে দু ধরনের রিফ্লেকশন আছে। আমি যেমন জীবন যাপন করেছি তার একটা রিফ্লেকশন রয়েছে গল্পগুলোতে। আবার সেই রিফ্লেকশনের রিফ্লেকশন আছে। গল্পগুলো বলছি আবার গল্প বলা নিয়েও বলছি। লেখার অভিজ্ঞতা, জীবনের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে বলতে পারেন এক ধরনের ইজিনেস চলে এসেছে লেখায়। এই বইয়ে একটা গল্প আছে টুকরো রোদের মতো খাম–এ গল্পটা আসলে এক বসায় টানা এক ঘণ্টায় লেখা একটা গল্প। এবং এটা আমার খুব পছন্দের একটা গল্প।

সুমন রহমান : এ গল্পটা কিন্তু খুবই টাচি। এ গল্পটা পড়ার সময় মনে হয়েছে যে এ গল্পটা তো আমিও জানি বা আমারও তো জানার কথা। আমি কেন গল্পটা লিখলাম না। এমন একটা মোমেন্টাম বহু যুগ ধরে পৃথিবীতে ঘুরছে। চিঠি-উত্তরযুগে চিঠির প্রতি নস্টালজিয়া, ফাঁসির আসামি, মানুষ মারা যাচ্ছে তার এ আকুতি ইত্যাদি। এখানে দুটোই কিন্তু এক্সপায়ার করছে। মানুষটা এক্সপায়ার করছে, আবার যোগাযোগের যে ফর্ম চিঠি সেটিও এক্সপায়ার করছে। এ গল্পের ইন্টারেস্টিং দিকটি হচ্ছে এটি।

~ www.amarboi.com ~

শাহাদুজ্জামান : এ গল্পের মধ্যে অনেকগুলো গল্পের মুখ আছে।

সুমন রহমান : আপনার এ গল্পের মূল বিষয়টিই ছিল দুটো এক্সপায়ারের বিষয়কে এক সুতায় বাঁধা। লোকটা মরে গিয়েছে তার চিঠিটাও পৌঁছায়নি। চিঠি ফর্ম আকারে এক্সপায়ার করেছে। কিন্তু এটার যে ইমপ্যাক্ট জীবনের উপরে তা কিন্তু রয়ে যাচ্ছে।

শাহাদুজ্জামান : একটি বিষয় আমি করি গল্প লেখার ক্ষেত্রে সেটি হচ্ছে আমার মনে হয় গল্পের মাধ্যমে পাঠককেও যদি ক্রিয়েটিভ করে তোলা যায় তাহলে মজার হয়। গল্পটা ওপেন-এন্ডেড রাখার কারণে পাঠক পাঠিকার একটা সুযোগ থাকে নিজের মতো করে চিন্তা করার। আমি মনে করি আমার অধিকাংশ গল্পেরই এটা একটা ধারা। আমি জানতে চাইব যে–আমার এ বইয়ের কোন গল্পগুলোকে আপনি বিশেষভাবে উল্লেখ করবেন?

সুমন রহমান : আপনার লেখা আমার প্রিয় গল্প হচ্ছে *মৃত্যু সম্পর্কে আমার অবস্থান খুব পরিষ্কার*, এটি। গল্প সম্পর্কে আপনার অবস্থান যে খুব পরিষ্কার এটা বোঝা যায়। স্টোরি ইটসেলফ অনেক সময় এত শক্তিশালী হয় যে এটার আর কিছু লাগে না। এটাকে আর অলংকার পরানোর কিছু নেই। এ গল্পটা এজন্যই আমার এত পছন্দের। এমন গল্প হয়তো বা একটা মানুষ জীবনে চার পাঁচটার বেশি লিখতে পারে না। সব গল্প এমন হবে না। একেকটা গল্প একেক রকম হবে। এ গল্পটা নিশ্চয়ই আপনার এক বসায় লেখা গল্প না কিন্তু যে কারো পড়ার পর মনে হবে যে এটি এক বসায় লেখা গল্প। কারণ হচ্ছে আপনি যে কম্পেজিশনের কথা বললেন তা অনেকটাই কসমেটিক সার্জারির মতো। গল্পটা এত নিখুঁত যে এর কারণে কসমেটিক সার্জারির দাগ আর কারো চোখে পড়বে না। এ ধরনের গল্প আমাকে বেশ টানে। আরেকটি গল্প *চিন্তাশীল প্রবীণ বানর*। বানর বললেই শহীদুল জহিরের কথা মনে হয়। এটার প্লটটাও সেই পুরান ঢাকার। এ গল্পটাতে আমার যেটা মনে হয় প্রথম থেকেই বানরের চরিত্রটা কেউ খেয়াল করছে। এটা হয়তো কোনো একটা ঘটনা ঘটাবে। কিন্তু পরে দেখলাম অন্য সমস্ত গল্প থেকে এ গল্পের কনক্লুশন অনেক বেশি সাউন্ডিং। এটা কিন্তু বিহ্বল গল্প না, এটা খুবই স্ট্রেইট। খুবই এসারটিভ একটা গল্প। আপনি সাধারণত এ ধরনের গল্প লেখেন না। আমার কাছে মনে হয়েছে আপনি যেহেতু এ ধরনের গল্প লেখেন না আমি অনুমান করেছিলাম এটার শেষের অংশটা আপনি আগেই জানতেন। পুরো বইয়ের মধ্যে এ গল্পটা নিয়ে আপনি হয়তো বেশি ভেবেছেন বলে মনে হয়েছে। এখানে আপনি যে নুয়ান্স রাখতে চান সেটা রাখ তে বানর আপনাকে হেল্প করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শাহাদুজ্জামান : দুটো পর্যবেক্ষণই ঠিক। আমি আসলেই এর শেষটা জানতাম এবং বানর নুয়ান্স তৈরির ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে। গল্পটা আসলেই এক বসায় লেখা গল্প না। এ গল্পের শেষটায় একটা টুইস্ট রয়েছে। এটা করতে আমাকে আরেকটা চরিত্র আনতে হয়েছে। আর সেটা হচ্ছে ঐ বানরটা। এজন্য প্রথম থেকেই বানরের চরিত্রটি তৈরি করেছি। আমাদের জীবনে আসলে তো কোনো অংক নাই। আকস্মিকতা আমাদের সবার জীবনে ছায়ার মতো আছে। এই ভয়ঙ্কর আনপ্রেডিক্টিবিলিটাকে উপস্থাপন করতে ঐ বানরটা আমাকে সাহায্য করেছে।

সুমন রহমান : আমার কাছে অপসৃয়মান তীর গল্পটাও বেশ ভালো লেগেছে। এটা থিমের দিক থেকে বেশ ক্লাসিক্যাল একটা গল্প। এ গল্পটা যেভাবে লেখা দরকার ঠিক সেভাবেই লেখা হয়েছে। এটা আর অন্য কোনভাবে লেখা যেত না। যতটুকু স্পেস রাখা দরকার সব ঠিক ছিল। পুলিশ এসে ছেলেটাকে কী বলবে। পাঠক ভাবুক। আমি লেখক হিসেবেও অনেক ভেবেছি কী হতে পারে ছেলেটির। সে কি মারা গেল। আমার কাছে মনে হয়েছে ড্রাগ এডিক্ট ছিল। এই যে ভাবনা কিন্তু আপনাতেই এসেছে। গল্প কিন্তু খুব সাধারণ। থানা থেকে ফোন এসেছে বাবা মা যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী যাচ্ছেন, রাস্তা বন্ধ। তারা বসে আছেন। এই যে খুব সামান্য একটা গল্প, কিন্তু এটাও তীরের মতো বিঁধেছে। এখানে গ্লাস নিয়ে হাঁটলেন আপনি, যেকোনো সময় এটা ভেঙে যেতে পারত। কিন্তু এটা ভাঙল না। শেষে যদি এই রকম হতো যে, ডেডবডি পাওয়া গেল, এই গ্লাসটা কিন্তু ভেঙে যেত!

শাহাদুজ্জামান : যেটা হয় আসলে অনেক গল্পকার শেষ কথাটা বলতে না চাওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারে না। মানে শেষ কথাটা আমাকে বলতে হবে, লেখক হিসেবে এমন একটা মনোভাব অনেকের। আমি এটা মনে করি না।

সুমন রহমান : সেটাই। এই গল্পটায় পরিমিতিবোধের একটা চমৎকার ডিসপ্লে পাওয়া যায়। মানে আর কি, কতটুক বলতে হবে গল্প, কতখানি ডিমান্ড করে। নিশ্চয়ই এই গল্পটা অন্যভাবে লিখতে গেলে লাশ, লাশের ময়নাতদন্ত, মানে নানান দিকে নিয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু যায়নি যে, এটাই ঘটনা।

শাহাদুজ্জামান : মানে বহু নাটক করার সুযোগ ছিল।

সুমন রহমান : হ্যাঁ, মানে এই গল্পটা আপনি যেভাবে বলতে চাচ্ছেন এখানে, সেই গল্প তো আসলে এখানেই শেষ। এখানে আমার একটা জিনিস যেটা মনে হইসে যেটা অবভিয়াস যে এইটা এভাবেই লিখতে হবে, মানে একটা গল্প তখনই আপনার পছন্দ হবে, যেটা পড়ে মনে হবে যে না, এই গল্প তা এভাবেই লেখার কথা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শাহাদুজ্জামান : আমি একটু এই প্রসঙ্গে বলি আজকাল ফেসবুক ইমেইল এগুলার কারণে বহু পাঠক পাঠিকার চিঠি পাই। একটা মজার ব্যাপার আমি দেখি, মানুষের কৌতূহল। একজন আমাকে লিখেছেন, ওই টুকরো রোদের মতো গল্পের রিনা নামের মেয়েটা কি সত্যি ছিল? ফাঁসির আসামির সাথে আসলে তার কি হইছিল? তারপর, আরেকজন জানতে চেয়েছে যে অপসৃয়মান তীর গল্পটার ছেলেটার আসলে কী হয়েছিল? তো সাধারণ পাঠকপাঠিকার এইরকম অনেক কৌতূহল তৈরি হয়–

সুমন রহমান : এটা তো সাধারণ পাঠকের না, মানে আমি যদি নিজেরে সাধারণ পাঠক মনে না করি–সেটা আমার ভিতরও তৈরি হয়েছে। মানে এটা কিন্তু গল্পের সত্যি। এখানে সাধারণ-অসাধারণের কোনো পার্থক্য নাই।

শাহাদুজ্জামান : হ্যাঁ, তা অবশ্যই ঠিক। ছেলেটার কী হয়েছিল সেটা কিন্তু আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ না। আসলে লেখক হিসেবে আমিও জানি না ছেলেটার কী হয়েছে।

সুমন রহমান : এক্স্যাক্টলি! মানে এটা আসলে এমন একটা জায়গা আসলে আপনার জানার দরকার নাই, আপনি হয়তো বলতে পারেন কী হইছিল, মানে রহস্যোপন্যাসের এর মতো ৪/৫ খণ্ড। এক ভাগে আপনি বললেন কী হইছিল, পরের বার বল্লেন কেন হইছিল...মানে ধরেন লাগেজ হারায়া মেজাজ খারাপ, আপনি বললেন এইটা না, এইটা হইছিল। সেটা অন্য গল্প। তো গল্পটা এখানেই শেষ। তো আমি যেটা বলছিলাম আসলে খুব সামান্য একটা গল্প এটা। মধ্যবিত্তের খুব সামান্য গল্প, যে গল্প কোনো ভারী কোনো টপিক না। কিন্তু ভারী একটা বেদনা। কিন্তু বেদনাটাও এমন বেদনা যে আপনি বেদনাতেই সমাপ্ত করতে পারতেছেন না।

শাহাদুজ্জামান : এক ধরনের অসহায়ত্ব আছে পুরো ব্যাপারটাতে।

সুমন রহমান : হ্যাঁ, খুবই ভালনারেবিলিটি, মানে বিপন্নতা আছে এই গল্পটার। সাথে পুরাতন গল্পগুলোর একটা কন্টিনিউয়েশন আছে। আর যারা বলে আপনার এখনকার গল্পগুলো অন্যদিকে টার্ন করতেছে, এইরকম একটা দুইটা গল্প এই বইয়ে আছে যেটা দিয়ে আপনি কিন্তু আপনার বিহ্বল গল্পের যে ট্রাডিশনের মাঝে ফেরত যাচ্ছেন, আবার ঠিক যাচ্ছেনও না, মাঝে মাঝে ভিজিট করেন, এটা বোঝা যাচ্ছে।

শাহাদুজ্জামান : এবং চিঠি গল্পটায়ও কবিতার উপাদান আছে। হ্যাঁ, যেমন উবার নামের গল্পটাতে আবার কিন্তু কবিতার গন্ধ নাই। আমি জানি না ওইটা

~ www.amarboi.com ~

নিয়ে আপনার অনুভূতি কী? উবার হচ্ছে একটা মেয়ে বোরকা পরে তার হাজবেন্ডের উপর নজরদারি করতে যায়!

সুমন রহমান : হ্যাঁ ওইটা একটা মজার গল্প। ইন্টারেস্টিং গল্প–এই অর্থে যে লোকটার ক্যারেক্টার... উবার ড্রাইভারের যে ক্যারেক্টার ওইটা যে সে গান বাজায় এবং তার কোনো কিউরিওসিটি নাই।এই শহরটাকে সে চেনে। এইটা ইন্টারেস্টিং, ওই অর্থে যে, আপনার ঢাকা শহরের যে রিডিং, এইটা ওইখানে আছে। সবচেয়ে মজার বিষয় যে গল্পের লেয়ারে বিভিন্ন গল্প বলছে। যেমন, মামলার সাক্ষী ময়না পাখি। এটা অন্য লেয়ারের গল্প। একদমই এই বইয়ের অন্যগল্পের সাথে মিল নাই।

এখানে আপনি অন্যরকম। একই সঙ্গে পলিটিক্যাল ক্রিটিক, আবার ধরা যাক অন্য গল্প, পৃথিবীতে হয়তো বৃহস্পতিবার, খুব সিম্পল গল্প। এত সিম্পল যে পড়ে মনে হবে ও আচ্ছা, এটা তো আমার ঘটনা, এরকম তো ঘটেই। এরকম বিভিন্ন লেয়ার আছে এখানে। আর লেয়ারটা হয় কি আমার মতে গল্প সংকলনের ক্ষেত্রে বইটা তো নিজেই একটা কম্পোজিশন, মানে এটা শুধু লেখার সংকলন না। টোটাল একটা প্যাকেজ। মানে যদি একটা সরলরৈখিক গ্রাফ যদি হয়, সব লেখার একই এচিভমেন্ট, তখন আসলে বইটা বোরিং হয়ে যায়। যত ভালো গল্প হোক না কেন...। আর সব গল্প কিন্তু আপনাকে বোর করে না। আমি যেমন ক্রনোলজিক্যালি গল্প পড়ি না, র‍্যান্ডমলি পড়ি। প্রথম থেকে একটা দুইটা পড়ার পর আমি আবার প্রথম থেকে শুরু করছি। শুধু এটার ক্রনোলজিটা বুঝতে। এতে আমার মনে হয় যে আমি এমন একটা গ্রাফ পাব যেখানে আমি একটা ব্রিদিং স্পেস পাব। অন্য গল্পের ক্ষেত্রেও ব্রিদিং স্পেস না পেলে আমি পড়ি না।

শাহাদুজ্জামান : গল্পের ধারাবাহিকতা যদি ঠিক না থাকে তাহলে পাঠক হয় তো বইই পড়ত না। আবার একটা সরল গল্পের পরে ভারী গল্পে নিয়ে যাবার জন্য একটা ব্রিদিং স্পেস তৈরি করতে হয়েছে বেশ সচেতনভাবে। আমি কিন্তু পরিকল্পনা করে ক্রনোলজিটা করেছি, পাঠকের সাথে সাথে জার্নি করে করেছি।

সুমন রহমান : জার্নি খুব ইম্পর্ট্যান্ট, মানে আপনি পাঠককে এক্সপেরিয়েন্স দিচ্ছেন। বই নিছক গল্পের সংকলন না। আর বই পড়া ওষুধ খাওয়া একই–আপনি কোন ওষুধের পরে কোন ওষুধ খাবেন, এইটা ঠিক করতে হবে। যেমন এই বইয়ের প্রথম গল্প আর শেষ গল্প দুইটা মিলে একটা ব্রিজ তৈরি হইছে। যেটা আমাকে এট্রাক্ট করছে। শেষ গল্পটা ভালো লাগে নাই, কিন্তু পুরা কম্পোজিশনের ভিতর কিন্তু আমি এটাকে আলাদা করতে পারি না, সব গল্প ভালো লাগছে তা না, কিন্তু কম্পোজিশন এ খাপ খেয়ে গেছে। অনেক গল্প আলাদাভাবে পড়লে মনে হবে যে, না গল্পটা সঠিক টেস্ট দিচ্ছে না, কিন্তু কম্পোজিশন এ

~ www.amarboi.com ~

দেয়। প্রথমে উবার পড়ে তারপর মামলার সাক্ষী পড়লাম, তারপর আবার প্রথম থেকে পড়া শুরু করলাম, যার ফলে আমার কিন্তু অর্গানিক টেস্টের কোনো কলিউশন হলো না। এ কারণেই বইটাকে আমার কাছে টোটাল বই আকারে পড়া সম্ভব। এইটা একদম অন্য রকমের কম্পোজিশন।
আপনার আগের বইয়েও আপনি কম্পোজিশনে সচেতন ছিলেন, কিন্তু এইটা অন্য রকম। এইটাতে তীব্র সচেতন আপনি। আমি প্রথম থেকে পড়েই বুঝছি আপনি খুব কেয়ারফুলি অর্গানাইজ করছেন।

শাহাদুজ্জামান : এইটা ঠিক, কারণ আপনি কিছু জিনিস ফলো করতে পারছেন, আপনি নিজেও একজন লেখক হিসেবে এটা দেখতে পারছেন। ব্যাপারটা তাই ইন্টারেস্টিং। গল্পগুলো বইয়ে সাজানোর পেছনে কিন্তু একটা চিন্তা কাজ করেছে। সেই লাইন অব থটটা যখন পাঠক বুঝতে পারে তখন তা মজার।

সুমন রহমান : কিন্তু আপনি কি এর আগে ডার্ক হিউমার করছেন?

শাহাদুজ্জামান : আমার একটা গল্প আছে "কারা যেন বলছে" ওটা হচ্ছে কতগুলি মাস্তান টাইপের ছাত্র একজন মানুষকে গুলি করে মেরে ফেলে। ওয়ার্ল্ড কাপ দেখবে, প্রিন্সিপাল ছুটি দিচ্ছে না, তো কী করা যায়, একজনকে মেরে ফেলা যাক। এমন একটা প্যাঁচ লাগানো গেলে কলেজ বন্ধ হয়ে যাবে। পুরা গল্পই বলা হয়েছে মাস্তানদের পয়েন্ট অব ভিউ থেকে। একটা ফুটবল খেলা দেখার জন্য একটা মানুষকে মেরে ফেলছে, পুরা ব্যাপারটায় একটা ডার্ক ব্যাপার আছে।

সুমন রহমান : ডার্ক ব্যাপার আছে কিন্তু ডার্ক কমেডি না।।

শাহাদুজ্জামান : এতে কিছুটা কমেডি আছে।

সুমন রহমান : মামলার সাক্ষী হচ্ছে কমেডি। ডার্ক কমেডি। আমি এজন্য বললাম ডার্ক কমেডি হচ্ছে ফর্ম হিসেবে আমাদের লেখকরা এখনও নিতেই পারে না। ডার্ক কমেডি লেখা খুব টাফ! মেলোড্রামা হয়ে যায়।

শাহাদুজ্জামান : আর মামলার সাক্ষী, ময়না পাখি গল্পটা খুব রিস্কিভাবে এই ডার্ক কমেডির ব্যাপারটা মোকাবেলা করে। অনেক রকম ঝুঁকি আছে এইখানে, যেমন ধরেন- আমার কাছে এটা অনেকটাই মোরাল ডিলেমার জায়গা। নৈতিকতার জায়গা থেকে প্রশ্ন উঠতে পারে যে আসলে এই লোকটা প্রতারক কিনা? এখন এইটার অনেক রকম মাত্রা আছে। আপাতভাবে গল্পটায় একজন সাবঅল্টার্ন লোক এক ধরনের প্রতারণার আশ্রয় নেয়। এটাতে প্রশ্ন উঠতে পারে আমি এমন একজন লোককে দিয়ে এই কাজটা কেন করালাম। আমি বোধহয় শ্রেণি সচেতন না। কিন্তু আরো বড় প্রশ্নের সাথে ব্যাপারটা জড়িত কারণ হচ্ছে

~ www.amarboi.com ~

একে যদি আমি প্রতারক হিসেবে দেখি তাহলে আমরা প্রত্যেকে বড় বড় একজন প্রতারক। গল্পের একজায়গায় আমি বলেছি যে এ চরিত্র পরিস্থিতি অনুযায়ী সত্য তৈরি করেছে। আমরা সবসময় একটা সুতার উপর দিয়ে হাঁটি, এপাশে সত্য আরেক পাশে মিথ্যা। কখন কে কোন পাশে গিয়ে পড়ছে সেটা দেখাতে গিয়ে এক ধরনের ডার্ক হিউমারের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এ গল্পে, যেটা আপনি বললেন। সবাই এটা ধরতে পারবে কি না সন্দেহ করি। ভ্যাগাবন্ড চ্যাপলিন যেমন জোচ্চুরি করে, ইলিয়াসের হাড্ডি খিজির যেমন জোচ্চুরি করে। মামলার সাক্ষীর গাছিও এক ধরনের চালাকি করে।

সুমন রহমান : কারা যেন এই ব্যাপারে এরকম একটা সমালোচনা করছে, আমি কোথায় যেন পড়লাম! রানা প্লাজার ঘটনার মধ্যে যেটা হয়েছিল, একটা মোরাল পুলিশিং তো আছে।

শাহাদুজ্জামান : হ্যাঁ, এই নৈতিক দ্বন্দ্বের জায়গাটা ধরা অনেকের পক্ষে কিন্তু একটু কঠিন হতে পারে। ওটাই মনে হবে, লোকটা মনে হয় দুই নাম্বার। কিন্তু ওইটাই তো প্রশ্ন। ওকে যদি আমার দুই নাম্বার মনে হয়, তাহলে ম্যাক্রো লেভেলে আমরা সবাই তা করছি। আবার এই গল্পে কিন্তু রানা প্লাজার ক্রিটিকও আছে। যারা এইখানে নৈতিকতা নিয়ে ভাববে তাদের কথা ভেবে ওখানে কিছু কথা আছে। তো ওই সূক্ষ্ম পাঠ যারা করতে পারবে তারাই হয়তো খেয়াল করবে। সে অর্থে এই গল্পটা রিস্কি গল্প।

সুমন রহমান : হুম, এইটা খুবই রিস্কি গল্প। মানে এইরকম একটা গল্প এই রকম সাহসী কন্টেক্সট-এ বলা খুবই সাহসী ব্যাপার আছে। মানে এরকম জায়গায় হিউমার করাটা খুবই কঠিন একটা কাজ। এবং এইটাতে আমার মনে হয় পুঁথির ফর্মটা আপনাকে আসলে অনেকখানি স্পেস দিয়েছে।

শাহাদুজ্জামান : সেটা ঠিক, মানে আবহটা তৈরি করতে সাহায্য করেছে। আসলে ক্রমশ এই স্থানিকতার ব্যাপারটায় আমি আরো সচেতন হয়ে উঠছি, আমাদের এখানকার কালচারাল কোড, আমাদের এখানকার নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি, ভাবনা প্রক্রিয়া এগুলোর কাছে আমি যেতে চাই। আমি এখনো মনে করি না আমি যেতে পারছি। পুঁথি সেভাবেই কিছুটা এসেছে। আমার এই বইয়ের নাম মামলার সাক্ষী ময়না পাখি দেয়ার ভেতরও আমার সেই এজেন্ডাটা আছে।

সুমন রহমান : আপনার কয়েকটি বিহ্বল গল্পর বইটার এই নামের ভেতর একটা পলিশ ব্যাপার আছে, একটা ক্যাচি ব্যাপার আছে। এক অর্থে ক্যাচি আরেক অর্থে কলকাতার সাহিত্যের একটা ধারাবাহিকতা আছে, এক ধরনের পশ,

~ www.amarboi.com ~

সেটার থেকে এই নতুন বইয়ের নাম বাইরে চলে আসছে। আপনার অন্য বইয়ের যে নাম মানে যে ধরনের কাব্যিকতা, এই নামে এটা নাই। বরং আপনি পিছনের মানে বাংলাদেশের যে ঐতিহ্য, বাংলা ফোকের যে ঐতিহ্য, পুঁথির যে ঐতিহ্য, আপনি আসলে ওইটার কাছে নামের দিক দিয়ে গেছেন। মানে একটা প্রিকলোনিয়াল এরার দিকে যাওয়া। আপনার চিন্তাটা বোঝা যাচ্ছে, মানে আমি এখন বুঝতে পারি আপনার পরের বইটা কোনো দিকে যেতে পারে। এই বইয়ে এই ব্যাপারটার একটা গোড়াপত্তন হইছে।

শাহাদুজ্জামান : হ্যাঁ বলতে পারেন আমার চিন্তার একটা ট্রান্সফর্ম হয়েছে, সেখানে বলতে পারেন, একটা ডিকলোনিয়ালিটির ব্যাপার আসছে। আমার আরেক বইয়ের নাম কেশের আড়ে পাহাড়, সেটা লালনের একটা গান থেকে নেয়া। তো সেখানেও সে চেষ্টা আছে।

সুমন রহমান : হ্যাঁ, আপনার বেশ কয়েকটার নাম, ওই যে "কাগজের নৌকায় আগুনের নদী", মানে আপনার এখনকার নাম গুলা কিন্তু সেই আগের ঐতিহ্য থেকে মুক্ত।

শাহাদুজ্জামান : হ্যাঁ, আমার ওই রকম একটা সচেতন চেষ্টা আছে মুক্ত হওয়ার। এবার বরং আপনার গল্পের প্রসংগে আসি। আমি যেটা আগে বলছিলাম, আমি যখন কারো লেখা পড়ি, আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে একজন লেখক সমকালীন জীবনের যে বহুমুখী স্তর আছে সেটা ধরতে পারছে কিনা। তারপর আমি তার চোখটা বোঝার চেষ্টা করি, কী দেখছে সে, কীভাবে দেখছে। আপনার এই নিরপরাধ ঘুম গল্পে যেটা ইন্টারেস্টিং–বইটা নিয়ে আমি একটা ছোট্ট নোটও লিখেছিলাম ফেসবুকে, যে আপনার এই সাম্প্রতিক পৃথিবীর দিকে একটা তীক্ষ্ণ নজর আছে। এই সময়ের ডায়নামিক্স, বহুমাত্রিকতা। এইসময়ে ইস্যুগুলি আপনি সতর্কভাবে খেয়াল করছেন এবং সেসব ব্যাপারে রিফ্লেক্টিভ। আপনি তো এ বইয়ে মোটামুটি সবগুলো সম্প্রতিক ইস্যু নিয়ে আসছেন, মানে এই রোহিঙ্গা থেকে শুরু করে, ক্রসফায়ার, সুইসাইড, বোম্বিং, এলজিবিটি ইত্যাদি। নতুন প্রজন্মের অনেককে দেখি তারা শুধু সাহিত্য করতে চায়, সাহিত্যের মানচিত্রটার খোঁজখবর ভালোই আছে। ভালো ভাষাও আছে। কিন্তু তারা পুরনো লেখকদের পুনরুৎপাদন করেন শুধু। জীবনটাকে ঠিক নতুন চোখে দেখে না। এই সময়ের দিকে গভীরভাবে তাকায় না। আপনার এই বইটা তাৎপর্যপূর্ণ সেদিক থেকে যে, এখানে এই সময়টার একটা চমৎকার প্রতিফলন আছে এবং সময়টাকে একটা নতুন চোখে দেখার চেষ্টা আছে। আপনার *গরিবি অমরতা* বইটাতে যে কাব্যিক আবহ ছিল এই বইয়ে তুলনামূলকভাবে তা কম। অবশ্য এই যে কনটেম্পোরারি টপিক ধরে ধরে লেখা সেটা শক্তি যেমন তেমন খানিকটা আরোপিতও মনে হয় কখন,

~ www.amarboi.com ~

যেন এসব নিয়ে লেখা দরকার তাই এক একটা গল্প দাঁড় করাচ্ছেন। এই এসময়ের টপিক ধরে লেখাটা কি আসলে ডেলিবারেট প্লানের অংশ?

সুমন রহমান : হ্যাঁ এটা আসলে এক ধরনের ডেলিবারেটই, কারণ এই ইস্যুগুলো এত বড় আর কমপ্লেক্স যে তাদের ডিল করা খুব ঝুঁকিপূর্ণ। বিশ্লেষণী চিন্তার লোক হিসেবে এসব বিষয়ের ব্যাপারে আমি সবসময় চ্যালেঞ্জ ফিল করি। ফলে, এদেরকে বিশ্লেষণী চিন্তাপদ্ধতির বাইরে কাহিনির ন্যারেটিভে নিয়ে আসার একটা চেষ্টা থাকতেই পারে। কিন্তু পাহাড়ে যেকোনো ঘর বানাইলে বাচ্চার ঘর হয়ে যায়, মানে এমন একটা টপিক যেটা নিজেই খুব ডিস্কার্সিভ, সাহিত্যের জন্য স্বভাবতই ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ। এরকম ঝুঁকির কাজ আমার নিজের জন্য খুব পছন্দ। যেমন ধরেন, আপনি জঙ্গিবাদ নিয়ে একটা গল্প লিখবেন! এখন আমি একজন সাধারণ গল্পকার হিসেবে কী লিখতে পারি? এই রিয়েলিটি এত বেশি ডাইভার্সিফাইড, এখন যে কোনো গল্পই ক্লিশে হতে বাধ্য। তখন এরকম পরিস্থিতি তে গল্প লেখা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। তখন মনে হয়, না একটু ইয়ে করে দেখি... ।

শাহাদুজ্জামান: হ্যাঁ, আপনার টপিকগুলো খুবই টপিক্যাল। সেটা এক অর্থে বোঝা যায় খুব সাজানো, মানে খুব বেছে বেছে লেখা, যেমন আপনি যেমন ভাবছেন এলজিবিটি নিয়ে একটা গল্প লিখি, ক্রসফায়ার নিয়ে লিখি, এরকম। এই অতি কনশাসনেসটা এক ধরনের দুর্বলতা হিসেবেও দেখা দিতে পারে। তবে আপনি গল্পগুলাকে ডিল করছেন চমৎকারভাবে, ওইটাই আমার কাছে ভালো লেগেছে। যেমন ঐ জঙ্গিবাদ নিয়ে গল্পটায় একজন প্রোটাগনিস্ট তৈরি করছেন, যে একজন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির লোক। তার বয়ান দিয়ে আপনি গল্পটা বললেন, এইটা সত্যিই ক্রিয়েটিভ।

সুমন রহমান : আমার চেষ্টা তাই ছিল, যে টপিক আমি ডেলিবারেটলি পছন্দ করছি, অন্যদের ক্ষেত্রে যেটা হয়–গল্প তারা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে বলেন। হ্যাঁ, এক্সপেরিমেন্ট আছে কিন্তু গল্প মূলত অভিজ্ঞতা থেকে আসে। আমার এইটা খুব ডিডাক্টিভ, আমি আসলে আগে টপিক নির্ধারিত করছি। প্রথম গল্প ক্রসফায়ার, তার পরের গল্প জঙ্গিবাদ, তার পরের গল্প রোহিঙ্গা, তার পরের গল্প এলজিবিটি, তার পরের গল্প অটিজম, মানে আমার কথা এই ইস্যুগুলা কেন চুজ করছি? প্রথমত, ইস্যুগুলা সোশ্যালি সল্‌ভড না, এইগুলা তো আমাদের সবসময় তাড়িত করে, আমি যখন গল্পের টপিক নির্বাচন করি, তখন আমি ক্রিয়েটিভ না, তখন আমি আসলে প্রাবন্ধিক মন নিয়ে নির্বাচন করি।

শাহাদুজ্জামান : মানে নানা কিছু দিয়ে প্রোভকড হয়ে।

~ www.amarboi.com ~

সুমন রহমান : মানে সোজা কথায় আমি ক্রিটিক্যাল থিঙ্কার হিসেবে গল্পের বিষয় নির্বাচন করি। কিন্তু আপনি যেটা বললেন, গল্প যখন লিখতে বসি তখন আমি প্রবন্ধ লিখি না, তখন আমি গল্পই লেখার চেষ্টা করি, যতটুকু পারি... কিন্তু বিষয় নির্বাচনের সময় ওইটা আমি ইচ্ছে করেই করছি, এই বইয়ে অন্তত, আগের বইটায় না।

শাহাদুজ্জামান : সেটা বোঝা যায়। এটা আমার কাছে এক দিক দিয়ে ভালো, মনে হয়েছে কিন্তু বেশি অবভিয়াস হলে যেটা হয়, অনেক সময় মনে হয় এক ধরনের সাজানো বাগান।

সুমন রহমান : হ্যাঁ, ঠিকই। তবে আমি যদি কোনো গল্পে ফেল করে থাকি, তাহলে আমি রোহিঙ্গা গল্পটায় ফেল করেছি।

শাহাদুজ্জামান : কিন্তু আপনার চেষ্টাটা ভালো ছিল। রোহিঙ্গা গল্পে আপনি কবি আলাওল এর সাথে লিংক করার চেষ্টা করছেন যা খুবই ফ্যাসিনেটিং। এর জন্য আপনাকে নিশ্চয়ই কৃতিত্ব দিতেই হবে, কিন্তু গল্পটার সম্ভাবনাটা পুরোপুরি ব্যবহার হয় নাই।

সুমন রহমান : এই ধরনের টপিকের ক্ষেত্রে এই ধরনের গল্প খুবই রিস্কি। আমি আসলে অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়েছি। সম্ভবত অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের কারণে। আচ্ছা দেখি তো, হবে না কেন? এরকম আর কি? হ্যাঁ, আর এইটা হয়েছে বইয়ের প্রথম গল্পটার কারণে।

শাহাদুজ্জামান : প্রথম গল্পটা তো কোনো একটা মিডিয়া জগৎ নিয়ে।

সুমন রহমান : হ্যাঁ, আসলে আমি, দ্বিতীয় গল্পটার কথা বলতে চাচ্ছিলাম, *নিরপরাধ ঘুম*। নিরপরাধ ঘুম আমি যখন লিখি, তখন এইটা আসলে অনুরোধে লেখা মানে ঈদ সংখ্যা থেকে আমার কাছে একটা গল্প চাওয়া হলো। আমি তখন ব্রিসবেনে থাকি, কেবল গিয়েছি পিএইচডি করতে, তখন আমার মগজ সাহিত্যের ভেতর নাই আর কি, জাস্ট থিসিস প্রপোজাল লিখতেছি। তো তখন আমাকে গল্প লিখতে হবে! সম্পাদক আমার খুব কাছের মানুষ, খুব করে বললেন, লিখতেই হবে। ফলে লিখতে বসলাম আর কি।

শাহাদুজ্জামান : প্রথম আলো?

সুমন রহমান : প্রথম আলো। সাজ্জাদ ভাই, সাজ্জাদ শরিফ। আমার কাছ থেকে গল্প না পেলে কষ্ট পাবেন, তাই নিরুপায় হয়ে লিখা। আমাকে কেউ কিছু বললেই আমি প্রথমে হ্যাঁ বলে দেই, মানে পছন্দের লোকদের না বলি না। পরে আর পারি

~ www.amarboi.com ~

না যখন, তখন একটা অপরাধবোধ হয়। যাই হোক, ভাবতে শুরু করলাম যে কী নিয়ে গল্প লেখা যায়? মানে এইরকম, পুরো জিনিসটাই সাজানো। কী নিয়ে লেখা যায়। তখন মনে হলো ক্রসফায়ার নিয়ে লেখা যায়। তো এইভাবে, এইটা কিন্তু অর্গানিক না!

শাহাদুজ্জামান : তারপর ঐ গল্পে যে পরিবার যে চরিত্রগুলো তৈরি করলেন, তাদের কীভাবে নির্বাচন করলেন?

সুমন রহমান : আমার মনে হয় আমার গল্পের মধ্যে আমি, আমার ফ্যামিলি, আমার আশপাশের লোকজন অনেকভাবে ডাইলোটেড হয়ে থাকি। সেটা সবারই থাকে। মানে এখন ক্রসফায়ার নিয়ে আমি কী গল্প বলব? মানে ক্রসফায়ার নিয়ে আমি তো পড়লাম, অনেকের গল্প পড়লাম যে, গল্পের শেষে ক্রসফায়ার হয়। বা শুরুতে হয়। তো, এটা তো খুব কমন জিনিস। এখন ক্রসফায়ার নিয়ে আমি ফেসবুকে ছোটখাটো একটা নোট লিখছিলাম। যেখানে আমি দেখাতে চাইছিলাম কীভাবে ব্যাপারটা একটা মনস্তাত্ত্বিক বিপন্নতা তৈরি করে। আমার মনে হলো এই যে একটা ছোট্ট থট! এইটাকে যদি আমি গল্পে লিখতে চাই, তাহলে কীভাবে লিখব? তো তখন আসলে এইভাবে জিনিসটা তৈরি করা। আর শেষের যে টুইস্টটা–আসলে চিন্তার ভেতরেই ছিল না। মানে এই পুরা গল্পটাই তো অন্য জায়গায় নিয়ে যায় এই টুইস্টটা, মানে ঘটনাটা ঘটেছে কি ঘটে নাই, এমন একটা কনিফউশন তৈরি করা। আসলে এর থেকে অন্য কোনভাবে আর বলা যেত না।

শাহাদুজ্জামান : টুইস্টটা ছাড়াও আপনার এই গল্পটা বলার ভঙ্গিটা আমার খুব পছন্দের। এই গল্পটার ভিতরে এই বইয়ের অন্যান্য গল্পের চাইতে কবিতার অভিজ্ঞতাটা পাওয়া যায়। আর আমার কাছে গল্পটা একটা জার্নি মনে হয়েছে। একটা খুব গভীর বেদনার জার্নি। একটু আগে আপনি আমার *অপসৃয়মান তীর* গল্পটার কথা বলছিলেন, আসলে জীবনটাই তো এরকম। যা ছুটে যায়, সেটা কোথায় যে ছুটে যাবে সে তো বলা মুস্কিল, সেই তীর তো আর ফেরানোর উপায় নাই। এই যে পরিবারটা, বাবা-মার কতরকম স্বপ্ন, কিন্তু ছেলে দুইটা তীরের মতো কোথায় যে ছুটে গেছে, মা-বাবা দুজনেই কেমন হেল্পলেস। মানে পুরো পরিস্থিতিটার উপর তাদের আর কোনো নিয়ন্ত্রণ নাই। মা চরিত্রটা এমন মায়াময়। তার তো স্বপ্ন দেখা ছাড়া, অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নাই। সেই মা যখন চিনি দিয়ে শরবত না কী যেন বানিয়ে দিতে চাচ্ছে ছেলেটাকে–সে জায়গাটা কবিতার মতো। বুকে গিয়ে লাগে। একটা হাহাকার আছে। ওই অর্থে গল্পটা আমার কাছে শুধু ক্রসফায়ারের গল্প মনে হয় নাই। জীবনের অনেক গভীর কিছু অনুধাবনের জায়গা আছে।

~ www.amarboi.com ~

সুমন রহমান : একেবারেই ঠিক বললেন। একদিকে গভীর অনুধাবন, অন্যদিকে গভীর অনিশ্চয়তা। একভাবে বললে, পুরো গল্পটা শুরুই হলো বাবা মারা যাওয়ার পরে। ছেলেকে পুলিশ ছেড়ে দিয়েছে, নাকি ছেলের প্রেতাত্মা আসছে, এটা তো শিওর না। কারণ গল্পটার অন্য জায়গায় বলা হচ্ছে ছেলেটাকে মেরে ফেলছে।

শাহাদুজ্জামান : এক ধরনের ইল্যুশন হতে পারে।

সুমন রহমান : হয়তো বা। অনেক ধরনের ইন্টারপ্রিটেশনের জায়গা আছে। আর সেখানে, বাবা আসছেন, গেট খোলা! এখন এইটা কি প্রেতের সমাবেশ নাকি এখানে আসলে ঘটনাটা ঘটেই নাই। কার যেন কথা এটা, আমি খুব মনে রাখি: মাই লাইফ ওয়াজ ফুল অব টেরিবল মিসফরচুনস, মোস্ট অব হুইচ নেভার হ্যাপেনড! একদিকে যেমন ক্রসফায়ার ঘটছে, অন্যদিকে সমান তালে ঘটছে তার অস্বীকৃতি। এই ফর্মাল অস্বীকৃতির কারণে টোটাল ডিসকোর্সটা মানুষের মাঝে যে আতংক তৈরি করতেছে, আমি আসলে ওই আতংকটাকে ধরতে চাচ্ছিলাম।

শাহাদুজ্জামান : তবে আমার মনে হয় ঐ গল্পটায় আতংক আর ক্রসফায়ার ছাড়াও আরো অন্য মাত্রাও আছে। এটা একটা আকাঙ্ক্ষার গল্প, পাঠক হিসেবেও আমরা চাই যে, বাবা যদি ফিরে আসত। ইফ! মানে ওই ইফের গল্পটা আছে, সেটাই স্পর্শ করে। আমার মনে হয় যে, সত্য কি মিথ্যা তার চেয়েও বড় কথা জিনিসটা যদি ঘটত। আর যেটা বলছিলাম যে আপনার বইয়ের গল্পগুলোতে যেটা ইন্টারেস্টিং লেগেছে, সেটা হলো গল্পটা বলার পয়েন্ট অব ভিউ। আপনার প্রথম গল্পটা আপনি বলেছেন অফিসের রিসেপশনিস্ট এর পয়েন্ট অব ভিউ থেকে। ঠিক এই ধরনের চরিত্র তো সাধারণভাবে নোটিসড হয় না। কিন্তু তাকে আপনি প্রধান চরিত্র করে তাকে দিয়ে পুরো গল্পটা বলালেন। আবার একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির লোককে দিয়ে আপনি নীল হিজাব গল্পটা বলালেন। এই আপাত অপ্রাসঙ্গিক দিয়ে গল্পের কেন্দ্রে ঢোকার এই টেকনিকটা চমৎকার। কোন ভাবনা থেকে এই এ্যাপ্রোচটা আপনি নিলেন?

সুমন রহমান : আমি তখনই লিখতে বসি যখন আমি নিশ্চিত হতে পারি যে, গল্পের ন্যারেটর কে হবে। ন্যারেটর মানে "আমি" লিখি, আমার উত্তম পুরুষে গল্প লিখা খুব পছন্দের। খুব কমই আছে উত্তম পুরুষে না-লেখা গল্প। তো আমিটা আসলে কে হবে? গল্পের চরিত্রগুলো আমার চোখের সামনে থাকে। তখন একজনের উপর আছর করতে হয়। আমি আসলে বলতে পারি না কার উপরে প্রথমে আছর করলে আমি গল্পটা বলতে পারব। এখানে ধরা যাক প্রথম গল্পটা, মানে মিডিয়া নিয়ে যে গল্পটা। এইটা যদি আমি প্রডিউসারের উপর আছর

~ www.amarboi.com ~

করতাম, তাহলে গল্পটা একজন বাবর আলী বা খেলারাম খেলে যা টাইপের হতো। মানে পুরো গল্পটার মজাই কিন্তু এইখানে, মানে এই প্রোটাগনিস্ট আসার পরেই কিন্তু গল্পটা এই জায়গায় আসছে।

শাহাদুজ্জামান : ওইটাই আপনার গল্পের শক্তি। আপনি যে পয়েন্ট অব ভিউ নিচ্ছেন, আপাতভাবে তাৎপর্যহীন চরিত্রগুলোর জায়গা থেকে গল্পটা বললে, বিষয়ের মেলোড্রামাটাকে অনেকটা নিউট্রিলাইজ করা যায়।

সুমন রহমান : এক ধরনের সাব-অল্টার্ন পজিশন আমি নির্বাচন করার চেষ্টা করি–এটা একটা আছে, আবার ধরেন জঙ্গি নিয়ে গল্প, নীল হিজাব। এখন নীল হিজাবের গল্প লিখতে যেয়ে আমি ইন্স্যুরেন্স এর গল্প বলতেছি। এবং আমি কাশেম বিন আবু বকরের আদলে একটা চরিত্র তৈরি করলাম। মানে মূল কাহিনিটা কী? মূল কাহিনি হচ্ছে দেখতে একইরকম দুই বোন–ছোট বোনটা জানে যে বড় বোনটা আত্মঘাতী হবে, তো একটা ইন্স্যুরেন্স বা কিছু করে গেইন করা যায় কিনা। তো সেটা সে করে নিয়েছে। ফলে এখানে একটা ডিলেমা আছে আদৌ বড় বোনটা করছে, না ছোট বোনটা। কিন্তু মূল গল্পটা তো সামান্য। একটা ফ্যামিলি, তারা আত্মঘাতী। এভাবেই শেষ। এখন জঙ্গিবাদের গল্প আর কীভাবে বলতে পারি, আমি বড়জোর একটা বীভৎস বর্ণনা দিতে পারি। কিন্তু এসব তো জানিই আমরা।

শাহাদুজ্জামান : ঠিক। এখানেই গল্পকার জার্নালিজমকে ছাড়িয়ে যায়। সেটা আপনি সার্থকভাবেই করেছেন। তবে ওই গল্পটার ভেতর কাশেম বিন আবু বকরের নামের খুব কাছাকাছি একটা নাম ব্যবহার করেছেন, সেটা আমার কাছে মনে হয়েছে একটু বেশি স্পষ্ট। বাস্তব চরিত্রের সাথে দূরত্ব তৈরি হওয়া দরকার। কিন্তু এই সংবাদপত্রের গল্পকে আপনি গল্পে উতরে নিতে পেরেছেন নিঃসন্দেহে।

সুমন রহমান : সংবাদপত্রের স্টোরি অথবা এনজিও টপিক। তাহলে আমাকে কেউ কৃতিত্ব যদি দেয়, তো দিতে পারে যে এগুলো এত্ত অবভিয়াস, মানে ডেভেলপমেন্ট ডিসকোর্স, এগুলোর ভেতরে গল্পটা কোথায়?

শাহাদুজ্জামান : আপনার ওই গল্পটাও আমার খুব পছন্দের, ওই যে, *হাবা যুবকের হাসি*, মানে চরিত্রের যে ডুয়ালিটি, এই যে একটু আগে আমি বলছিলাম লাইফের আনপ্রেডিক্টেবিলিটি আর অ্যামবিগুইটির, এই গল্পে তার আভাস দেখি। একটা ছেলে শুধু প্রেক্ষাপট বদলানোর কারণে তার আইডেন্টিটির বদল করার সুযোগ পায়। যদিও তার আইডেন্টিটি নিয়ে সে নিজেই কনফিউজড ছিল।

~ www.amarboi.com ~

সুমন রহমান : সেক্সচুয়ালিটি জিনিসটা পার্ফমেটিভ, এটিই বলতে চেয়েছি এই গল্পে। এই গল্প বাংলাদেশে তো খুব রিস্কি। এখানে যদি আমি একটা অবভিয়াস হোমোসেক্সচুয়ালিটিকে হাইলাইট করতে যাই তাহলে আমাদের গতানুগতিক মানসিকতার জন্য অনেকভাবে রিস্কি–অন্তত অ্যাসথেটিক্যালি এবং সোশ্যালি। ফলে আমার কাছে মনে হয় যে এই রকম চরিত্র আমি দেখছি, যারা আসলে তাদের সেক্সচুয়ালিটি নিয়ে কনফিউজড। এমনিতে হয়তো খুব হেটেরোসেক্সচুয়াল জীবনযাপন করছে, কিন্তু তার সেক্সচুয়াল আর্জটা হেটেরোসেক্সচুয়াল না। সামাজিক বিধিনিষেধের কারণে, এমনকি জ্ঞানতাত্ত্বিক গড়নের কারণেও এটা সে ওভারকাম করতে পারে না। এভাবেই জীবনটা পার করে দেয় আর কি।

শাহাদুজ্জামান : ঠিক। আমি আরো একটা কথা বলছিলাম সাহিত্যের স্থানিকতার ব্যাপারে। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কোন ইউভার্সাল ফেনোমেনার একটা স্থানীয় চরিত্র থাকে । সেই স্থানিকতার ব্যাপারটা সাহিত্য ধরে তার বিষয়, চরিত্রের ভেতর দিয়ে। আপনার গল্পে সেই চেষ্টা আমি দেখি। জঙ্গীবাদ তো একটা বৈশ্বিক ব্যাপার, কিন্তু তার একটা স্থানীয় চেহারা আছে, আপনার *নীল হিজাব* গল্পে তার নমুনা আছে, সেক্সচুয়াল আইডেন্টিটির বিষয়টারও একটা আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ তারও একটা স্থানিক রূপ আছে। আপনার হাবা যুবকের হাসিতে এই বিষয়ের স্থানিক রূপটা আছে।

সুমন রহমান : এই জায়গাটায় একটু বলি: আমি যখন ক্রিটিক্যাল স্টাডিজ পড়তে শুরু করি, আমার পড়া অনেক সাহিত্য আমার কাছে জলো মনে হতে লাগল। প্রবন্ধ বলুন বা গল্প, সবই তো চিন্তার মামলা, সৃষ্টিশীলতার অবজার্ভেশনের মামলা। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে একটা প্রবন্ধের বই কখনো উপন্যাসের চেয়ে অনেক শক্তিশালী অবজার্ভেশন আমার সামনে হাজির করতেছে। এইটা কেন হবে? তাহলে সাহিত্য কি মিডিয়াম হিসেবে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলছে কি না? কিন্তু আমার সামনে যখন টলস্টয় থাকে বা রুলফো থাকে, তখন মনে হয়, না–সাহিত্যই তো ডমিনেইট করছে! তার মানে কি বর্তমানের সাহিত্য ঐ রেসে পিছনে পড়ে যাচ্ছে? আমি ইলিয়াসের উপরে একটা লেখা লিখছিলাম। ওইখানে হাড্ডি খিজির ক্যারেক্টারটা নিয়ে বলতে গিয়ে লিখেছিলাম, দেখি যে এর যে চরিত্র, আরবান সাবঅল্টার্ন –সে ওইখানে যে রোলটা প্লে করে, এ রোলটাকে আমরা বলি, উইপন অব দ্য উইক। দুর্বলের অস্ত্র একটা থিওরি আছে স্কটের...

শাহাদুজ্জামান : জেমস স্কট এর...

সুমন রহমান : হ্যাঁ। এর একটা আরবান ভার্সনও আছে মিশেল দ্য সার্তিওর, এটাকে তিনি নাম দিয়েছেন পোচিং। *দ্য প্র্যাক্টিস অব এভরিডে লাইফ* বইতে ।

~ www.amarboi.com ~

আরবান সাবঅল্টার্ন এমন একটা ক্যারেক্টার যে আসলে বিপ্লবী না, আবার লুম্পেনও না। এটা অদ্ভুত নৈতিকতা এবং নৈতিকতাহীনতার মাঝামাঝি সে অবস্থান করে সে, কোনভাবেই জাজমেন্টাল না হয়ে। এরকম একটা চরিত্র কিন্তু খিজির। স্কটের যে থিওরি–মোরাল ইকোনমি অব দ্য পুওর–সে ধান চুরি করতেছে এবং ঠিক ততটুকুই চুরি করতেছে যতটুকু মনে করতেছে তার প্রাপ্য মজুরি থেকে তাকে কম দেয়া হচ্ছে! এটাই মোরাল ম্যানেজমেন্ট তার, পোচিং এর ক্ষেত্রেও এমন–মালিকরে বাসায় পৌঁছায়া দিতেছে অফিসের গাড়ি, আর ফিরে আসার সময় একটা ট্রিপ নিয়ে আসতেছে। তাতে মালিকের ক্ষতি হচ্ছে না, কিন্তু সে যেটুকু বেতন কম পায়, ওইটা কাভারড হচ্ছে। টাইমিংটা দেখুন, সার্তিওর বইটা চুরাশিতে বের হইছে, স্কটের বইটা পঁচাশিতে বের হইছে। ইলিয়াস চিলেকোঠার সেপাই লিখেছেন উনিশশো তিরাশির দিকে। বই বের হইছে পঁচাশি বা ছিয়াশির দিকে। তাহলে তো সাহিত্য সমান তালেই আগাচ্ছে, পিছাচ্ছে কোথায়? কিন্তু এখনকার সাহিত্য পড়লে মনে হয় যেন চিন্তাশীল লেখালেখির ঐতিহ্য থেকে বহুদূর পিছিয়ে পড়া কোনো মাধ্যম!

শাহাদুজ্জামান : এইটা ইন্টারেস্টিং একটা জায়গা আপনি ধরেছেন। এই যে আইডোলজি বেজড আর ইম্পেরিকাল সাহিত্য। এসব নিয়ে ইলিয়াস ভাইয়ের সাথে আমার অনেক আলাপ হয়েছে। আইডোলজি বেজড সাহিত্যের সীমাবদ্ধতা নিয়ে আমরা কথা বলেছি। লেখকের একটা আদর্শিক ওরিয়েন্টেশন থাকবেই, তার জীবন জিজ্ঞাসা তার লেখাকে ডিকটেট করে কিন্তু তার ঝুঁকির জায়গাগুলোর ব্যাপারে সচেতন থাকা দরকার। এই যে খিজিরের কথা বললেন, ইলিয়াস ভাইয়ের সাথে খিজির নিয়েও কথা হয়েছিল। আমি তার একটা সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম তাতে দেখবেন হাড্ডি খিজির নিয়ে এই কথাটাই তিনি বলেছেন। খিজির প্রলেতারিয়েত বলে সে মহান না, তার ভেতরও জোচ্চুরি আছে। তো ইলিয়াস ভাই একথা বারবার বলতেন যে জীবনতে সামগ্রিকতায় দেখতে হবে। মানুষ তার ক্রোধ, ভালোবাসা, দুর্বলতা, নিয়েই মানুষ। আমাদের তো বুঝতে হবে যে কোনো মানুষই ইডিওলজিক্যালি ড্রিভেন হয়ে প্রতিদিন চলাচল করে না। সাহিত্যে সেটা চাপিয়ে দেয়ার কোনো মানে হয় না। কিন্তু তার যাবতীয় নেতিবাচকতা নিয়েও সে মহান হতে পারে। আগেই যেমন বলছিলাম আমার মামলার সাক্ষী গল্পের মূল চরিত্রটাও কিন্তু একজন সাবঅল্টার্ন মানুষ। এখন আদর্শ তাড়িত সাহিত্য হয়তো বলবে যে গরিব মানুষ তাকে প্রতারক বলা যাবে না, দুই নাম্বার বলা যাবে না, জোচ্চর বলবে না। ইলিয়াস ভাই যেমন বলতেন একজন গরিব মানুষ যদি সবগুণে গুণান্বিত মহান মানুষই হবেন তাহলে তো আর সমাজ বদলের কোন দরকার নাই, সে মানুষ তো অলরেডি মহান হয়ে বসেই আছেন। একজন মানুষের নেতিবাচক দিকটা দেখালেই তার মনুষ্যত্ব কমে না। বোঝা

~ www.amarboi.com ~
দরকার কোন প্রেক্ষিতে সেই আচরণটা সে করছে। আমার ঐ গল্পে লোকটার ঐ মিথ্যা কথা বলার সিদ্ধান্তকে 'উইপন অব দি উইক' বলতে পারেন। একটা ইডিওলজিক্যাল ন্যারেটিভ মাথার ভেতরে নিয়ে জীবনটাকে ওর ভিতর বসানো যায় না। জীবনের খুব অতলে যে অন্ধকার আছে, জীবনের যে ব্যাপক বহুমাত্রিকতা আছে সেটা সাহিত্যে ধরতে ভয় পাওয়ার তো কিছু নাই। আপনার গল্পগুলো আমার সে অর্থে ইডিওলজি-ড্রিভেন মনে হয়নি। আপনি আজকের বিশ্বের অনেক জটিল বড় বিষয়গুলো ডিল করেছেন কিন্তু সেটাকে ম্যাটার অব ফ্যাক্ট হিসেবে দেখেছেন। এবং নন-জাজমেন্টালি জীবনের ভেতরটা দেখার চেষ্টা করেছেন। জীবনের তলানির বোধটা তো বেদনার। বেঁচে থাকার গভীরে একটা বিষাদ আছে, একটা ভালনারেবিলিটি আছে। সে বিষাদ, সেই ভালনারেবিলিটি আপনার গল্পগুলোর ভেতরে পাওয়া যায়। এই যে, আপনার শেষ গল্পটা–

সুমন রহমান : সুপার হিরো পরিবার...

শাহাদুজ্জামান : হ্যাঁ, একটা খুব বেদনা আছে এই গল্পটার গভীরে। একটা অটিস্টিক বাচ্চাকে পালন করার যে সংগ্রাম, সে বেদনাটা এসেছে এ গল্পে। আপনার *নিরপরাধ ঘুম* গল্পের ভেতরেও। একটা বেদনা স্রোত আছে। এই গল্পগুলোর ভেতর মানুষের যে নাজুকতা, তার প্রতি ইঙ্গিত আছে। আমার বইটাতে নাজুক মানুষের সংলাপ নামে একটা গল্প আছে যেটার কথা আপনিই বলছিলেন, সেখানেও আমি মানুষের এই ভালনারেবিলিটির কথাই বলতে চেয়েছি।

সুমন রহমান : আমার তো মনে হয়, ইট হ্যাজ টু মিন ইউনিভার্সাল, মানে নাজুক মানুষ ছাড়া সাহিত্য হবে না, মানে নাজুক মানুষ মানে তো গরিব মানুষ না। লুক এট অ্যানা কারেনিনা, এক্সট্রিমলি নাজুক! এত নাজুক মানুষ হয় নাকি। মানে প্রত্যেকটা চরিত্র নাজুক। অথচ এলিট। আমাদের প্রব্লেম হচ্ছে আমরা যে হালের এরকম চিত্র দেখতেছি, বলা হচ্ছে গরিবের সাহিত্য, বড়লোকের সাহিত্য। কিন্তু সাহিত্য তো হয় নাজুক মানুষের। তাহলে তো সাহিত্য হওয়ার দরকার কী? না ইভেন্ট তো হবে তখন, যখন মানুষ নাজুক হবে। কখনো তো তার মুখস্ত ফরম্যাটের বাইরে যেতে হয়। ঝোঁকের বাইরে তাকে যেতে হয়। ঝোঁকের বাইরে গেলেই তো এটা গল্প হয়। আর ঝোঁকের মধ্যে থাকলে তো তা গল্প না, এটা তো এজ ইউজুয়াল, হ্যাঁ এটাই তো হওয়ার কথা।

শাহাদুজ্জামান : এই নাজুকতা কিন্তু রাজনীতির বিষয় যত না তার চেয়ে বেশি সাহিত্যের বিষয়। অন্য জ্ঞানকাণ্ড যা লক্ষ্য করবে না সাহিত্য তার লক্ষ্য করবে। ওই যে কুন্ডেরার একটা কথা মনে পড়ে, তিনি বলছেন রাশানরা যখন চেকস্লোভাকিয়া ইনভেড করে, ওরা ঢুকে প্রথমে যত রাস্তার কুকুর ছিল সব গুলি

~ www.amarboi.com ~

করে মেরে ফেলে। লোকালয়ের মানুষের ভেতর একটা সাইকোলজিকাল ইমপ্যাক্ট তৈরি করার জন্য তারা এটা করে। তো এই স্মৃতিটা কোনো সমাজবিজ্ঞানীর জন্য হয়তো গুরুত্বপূর্ণ না, পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট হয়তো ভুলে গেছে, কিন্তু লেখক হিসেবে ওটা কিন্তু তিনি মনে রেখেছেন এবং সাহিত্যে ব্যবহার করেছেন। মানুষের সত্যিকার নাজুকতার দিকে যদি খেয়াল করেন আপনি, তখন কিন্তু মানুষের এই যে অহংকার, তারপর এই সাহিত্যকে ঘিরে যে নানা অহম, প্রতিযোগিতা সব তুচ্ছ হয়ে যায়।

সুমন রহমান : হুম, সেটা তো সাহিত্যের বাইরের বিষয় মনে হয়। সাহিত্যের ভিতরের বিষয় না।

শাহাদুজ্জামান : কিন্তু ওগুলোর দিকেই তো নজর বেশি দেখতে পাই!

সুমন রহমান : হ্যাঁ, নজরটা ওইখানে চলে যায় আর কি... সাহিত্যের রাজনীতি সাহিত্যের চেয়ে বড় হয়ে যায়। সাহিত্য যদি থাকে তাহলে তো এটা থাকার কথা না! সাহিত্য নাই বলেই তো সাহিত্যের রাজনীতি বড় হয়ে যায়। মানে যারা সাহিত্য করে তাদের তো আর এগুলো দরকার পড়ে না। তার তো ওই অন্তর্গত ক্ষমতাটাই তৈরি হয়। এইগুলা না করলেও হয়।

শাহাদুজ্জামান : আর এখন আমরা একটা বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এসে পৌঁছেছি, আমরা বাংলাদেশের মতো একটা জিওপলিটিক্যাল জায়গায় বিশাল বৈশ্বিক রাজনীতি অর্থনীতির অংশ হয়ে গেছি। এতে আমাদের নাজুকতা আরো বেড়ে গেছে। ভার্চুয়াল, অনলাইন পৃথিবী মিলিয়ে আমাদের মনোযোগ, আমাদের পরিচয় একটা জটিল জায়গায় পৌঁছেছে।

সুমন রহমান : কগনিটিভ ক্যাটাগরিগুলো পরিবর্তন হয়ে গেছে সম্পূর্ণ।

শাহাদুজ্জামান : আমরা একধরনের অস্তিত্বের নাজুকতার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। বিশ্বায়নের প্রভাব, আমাদের পরিচিতির সংকট এর ভেতর নানা স্তর আছে। এই অবস্থাটা ধরবার জন্য সাহিত্য সবচেয়ে ভালো অবস্থানে আছে। আমাদের বাস্তবতার যে জটিলতা, বহুমাত্রিকতা তাকে ধরা সাহিত্যের কাজ। কিন্তু লক্ষ্যটা হওয়া দরকার থিংক গ্লোবালি, এ্যাকট লোকালি। স্থানীয় বাস্তবতা নিয়ে কাজ করলেও চোখের সামনে বিশ্বের বড় ছবিটা থাকা দরকার। আবার আমাদের প্রতিদিনের জীবন যে ভাবে বদলাচ্ছে সেদিকে নজর রাখা দরকার। বাংলাদেশে তো সমাজের পাড় ভাঙছে, ভাষার পাড় ভাঙছে নিয়মিত। সেদিকে চোখ রাখাটা জরুরি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
সুমন রহমান : নিশ্চয়ই। নিজের পাঠক, শ্রোতাকে শুধু আমার রান্নাঘরের গল্পটাই বলব তা না, তার কাছে সব ধরনের গল্পই বলা যায়। এবং গল্প বলা মানে কাহিনি বলা না। এই জায়গাটা তৈরি করতে পারা।

শাহাদুজ্জামান : ঠিক তাই। গল্পের কাহিনির পাশাপাশি গল্পের ভাষা নিয়েও ভাবার আছে। কিন্তু আলাপটা ইতোমধ্যেই লম্বা হয়ে গেছে। সে আলাপ আরেক দিনের জন্য তোলা থাক। তাহলে আজ এখানেই শেষ করি।

সুমন রহমান : হ্যাঁ। আজকে শেষ করা যাক।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কথা-পাঁচ

[এ কথোপকথন হয়েছে মাসউদুল হকের সঙ্গে। মাসউদুল হক গল্পকার এবং ঔপন্যাসিক। এই কথোপকথনের অংশবিশেষ প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ২০১৭। আমার সাহিত্য চর্চার প্রস্তুতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ের বাঁক, ভাবনা, লেখার প্রক্রিয়া, ব্যক্তিজীবনের নানা প্রসঙ্গ নিয়ে বিস্তারিত আলাপ হয়েছে এই কথোপকথনে।]

মাসউদুল হক : এবছর কথাসাহিত্যে বাংলা একাডেমি পুরস্কার পেলেন আপনি। এ পুরস্কার প্রাপ্তিতে আপনার প্রতিক্রিয়া জানতে চাই।

শাহাদুজ্জামান : যে কাজটা শ্রম এবং ভালোবাসা দিয়ে নিরন্তর করি তার জন্য বাংলা একাডেমি যে আমাকে পুরস্কৃত করেছে আমি তাতে আনন্দিত। আমার লেখাকে সম্মানিত করার মাধ্যমে আমার পাঠক পাঠিকারাও সম্মানিত হলেন।

মাসউদুল হক : আপনার লোখালেখির শুরুর সময়টা কবে বলে মনে করেন?

শাহাদুজ্জামান : আমি লিটল ম্যাগাজিনে লেখা শুরু করি ১৯৮৩/৮৪ দিকে। মূলত অনুবাদ, প্রবন্ধ এসব লিখেছি। পরে গল্প লেখা শুরু করি মূলত নব্বই দশকের গোড়ার দিকে। আমার প্রথম গল্পের বই বের হলো ১৯৯৬ তে।

মাসউদুল হক : প্রায় তিন দশক ধরে লেখালেখি করছেন। এসময় দাঁড়িয়ে আপনার লেখালেখির এই যাত্রাকে কীভাবে দেখেন?

শাহাদুজ্জামান : সাহিত্যের একটা ঘোর লেগেছিল বলা যায় কৈশরেই। আমার বাবা মা দুজনেই সাহিত্য অনুরাগী। পারিবারিক লাইব্রেরি ছিল আমাদের। নানারকম বই পত্রের ভেতরই বড় হয়েছি। সেই ছেলে বেলাতেই দেখেছি সাহিত্যের ভেতর দিয়ে জীবনের দিকে তাকালে জীবনটা রহস্যময়, মায়াবী হয়ে ওঠে। সাহিত্য আমাকে জীবনের ব্যাপারে আরো কৌতূহলী করেছে। লেখালেখি

~ www.amarboi.com ~

করব এমন কোনো ভাবনা ছিল না। আধা সামরিক বিদ্যালয় ক্যাডেট কলেজে পড়েছি, পরবর্তীকালে ডাক্তারি পড়েছি, ডাক্তার হিসেবে গ্রামে গঞ্জে ঘুরেছি, বিদেশের বিশ্ববিদালয়ে পিএইচডি করতে গেছি কিন্তু সাহিত্যের ঘোর আমাকে ছাড়েনি। বাস্তবতা আর কল্পনার ভেতর ছোটাছুটি করেছি। কপালকুণ্ডলার সেই প্রশ্ন 'পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছ?' আমার কানে বেজেছে। পথ হারিয়েছি অনেকবার, সাহিত্য আমাকে পথ দেখিয়েছে। জীবনযাপন করতে গিয়ে যে প্রশ্ন, কৌতূহল, দ্বিধার ভেতর দিয়ে গেছি সেগুলো মোকাবেলা করতেই একসময় শুরু করেছি লেখালেখি। লেখালেখির ভেতর দিয়ে দ্বিতীয় জীবন তৈরি করে বাস্তবতা আর কল্পনার ভেতর একটা সেতুবন্ধন তৈরি করার চেষ্টা করেছি। তিন দশক ধরে নানা বিষয়ে অবিরাম লিখে আমি আসলে নিজে যে জীবনটা যাপন করছি তাকে বুঝে উঠবার চেষ্টা করছি। খানিকটা বিস্ময়ের সাথেই একসময় আবিষ্কার করেছি আমার এই ব্যক্তিগত অভিযাত্রায় সঙ্গী হয়েছেন অনেক পাঠক পাঠিকা। তারা আগ্রহের সঙ্গে আমার লেখা পড়ছেন, সে লেখাকে তাদের জীবনের জন্যও প্রয়োজনীয় মনে করছেন। আমার জন্য তা অনুপ্রেরণার।

মাসউদুল হক : আপনি যে সময় সাহিত্য রচনা শুরু করেন তখন সাহিত্যের বিষয় হিসেবে গ্রামীণ সমাজ ধীরে ধীরে গুরুত্ব হারাতে শুরু করেছে। নতুন যারা কাজ শুরু করেছেন তাদের সাহিত্য রচনায় মূল উপজীব্য বিষয় হিসেবে মধ্যবিত্ত সমাজ বা তার সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনা–এইসব নিয়ে কাজ করা শুরু হয়েছে। তেমন একটি প্রেক্ষাপটে আপনি কিন্তু একেবারে একটা ভিন্ন ধারায় লেখা শুরু করলেন। এটা কি সচেতনভাবে এড়িয়ে গেলেন নাকি আপনার কাছে মনে হয়েছে, নতুন কিছু লিখব?

শাহাদুজ্জামান : সাহিত্যে গ্রামীণ সমাজের গুরুত্ব সেভাবে কখনই কিন্তু আসলে হারায়নি। তবে আমি কেন এই বিশেষ ধারার লেখা লিখতে শুরু করলাম সেটার উত্তর দিতে গেলে আমার লেখালেখির সামগ্রিক প্রেক্ষাপট তোমাকে বিবেচনা করতে হবে। যেটা বললাম যে আমি লেখা শুরু করেছিলাম অনুবাদ দিয়ে। ইন্টেলেকচুয়াল সব বিষয় অনুবাদ করতাম তখন। মূলত মার্ক্সিস্ট নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে। লেখক হবার জন্য এসব লেখা তখন অনুবাদ করিনি। আমি তখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র। আমার তখন একাধারে রাজনীতি আর সাহিত্য উভয় ব্যাপারেই সমান আগ্রহ। এদুটার মধ্যে কী সম্পর্ক সেটা বোঝার জন্য নানারকম ইংরেজি লেখাপত্র পড়তাম। একসময় মনে হলো এগুলো অনুবাদ করে অন্যদের সাথে শেয়ার করা দরকার। এটা বিশেষভাবে মনে হলো কারণ আমি তখন বামপন্থী একদল তরুণ রাজনৈতিক কর্মীর সাথে ঘোরাঘুরি করতাম। দেখতাম তাদের মিটিং মিছিলে যত আগ্রহ তাত্ত্বিক ব্যাপারে তত আগ্রহ নাই কিন্তু তারা

~ www.amarboi.com ~

রাজনীতি শিল্প নিয়ে নানা কথাবার্তা বলত। তাদের সাথে তর্ক বিতর্ক করতে গিয়েই আমি এইসব লেখাপত্র পড়তে শুরু করি এবং মনে হয় অনুবাদ করলে এসব বিষয়ে আন্তর্জাতিক কী সব চিন্তাভাবনা হচ্ছে সেটা হয়তো অনেকের জানার সুযোগ হবে। সুতরাং ঠিক লেখক হবার মোটিভেশন থেকে না, একেবারে ভিন্ন একটা মোটিভেশন থেকে লিখতে শুরু করা। অবশ্য একপর্যায়ে টের পেলাম সক্রিয় রাজনীতি আমার কাজের জায়গা না। আমি শিল্প সাহিত্যের নানা মিডিয়ার ব্যাপারে খুব কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। আমি আশির দশকে ফিল্ম, নাটক, পেইন্টিং, মিউজিক এসব মিডিয়ার সাথে খুবই সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলাম। তো গল্প যখন লিখতে শুরু করেছি তাতে অন্য সব শিল্প মাধ্যমের সাথে আমার যে যোগাযোগ, রাজনীতির সাথে যে যোগাযোগ তার একটা প্রভাব পড়েছে। নানা মিডিয়ায় এক্সপেরিমেন্টাল যেসব কাজ হয়েছে সেগুলো আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। আমার লেখার নিরীক্ষাধর্মিতার সাথে এইসব অভিজ্ঞতার একটা সম্পর্ক আছে।

মাসউদুল হক : তাহলে কি আমরা ধরে নিব আপনার প্রস্তুতিপর্ব বা আত্ম-নির্মাণকাল গত-শতকের আশির দশক?

শাহাদুজ্জামান : আশির দশকের মাঝামাঝি আমি লিখতে শুরু করি কিন্তু প্রস্তুতিপর্ব ঠিক কখন শুরু হয় সেটা তো এমন সরাসরি বলা যাবে না। আর আমার ক্ষেত্রে তো বলেছি যে লেখক হব এটা ভেবে কোনো সচেতন প্রস্তুতি ছিল না। আমার পরিবারের ভেতর সাহিত্য, গান বাজনা ইত্যাদির চর্চা ছিল। ফলে শুরুটা সেখান থেকে। আমি ক্যাডেট কলেজে পড়েছি, সেটা রেজিমেন্টেড লাইফ তুমি জানো কিন্তু সেখানে দু-একজন শিক্ষক, বন্ধু এদের সূত্র ধরে সাহিত্যের আগ্রহটা জিইয়ে থেকেছে। তবে ক্যাডেট কলেজ থেকে বেরিয়ে মুক্ত জীবনে এসে বলা যায় প্রথম শিল্পসাহিত্য নিয়ে মশগুল হওয়ার সুযোগ আসল। আমি মেডিকেলে পড়লেও দেখলাম আমার মন পড়ে থাকে গান বাজনা, সাহিত্য, নাটক, ফিল্ম এগুলোর দিকে। চিটাগাং এ থাকতে কলেজের অনুষ্ঠানে গান বাজনা, আবৃত্তি ইত্যাদিতে নিয়মিত অংশ নিতাম। চিটাগাং রেডিওতে গান করতাম, চিটাগাং ফিল্ম সোসাইটির জেনারেল সেক্রেটারি ছিলাম, এছাড়া অঙ্গন গ্রুপ থিয়েটারের সাথেও যুক্ত ছিলাম, যুক্ত ছিলাম 'সময়' পেইন্টারস গ্রুপের সাথে। মোটকথা শিল্পসাহিত্যের সবগুলো মিডিয়ার সাথে একটা সক্রিয় যোগাযোগ আমার ছিল তখন। আর্ট, কালচারের জগতের একধরনের ঘোর তৈরি হয়েছে তখন বলতে পারো। নানারকম বইপত্র পড়তাম, প্রচুর ফিল্ম দেখতাম। চিটাগাং আঁলিয়স ফ্রসেস তখন প্রতি সপ্তাহে ফিল্ম দেখাত, চিটাগাংএ যখন থেকেছি আমি কোনো সপ্তাহ মিস দিয়েছি বলে মনে পড়ে না। তারপর তখন ভিসিআর এল।

~ www.amarboi.com ~

কত রকম কসরত করে তখন ভারতীয় মাস্টারদের ছবি দেখতাম। আমি নাটকেরও নিয়মিত দর্শক ছিলাম। চিটাগাং থেকে গিয়ে ঢাকাতে নাটক দেখতাম। আশির দশকে এমন কোনো প্রধান মঞ্চ নাটক সম্ভবত নাই যেটা আমি দেখিনি। যাহোক আমি একসময় ফিল্ম মেকিং এও জড়িত হয়ে পড়েছিলাম। ঢাকায় তখন ফিল্ম এপ্রিসিয়েশন কোর্স শুরু হলো, সেটা করলাম। তারেক মাসুদ একই ব্যাচে কোর্সটা করেছিল, আমরা একসঙ্গে কিছু কাজও করেছিলাম শুরুতে। যাহোক, সেসব অন্য কাহিনি। আরেকটা লেখায় আমি সেসময়টা নিয়ে লিখেছি। এসব কথা বলছি কারণ আমার প্রস্তুতিপর্বের কথা যদি বলো তাহলে আমার লেখালেখি শুরুর আগের এইসব কর্মকাণ্ডগুলোকে স্মরণ করতে হয়। আমি এসময় বিশেষ করে রাজনীতি আর শিল্পসাহিত্যের সম্পর্ক নিয়ে খুব আগ্রহী হয়ে উঠেছিলাম। আগেই বলেছি এসব নিয়ে লিটল ম্যাগাজিনে লিখতে শুরু করলাম। মূলত অনুবাদ। বলতে পারো বিখ্যাত সব লেখকদের লেখা অনুবাদ করে আসলে তাদের আড়ালে গিয়ে নিজের ভেতরের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজেছি। এরপর ধরো শিল্প সাহিত্য যারা সৃষ্টি করে তাদের ক্রিয়েটিভ প্রসেসটার ব্যাপারে আমার আগ্রহ তৈরি হলো। সেই সূত্র ধরে কিছু ক্রিয়েটভ মানুষের ইন্টারভিউ করি। আমি আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, হাসান আজিজুল হক, এস এম সুলতান এদের ইন্টারভিউ করেছি। সেগুলো আমার কথা পরম্পরা বইটাতে আছে। কিন্তু একটা পর্যায়ে এসে অনুভব করলাম আমার যে নিজের অভিজ্ঞতাগুলো হচ্ছে, নিজে যে নানারকম দ্বন্দ্ব, সংশয়, প্রেম, দ্বিধা এই সব ঘটনার ভিতর দিয়ে যাচ্ছি এই অনুবাদের ভিতর দিয়ে বা অন্যের সাক্ষাৎকারের ভেতরও প্রকাশ করা যাবে না। আমার নিজের কথাগুলো বলার একটা জায়গা তৈরির জন্য আমি প্রথম গল্প লিখি। সে গল্পটার নাম, 'অগল্প'। তুমি পড়েছ নিশ্চয়ই। লক্ষ করেছ যে ওটা আসলে ঠিক প্রচলিত ন্যারেটিভের গল্প না। বরং বলা যায় এ্যান্টি ন্যারেটিভ গল্প। একটা গল্প বলে সেটাকে আবার ভেঙে দেয়া। এ ব্যাপারে আসলে আমি প্রভাবিত হয়েছি বলতে পারো নাটকের ব্রেখট দিয়ে, ফিল্মের গদার দিয়ে। এই গল্পটা যখন লিখছি তখন এদের কাজ খুব দেখছি। তাছাড়া শুরু থেকেই আমার এ্যাক্সিপেরিমেন্টাল শিল্পসাহিত্যের প্রতি আগ্রহ ছিল। এমনকি গানের ক্ষেত্রেও আমি সেই আশির দশকের গোড়াতেই মহিনের ঘোড়াগুলি ব্যান্ডের ভক্ত হয়ে উঠেছিলাম। তারা এখন আলোচিত হচ্ছে কিন্তু বাংলা গানে ঐ ধরনের এক্সপেরিমেন্টের তারাই পাইওনিয়ার। তো এভাবেই নানা মাধ্যমের এক্সপেরিমেন্টের প্রভাব আমার উপর পড়েছে যার ফলে আমার গল্পগুলো অমন হয়েছে। আমি এরকম গল্প লিখব এমন সচেতন কোনো পরিকল্পনা ছিল না। এই যে নানা শিল্প মাধ্যমের ভেতর চলাফেরা করেছি সেটা আমার আত্ম নির্মাণে ভূমিকা রেখেছে মনে করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মাসউদুল হক : সচেতনভাবে না হলেও অবচেতনভাবে এই প্রস্তুতিপর্ব আপনার লেখায় হয়তো প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জিং বিষয় হচ্ছে যে, আপনি যে ফরম্যাটে এ কথা বলতে চাইছেন সেটা আসলে শেষ পর্যন্ত পাঠকের কাছে পৌঁছুবে কি, সেটা কি আপনার ভাবনার বিষয় ছিল না?

শাহাদুজ্জামান : পাঠক প্রিয় হওয়া, জনপ্রিয় হওয়া এসব আমার ভাবনার মধ্যে একেবারে কখনোই ছিল না। আমি বরং পাঠক প্রিয় না কিন্তু মেধাবী, যারা আমার পাঠের অভ্যাসকে আঘাত করে এমন লেখকদের ব্যাপারে আগ্রহ হয়েছি। যেমন কমলকুমার মজুমদার একসময় আমাকে আকর্ষণ করেছিল। তিনি নিজের জন্য একধরনের সান্ধ্য ভাষা তৈরি করে নিয়েছিলেন। আমি নিজে কোনদিন এধরনের ভাষায় লিখব সেটা কোনদিন চিন্তা করিনি কিন্তু তার সাহসটাকে এনজয় করতাম। তিনি একবার বলেছেন ভাষাকে যে আঘাত করে সে ভাষাকে বাঁচায়। আসলে জনপ্রিয় হওয়া, পাঠক প্রিয় হওয়া এসবের চাইতেও লেখার পুরো প্রক্রিয়াটা, জগৎটা অনেক বড় ব্যাপার, ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। আবার আমি জনপ্রিয় ধারায় লিখি না সেটা প্রমাণ করতে জোর জবরদস্তি করে ভাষার ইঞ্জিনিয়ারিং করে লেখাকে দুর্বোধ্য করে এক ধরনের ইন্টেলেকচুয়ালপনা করার প্রবণতাও আছে। আমি সেটার ব্যাপারেও সতর্ক থেকেছি। জনপ্রিয়তা কোনো দোষের ব্যাপার না। একাধারে মেধাবী এবং জনপ্রিয় এমন লেখক পৃথিবীতে আছে। আসলে নিজের কথাটা সৎভাবে, সত্যিকারভাবে বলতে যে ভাষা, যে আঙ্গিক দরকার সেটা ব্যবহার করলে সেটা পাঠকের কাছে কোনো না কোনভাবে পৌঁছায় আমি সেটাই বিশ্বাস করি। যখন লিখতে শুরু করেছি তখন এ লেখা কয়জন পড়বে সেটা ভাবিনি। মনে হয়েছে এটা লেখা দরকার তাই লিখেছি। আগেই বলেছি আমি বহুদিন শুধু লিটল ম্যাগাজিনে লিখেছি। বড় পত্রিকায় লিখিনি। তখন তো পত্রিকা অফিসে গিয়ে সম্পাদকের সাথে দেখা করা, নানা রকম সাহিত্যিক গোষ্ঠী করা এসব খুব ছিল, এখনও আছে। সাহিত্য জগতে নানা গুরু শিষ্যের ব্যাপার থাকে, ওগুলোর মধ্যে আমি ছিলাম না কখনো। লেখা ছিল আমার একেবারে নিজের সঙ্গে নিজের মোকাবেলার একটা জায়গা। বড় পত্রিকায় আমি একসময় যখন লেখা পাঠাই সেটাও পাঠিয়েছি পোস্ট করে। পত্রিকার কাউকেই চিনতাম না। আমার প্রথম দিকের গল্পগুলো ছাপা হয়েছে সংবাদে, ভোরের কাগজে, সাহিত্যপত্রে। এইসব পত্রিকার সম্পাদক কাউকে তখন চিনতাম না। আমার লেখা ছাপানোর অনেক পরে তাদের সাথে পরিচয় হয়। যেটা বলতে চাচ্ছি যে লেখক হিসেবে বহু লোকের কাছে পরিচিত হওয়া, নাম ডাক হওয়া এসবের ইন্সপিরিশনে আসলে আমি লিখিনি। আমি স্কুল, কলেজের ম্যাগাজিন এসবে কখনো লিখিনি। আমার একেবারে প্রথম লেখা ছাপা হবার কথাটা বলি। আমি তখন চিটাগাং মেডিকেলের ফাস্ট ইয়ারের ছাত্র, কিন্তু গান, নাটক, ফিল্ম এসব নিয়ে থাকি।

~ www.amarboi.com ~

সেখানে আমার এক সিনিয়ার বন্ধু আছেন মিলন চৌধুরী, নাটকের মানুষ। তার এক ধনবান ব্যবসায়ী সাহিত্যপ্রেমিক বন্ধু ছিলেন, উনি তাকে বললেন একটা লিটল ম্যাগাজিন ফাইন্যান্স করতে। আর আমাকে বললেন, আপনি তো নানা বিষয়ে অনেক পড়াশোনা করেন, এসব নিয়ে লেখেন। তো তার চাপাচাপিতেই আমি প্রথম অনুবাদ করতে শুরু করি। সেটা ছাপা হয় 'চর্যা' নামের সেই লিটন ম্যাগাজিনে। বেশ কয়েকটা সংখ্যা বেরিয়েছিল সেই পত্রিকাটার, সেখানে নিয়মিত লিখেছি। পরে 'প্রসঙ্গ' নামে আমরা কজন মিলে নিজেরাই নতুন ধরনে মাল্টিডিসিপ্লিনারি একটা পত্রিকা করি। সেসময় এধরনের পত্রিকা ছিল না যেখানে সাহিত্য, ফিল্ম, নাটক, পেইন্টিং এসবের একটা তুলনামূলক আলোচনা হতো। 'প্রসঙ্গ' সেই দিক থেকে ছিল ব্যতিক্রমী একটা পত্রিকা। আমি অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে লিখিনি। নিজের উপর বিশ্বাস রেখেছি। গৌতম বুদ্ধের সেই কথাটা যে নিজে নিজের প্রদীপ হও, আমার পছন্দের কথা। এটা আমার বিশ্বাস যে, কেউ যদি নিজের প্রতি সৎ থাকে তবে সেই সততা কোথাও না কোথাও গিয়ে স্পর্শ করে। তুমি জানতে চাইলে লেখা পাঠকের কাছে পৌঁছাবে কিনা, সেটা আমার কাছে কোনো চ্যালেঞ্জ ছিল কিনা। না আমি এটা নিয়ে বিশেষ চিন্তিত ছিলাম না। শুরু থেকেই আমার এমন একটা ভাবনা ছিল যে পাঠকের রুচিকে শুধু ফলো করলে হবে না, গাইডও করতে হবে।

মাসউদুল হক : আপনার মধ্যে কিন্তু কবি-সত্তা প্রবল। 'কাঁঠালপাতা ও একটি মাটির ঢেলার গল্প' এই গল্পের লাইনগুলি যদি একটার পর একটা সাজানো যায় তবে ভালো একটা কবিতা পেয়ে যাই। আপনি কি কবিতা লিখতেন বা লিখেন?

শাহাদুজ্জামান : না কবিতা আমি সেভাবে লিখিনি কখনো। হ্যাঁ, ক্লাস নাইন টেন থাকতে একটু চেষ্টা করেছিলাম, তারপর আর কখনো লিখিনি। কিন্তু কবিতার আমি একেবারে পেটুক পাঠক। বাংলা সাহিত্যের মোটামুটি সব ধারার কবিতা আমি পড়ার চেষ্টা করেছি। এখনও নিয়মিত কবিতা পড়ি। এই গল্পটা আসলে একটা কবিতা দিয়ে অনুপ্রাণিত হয়েই লেখা।

মাসউদুল হক : এই জন্য আমি বলছি যে, আমি খুব ক্রিটিক্যালি আপনার লেখার যে পরিবর্তনগুলো তা নব্বইয়ের দশকের প্রথম থেকে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করিতেছি। যেহেতু আমি সাহিত্যের বাইরের লোক।

শাহাদুজ্জামান : তুমিতো সাহিত্যেরই লোক, বাইরের বলছ কেন?

মাসউদুল হক : আচ্ছা ইংরেজিতেও তো আপনার একটা বই বেরিয়েছে ইউপিএল থেকে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শাহাদুজ্জামান : হ্যাঁ, সোনিয়া আমিন আমার কয়েকটা সিলেক্টেড গল্প অনুবাদ করছেন যেটা ইউপিএল থেকে বের হয়েছে, 'ইব্রাহিম বক্সের সার্কাস অ্যান্ড আদার স্টোরিজ' নামে।

মাসউদুল হক : আমার একটা অবজারভেশন হচ্ছে, রোমান্টিকতা মানুষের জীবনে সবসময় এগজিস্ট করে। তরুণ বয়সে আরো বেশি এগজিস্ট করে। কিন্তু বর্তমানের কথা বাদ দিলাম, আপনি যৌবনে যে লেখাগুলো লিখছেন সেগুলোতেও সে-ই অর্থে রোমান্টিকতার এগজিস্টেন্স কম। আপনাকে তরুণ বয়স থেকেই চরম বাস্তববাদী বা ম্যানটালি খুব ম্যাচিউরড মনে হয়েছে। সমবয়সীদের সাথে কি ছোট বেলা থেকে আপনার একধরনের কমিউনিকেশন গ্যাপ ছিল?

শাহাদুজ্জামান : রোমান্টিকতা বলতে তুমি সম্ভবত প্রেমের ব্যাপার বোঝাচ্ছ। তথাকথিত প্রেমের গল্প আমি লিখিনি সেটা ঠিক। তবে আমার 'আন্না কারেনিনার জনৈকা পাঠিকা' কিম্বা 'জোৎস্নালোকে সংবাদ' এগুলো তো গভীর অর্থে প্রেমের গল্প, রোমান্টিক গল্প। তবে হ্যাঁ প্রেম বিষয়ে লেখালেখি করার ব্যাপারে একটু সতর্ক থেকেছি। সতর্ক না হলে এসব বিষয়ে লেখা খুব সেন্টিমেন্টাল ধাঁচের হয়ে উঠে। তাছাড়া তারুণ্যে দেখতাম, যারা নতুন লিখতে চাচ্ছে তাদের অধিকাংশের লেখার বিষয় প্রেম। এসব আমার কাছে খুব ছেলেমানুষী মনে হতো, ফলে খানিকটা সচেতনভাবেই ঐ প্রসঙ্গটাকে এড়িয়ে গেছি। এটা ঠিক যে এক বয়সে যখন আমার অনেক বন্ধুদের ধ্যান, জ্ঞান, সাধনা হচ্ছে প্রেমে পড়া আমি তখন রাজনীতি, দর্শন, সাহিত্য এসব নিয়ে ব্যস্ত, ফলে সমসাময়িকদের সাথে আমার একটা কমিউনিকেশন গ্যাপ ছিল কথাটা সত্যি। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সংখ্যা খুবই কম। আমি চরম বাস্তববাদী তা ঠিক না, আমি খুবই আবেগ প্রবণ, আমি প্রেমও করেছি কিন্তু বলতে পারো আবেগের চাইতে মনন আমাকে গাইড করে বেশি।

মাসউদুল হক : আপনি যে কোনো জিনিস যখন দেখেন তখন আসলে শুধু ঐ ঘটনাটাই দেখেন না একটা বড় পারসপেকটিভ নিয়ে দেখেন। ধরুন যে, কাঁঠালপাতা ও মাটির ঢেলা গল্পে আপনি কিন্তু রূপবান এর কাহিনিকে ব্যবহার করতে যেয়ে শুধু রূপবানকে দেখছেন না সাথে শ্বাপদ সংকুল অরণ্যে এক শিশু কোলে নিয়ে পুরাণ কথার এক বালিকা যে একটা বনের মধ্যে হেঁটে যাচ্ছে–তার ভীত-সন্ত্রস্ত মুখচ্ছবিও অনুভব করছেন। এ ধরনের প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আপনি ফিল্ম তৈরি করতে পারতেন। কিন্তু সে জায়গায়ও পরে আর কাজ কনেননি।

শাহাদুজ্জামান : আমার ভাবনা, প্রস্তুতি এগুলোর ভেতর এতটা মাল্টিডিসিপ্লিনারি ব্যাপার আছে। আমার একটা বইয়ে আমি বলেছি যে আলবেরুনীর একটা কথা আমার পছন্দ, উনি বলেছিলেন আমি দীর্ঘ জীবন চাই

~ www.amarboi.com ~

না, বিস্তৃত জীবন চাই। এই বিস্তৃত জীবনের লোভেই আমি নানা ডিসিপ্লিনে চলাচল করেছি, বিভিন্ন আর্ট মিডিয়া, দর্শন, রাজনীতি ইত্যাদি আমাকে আকর্ষণ করেছে। লোক সাহিত্য আমার ব্যাপক আগ্রহের বিষয়, ফলে যখন লিখি তখন এইসব নানা ডিসিপ্লিনের ভাবনাকে লিঙ্ক করার চেষ্টা করি। কাঁঠাল পাতার গল্পটা ছাড়াও আমার অনেক গল্পেও এমন নানা ভাবনার কানেকটিভি তুমি দেখতে পাবে। ফিল্মে কাজ করার ক্ষেত্রে এধরনের দৃষ্টিভঙ্গির একটা বাড়তি সুবিধা হয়তো হতো। তোমাকে আগেই বলেছি ফিল্মে কাজ করার ব্যাপারটাকে আমি একসময় খুব সিরিয়াসলি নিয়েছিলাম। ফিল্ম আর্কাইভে কোর্স করেছিলাম, ১৬ মিলিমিটারে একটা শর্ট ফিল্মের শুটিংও করেছিলাম, এমনকি একসময় মস্কো ফিল্ম ইন্সটিউটে ভর্তি হবার সব ব্যবস্থা করে ফেলেছিলাম। তবে ফিল্মে ক্যারিয়ার করার জন্য বাংলাদেশের যে ধরনের চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হতে হয় সেটা আমার পক্ষে মোকাবেলা করা সম্ভব হবে না টের পেয়েছি, ফলে ফিল্মি অভিযাত্রা বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। তবে ফিল্ম নিয়ে বরাবার লেখাপত্র করেছি, এনিয়ে আমার বইও আছে 'চলচ্চিত্র, বায়োস্কোপ প্রভৃতি' নামে।

মাসউদুল হক : আপনার বাবা উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। আপনি ৭০-এর দশকে ক্যাডেট কলেজের মতো জায়গায় পড়াশোনা করেছেন। পরে পড়াশোনা করেছেন মেডিক্যাল কলেজ-এ। আপনি আজন্ম শহরে ছিলেন। গ্রামে হয়তো গিয়েছেন তবে তা বেড়ানোর উদ্দেশ্যে। সে অর্থে কি আপনাকে আরবান লেখক বলা যায় না?

শাহাদুজ্জামান : ঠিক গ্রামে আমি বড় হয়নি কিন্তু সেই অর্থে বড় কোনো শহরেও বড় হইনি। আমার বাবা ছিলেন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, তার বদলির চাকরি ছিল দেশের নানা পাওয়ার স্টেশনে। সেসব পাওয়ার স্টেশনগুলো তো ছিল বলতে গেলে প্রত্যন্ত এলাকায়। আমার শৈশব কৈশরের একটা বড় সময় কেটেছে সিলেটের শাহজিবাজার নামের একটা জায়গায় যেখানে একটা গ্যাস পাওয়ার স্টেশন আছে। ওটা তো রীতিমত জলা জঙ্গলার একটা জায়গা, ওখানে গ্যাস আবিষ্কার হওয়াতে সেখানে পাওয়ার স্টেশনটা হয়েছিল। ওখানে ছিল একটা প্রাচীন মাজার আর একটা ছোট গ্রাম। এই সময়ের স্মৃতি নিয়ে আমার একটা গল্প আছে 'মাজার, টেবিল টেনিস, আসলি মোরগ' নামে। এছাড়া কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা, ঢাকার কাছে সিদ্ধিরগঞ্জ, খুলনার খালিশপুর এসব জায়গার পাওয়ার স্টেশনের ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন আমার বাবা, সেসব জায়গায় থেকেছি আমি। তবে সেসব জায়গায় থাকলেও এইসব ছোট ছোট শহরের মূল জীবনযাত্রার সাথে আমাদের যোগাযোগ ছিল না। আমরা থাকতাম ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকায় সরকারি কোয়ার্টারে, নানা সরকারি সুযোগ সুবিধার ভেতর। ইঞ্জিনিয়ারদের নিজস্ব

~ www.amarboi.com ~

একটা জগৎ ছিল যেটা স্থানীয় জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, একটা এলিট জীবন বলা যায়। এরপর আমি তো ক্যাডেট কলেজে চলে গেলাম, সেটাও একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির জীবন। ফলে আমি ঠিক শহরে বড় হয়নি বরং বলা যায় গ্রামে বা মফস্বলে থেকেও এক ধরনের আরবান লাইফ স্টাইলে বড় হয়েছি। তবে আমি সত্যিকার অর্থে গ্রামে যাই পড়াশোনা শেষে ব্র্যাকের স্বাস্থ্য প্রকল্পের ডাক্তার হিসেবে । আমি বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার প্রত্যন্ত গ্রামে কাজের সূত্রে থেকেছি। এটা গ্রামে বেড়াতে যাওয়া না, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস থাকা। সেটা আমার জন্য ছিল অসাধারণ অভিজ্ঞতা। গ্রামে থাকার সেই অভিজ্ঞতা আমার জীবনকে দেখার চোখ বদলে দিয়েছে। মধ্যবিত্ত জীবনের গণ্ডি, বইপত্র আর অক্ষরকেন্দ্রিক জীবনের গণ্ডি পেরিয়ে একটা নতুন জগতের অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার। গ্রামের অভিজ্ঞতা আমার লেখার উপরও অনেক প্রভাব ফেলেছে। গ্রাম জীবনের সংগ্রাম আর ঐশ্বর্য খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। আমাদের গ্রামগুলো তো একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে প্রতিদিন। তারপরও লোক সংস্কৃতির নানা মাত্রার সাথে সরাসরি পরিচয় হয়েছে আমার তখন। রাত জেগে পালা শুনেছি, যাত্রা দেখেছি। আমার খুব পছন্দের কাজ ছিল হাটের দিনে নানা ঔষধের ক্যানভাসারদের বক্তৃতা শোনা। আমি তাদের গল্প বলার ক্ষমতায় মুগ্ধ থাকতাম। এসব অভিজ্ঞতা আমার লেখাকেও প্রভাবিত করেছে। ফলে আমাকে ঠিক আরবান লেখক কেন বলা হবে জানি না।

মাসউদুল হক : আপনি কি কোনো ডায়েরি বা নোটবুক ব্যবহার করেন?

শাহাদুজ্জামান : হ্যাঁ। আমার নোটবুক থাকে যেখানে আমি নানা কথা, ভাবনা লিখে রাখি।

মাসউদুল হক : এটা কি স্বাভাবিক আগ্রহ বা অভ্যাস থেকে নাকি–কখনো গল্প লেখার ক্ষেত্রে কাজে লাগবে ভেবে কোনো গান, কবিতা বা বিখ্যাত কোনো লোকের উদ্ধৃতি লিখে রাখেন?

শাহাদুজ্জামান : হ্যাঁ এগুলো আমার লেখায় কাজে লাগবে সেকথা ভেবেই নোট রাখি। কোথাও কোনো একটা কথা শুনলাম বা ঘটনা দেখলাম সেটা সংক্ষেপে লিখে রাখি এবং পরে সেটাকে কোনো গল্পে বা নিবন্ধে এক্সপান্ড করি। অনেক সময় অন্যের কোনো লেখার চমৎকার কোনো অংশ লিখে রাখি। আমার নিজের কোনো লেখায় সেটা উল্লেখ করে ঐ লেখাটাকে আবার নতুন জীবন দেই। একটা ভালো সৃষ্টিকে সার্কুলেট করি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মাসউদুল হক : আমি এখন লিডিং প্রশ্নে চলে আসি। অনুবাদ সাক্ষাৎকার এই কাজগুলো কি যখন আপনার রাইটস ব্লক কাজ করে তখন বেশি করেন?

শাহাদুজ্জামান : অনুবাদ, সাক্ষাৎকার যখন শুরু করেছিলাম তখন নিজের মৌলিক লেখার কোনো তাগাদা ছিল না। পরে যখন নিজের লেখার পরিমাণ বাড়তে লাগল তখন সত্যি বলতে নিজের লেখার গ্যাপে খনিকটা দম নিতে অনুবাদ ইত্যাদি করেছি।

মাসউদুল হক : ক্যাঙ্গারু দেখার শ্রেষ্ঠ দিন–গল্প সংকলন বাংলা সাহিত্যের খুব উল্লেখযোগ্য একটি অনুবাদ গল্প সংকলন। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দেয়ার পেছনে কি আপনার মধ্যে রাইটার্স ব্লক কাজ করছিল?

শাহাদুজ্জামান : হ্যাঁ, বলতে পারো সে সময় এক ধরনের রাইটার্স ব্লক চলছিল আমার। তার কিছু আগে ক্রাচের কর্নেলের মতো গবেষণাধর্মী বড় একটা কাজ শেষ করেছি। নতুন কোনো গল্প লেখাও হয়ে উঠছিল না। কিন্তু কিছু লিখতে ইচ্ছা হচ্ছিল। তখন অনুবাদে হাত দেই।

মাসউদুল হক : আপনার আরেকটি উল্লেখযোগ্য গল্প 'মহাশূন্যে সাইকেল'। ক্যাঙ্গারু দেখার শ্রেষ্ঠ দিন–গ্রন্থটি অনুবাদের পর আপনার লেখার ধরনে পরিবর্তন এসেছে বলে আমার মনে হয়েছে। সম্ভবত 'মহাশূন্যে সাইকেল' সে-ই পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। ঐ গল্পগুলো নিয়ে পরে আপনার সাথে কথা বলব। তবে পরিবর্তনটা কি এমন যে আপনি একটা সময় হয়তো নিজের সাথে নিজে বোঝাপড়া করলেন। তারপর আবার শুরু করলেন। যেমন আমরা দেখি, আপনার প্রথম জীবনের গল্পগুলো দৈর্ঘ্য ছোট ছিল পরে দেখা যাচ্ছে যে, দৈর্ঘ্য বড় হচ্ছে। গল্পের দৈর্ঘ্যের বিষয়ে পাঠকের একটি সমালোচনা ছিল। পাঠকের এই সমালোচনাকে রেসপোন্স করছেন কি?

শাহাদুজ্জামান : এটা তোমার ভালো পর্যবেক্ষণ। আমি ক্যাঙ্গারু দেখার শ্রেষ্ঠ দিনের গল্পগুলো অনুবাদ করেছি প্রবাসে বসে, সে বছর আমি ইউকেতে গেছি নিউক্যাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি নিয়ে। আমার জীবনযাপনে একটা পরিবর্তন এসেছে। মহাশূন্যে সাইকেল গল্পটাতে দূরত্বের বোধ প্রসঙ্গটা এসেছে ঘুরে ফিরে। বলতে পারো বিদেশে যাওয়ার পর নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ার একটা নতুন মাত্রা তৈরি হয়েছে। এসবের একটা প্রভাব গল্পেও পড়েছে। সুতরাং তুমি ঠিকই বলেছ, ক্যাঙ্গারু দেখার বইটার পর আমার লেখায় এক ধরনের পরিবর্তন এসেছে। তবে গল্পের দৈর্ঘ্য যে পাঠকের সমালোচনার ভিত্তিতে বেড়েছে তা না। আমি কখনই এমন ভেবে গল্প লিখিনি যে এটা দু পৃষ্ঠা বা তিন পৃষ্ঠার গল্প হবে। আমার বলার কথাটা বলে ফেলবার জন্য যতটুকু পরিসর দরকার আমি ততটুকুই দিয়েছি। দু

~ www.amarboi.com ~

পৃষ্ঠায় আমার মূল কথাটা বলা হয়ে গেলে শুধু পৃষ্ঠা বাড়াবার জন্য সেটাকে আর দীর্ঘ করিনি। তবে তুমি যেমন বললে পরবর্তীকালে আমার বলার কথাগুলোর ধরন পাল্টেছে ফলে তার জন্য হয়তো গল্পগুলোও দীর্ঘ হয়ে গেছে।

মাসউদুল হক : অন্যান্য লেখকের সাথে আপনার পার্থক্য অনেক আছে। তবে দেখা যায়, আপনার লেখায় পরকীয়া প্রেম, যৌনতা–এই বিষয়গুলো তেমন প্রকট না। এগুলোকে আপনি সচেতনভাবেই কি এড়িয়ে যান, না লিখতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না।

শাহাদুজ্জামান : পরকীয়া প্রেম, যৌনতা এগুলো তো জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আগেই বলেছি এসব নিয়ে লিখতে সতর্ক থাকি। কারণ এসব বিষয়ের প্রচুর অপব্যবহার দেখেছি সাহিত্যে। বাজারমুখী হালকা আনন্দের বিষয় হতে দেখেছি। আমার লেখায় প্রকটভাবে এসব নিশ্চয়ই নাই কিন্তু সূক্ষ্মভাবে আছে। 'ক্যালাইডোস্কোপ' গল্পটায়, 'বিসর্গতে দুঃখ'তে পরোক্ষভাবে আছে। সেই যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটা লাইন আছে না, 'ফুলকে সরিয়ে নাও, একে দিয়ে অনেক মিথ্যা বলানো হয়।' আমার লেখায় এসব বিষয়কে একটু সরিয়ে জীবনের অন্য দিগন্তগুলোর উপর একটু বেশি জোর দিয়েছি বলতে পারো।

মাসউদুল হক : 'সেল্ফ সেন্সরশিপ' সাহিত্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। লেখক হিসেবে আপনি কোন কোন বিষয়ে সেলফ সেন্সরশিপ' আরোপ করেন?

শাহাদুজ্জামান : হ্যাঁ, 'সেল্ফ সেন্সরশিপ' একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আমি কী নিয়ে লিখব সেটা যেমন ঠিক করা দরকার তেমনি কী নিয়ে লিখব না সেটার ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার। আমি তা করি।

মাসউদুল হক : আপনার কি লেখার সময় মনে হয় না যে এটা আপনার ফ্যামিলি মেম্বার পড়বে?

শাহাদুজ্জামান : আমার ফ্যামিলি মেম্বাররা আমার লেখাপত্র পড়ে। আমার বাবা, মা সাহিত্য অনুরাগী, আমার ভাই বোনরাও, অন্যান্য আত্মীয় স্বজনরা আমার লেখা পড়ে। তাদের কথা ভেবে আমি মোটা দাগে কোনকিছু সেন্সর করি না। তবে এ কথা সত্য যে মনের গভীরতর সব কথা অকপটে এখনও বলে উঠতে পারি না, সেখানে সেল্ফ সেন্সরশিপ চলে আসে। অনেক কথা হয়তো চেপে যাই কারণ তাতে হয়তো আমার একেবারে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কগুলো এফেক্টেড হবে। আমরা কিছু কথা অন্যের সঙ্গে বলি, কিছু কথা শুধু নিজের সঙ্গে বলি আবার কিছু কথা নিজের সঙ্গে বলতেও ভয় পাই। এই তিন ধরনের কথা গল্পে আনতে পারলে তৃপ্তি পেতাম এখনও পারি না পুরোপুরি।

আমরা পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মাসউদুল হক : আমার মনে হয় যৌবন চলে যাবার পর মানুষ অনেক প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। যৌনতা, ধর্ম, পরকীয়া, অনাচার ইত্যাদি নিয়ে অনেক বেশি কথা বলতে পারে। যৌবন থাকাকালে সেন্সরশিপ বেশি মাত্রায় আরোপ হয়।

শাহাদুজ্জামান : একটু বয়স হলে যৌনতা, ধর্ম, পরকীয়া, অনাচার ইত্যাদি নিয়ে একটু থিতু হয়ে ভাবার সুযোগ হয়, সেটা ঠিক। অল্প বয়সে অনেক সময়ে উত্তেজনার বশে অনেক বেশি কথা বলা হয়ে যায়। আমার বয়সও বেড়েছে ফলে এসব ব্যাপার নিয়ে আরো গভীরভাবে ভাবার সুযোগ হচ্ছে।

মাসউদুল হক : আপনার প্রায় সব গল্পেই নায়কের সাথে নায়িকার সরাসরি উপস্থিতি নেই। ধরেন যে, গল্প বা উপন্যাসের নারী চরিত্র– সে মূল চরিত্রের স্ত্রী অথবা গল্পের মূল চরিত্রের সাথে গাড়িতে পাশে বসে থাকা কোনো এক যাত্রী। অথবা হয়তো মূল চরিত্রের সাথে নারীটির বাস স্টপেজে দেখা হচ্ছে। শুধু একটি গল্পে আমরা দেখি নিতি নামের একটি চরিত্রের সাথে আপনার সম্পর্ক আছে কিন্তু এই কথাটি আপনি উল্লেখ করেছেন ব্র্যাকেটের মধ্যে। এমনকি আমার খুব প্রিয় একটা গল্প 'জ্যোৎস্নালোকের সংবাদ' এ রিজিয়া গল্পের প্রয়োজনে একটা সাবজেক্ট। গল্পের গতিপথ নির্ধারণে তার কোনো গুরুত্ব নেই। গল্পের নারী চরিত্রের ব্যবহার খুবই কম। এটার পেছনে কি কোনো সচেতন বা অসচেতন কার্যকারণ ক্রিয়াশীল?

শাহাদুজ্জামান : এটা একটা ইন্টারেস্টিং কথা বলেছ তুমি। সত্যিই কি আমার নায়ক নায়িকার সরাসরি দেখা হয় না? আমি নিজেও তো সেটা খেয়াল করিনি। ব্যাপারটা তো আমাকেও ভেবে দেখতে হবে। তবে গল্পে গতিপথ নির্ধারণে নারী চরিত্রের ভূমিকা নাই সেটা বোধহয় ঠিক না। তুমি নিতিকে নিয়ে যে গল্পটার কথা উল্লেখ করেছ সম্ভবত চীনা অক্ষর.. গল্পটা, সেখানে ছেলেটার সব কর্মকাণ্ড তো মূলত নিতি নামের মেয়েটাকে দিয়েই নির্ধারিত। কিম্বা আন্না কারেনিনার জনৈকা পাঠিকা গল্পে সেই পাঠিকা তো গল্পের কেন্দ্রে আছে।

মাসউদুল হক : এটা ব্যক্তিগত জীবন যাপনের বিষয় নিয়ে কথা বলি। আপনার কথা সাহিত্য আমাদের ধারণা দেয় যে আপনার একটা গড গিফটেড প্রবল এবং গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তি রয়েছে। বস্তুত এই প্রবল ও গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তি, যেটা আসলে আপনাকে অন্যান্য সমকালীন লেখকদের চেয়ে আলাদা করে আলোচনার সুযোগ করে দেয়। এরকম একটা শক্তি নিয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করা কি বিব্রতকর মনে হয় না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শাহাদুজ্জামান : ভালো প্রশ্ন করেছ। এটা ঠিক যে যতক্ষণ জেগে থাকি চারদিকে জীবনটাকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকি অবিরাম। কথা সত্য যে খুব কাছের মানুষজনও যখন পর্যবেক্ষণের বিষয় হয়ে উঠে তখন অনেক সময় ব্যাপারটা বিব্রতকর, অস্বস্তিকর হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু এ থেকে তো আমার নিস্তার নাই। যখন যা দেখছি, যার সাথে কথা বলছি সেসবকে নানা মাত্রায় পর্যবেক্ষণের আওতায় রাখা আমার একেবারে স্বভাবের ভেতর ঢুকে গেছে। তাছাড়া আমি এ্যানথ্রপলজি পড়েছি, এ্যানথ্রপলজির একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে পর্যবেক্ষণ। কীভাবে সিসটেম্যাটিক অবজারভেশন করতে হয় তার ম্যাথডলজি আমি পড়েছি। ফলে এটা আমার পেশাগত কাজও বলতে পারো। এই পর্যবেক্ষণ প্রবণতা আমার লেখালেখি এবং নৃবিজ্ঞান গবেষণা দুক্ষেত্রেই কাজে লাগে।

মাসউদুল হক : কিন্তু আবার শেষ পর্যন্ত আপনি কিন্তু ভেরি মাচ অর্গানাইজড?

শাহাদুজ্জামান : আসলে আমি দুটো একেবারে প্যারালাল জীবন যাপন করি বলতে পারো। একটা আমার পেশাগত জীবন, যেটা শিক্ষকতা, গবেষণা আরেকটা আমার লেখক জীবন। দুটাই খুব ডিমান্ডিং। আমি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করি, বিশ্বস্বাস্থ্য নিয়ে গবেষণা করি, এগুলো খুবই পরিশ্রম সাধ্য, সময় সাপেক্ষ কাজ। এরপর আমি যে ধরনের লেখা লিখি সেগুলো অনেক সময় দাবি করে। এর বাইরে সংসার, স্ত্রী, পুত্র এদের নিয়েও তো নানা দায়িত্ব রয়েছে। ফলে আমাকে অর্গানাইজড হতে হয়, তা না হলে এতগুলো জীবন সামলানো অসম্ভব। আমি না লেখালেখি করলে হয়তো আরো ভালো স্বামী বা বাবা হতাম, আরো ভালো একাডেমিক হতাম। কিন্তু লেখার নেশা আমি ছাড়তে চাইনি ফলে ধীরে ধীরে এই অর্গানাইজড হওয়াটাকে রপ্ত করতে হয়েছে। আমি আমার লেখার কাজগুলো করি রাতে, প্রতি রাতেই লিখতে বসি। প্রবাসে থাকলে একটা সুবিধা অবশ্য আছে যে, যেহেতু চেনা জানা মানুষ এখানে কম ফলে সোসালাইজেশনে বেশি সময় দিতে হয় না।

মাসউদুল হক : তাহলে কি আমি বলতে পারি, আপনি বাজারে যান, মাছ কেনেন, বউয়ের রাগ ভাঙান সবই করেন কিন্তু এগুলোর মধ্যে কোনো উষ্ণতা থাকে না?

শাহাদুজ্জামান : আমি বাজার ঘাট, মাছ কেনা সবই করি, বউয়ের রাগ ভাঙাতেও চেষ্টা করি। আমার স্ত্রী পাপড়ীন নাহারের সাথে আমার ভালো সম্পর্ক। সে আমার প্রেমিকা ছিল। আমি তাকে আমার প্রথম বই উৎসর্গ করেছি। সে আমার গল্পের প্রথম পাঠক। তবে সংসারের বৈষয়িক ব্যাপারগুলো আমি খুব

~ www.amarboi.com ~
একটা সফলভাবে করতে পারি তা না। জীবনানন্দ যেমন বলেছিলেন যে 'কারুবাসনা আমাকে নষ্ট করে দিয়েছে।'

মাসউদুল হক : আচ্ছা গল্প তো গল্পই। কিন্তু আপনি একটা বই প্রকাশ করলেন যেখানে গল্পগুলোকে তিনভাবে ভাগ করলেন 'গল্প, অগল্প এবং না-গল্প' এইভাবে। এই তিন শ্রেণি বিভাজন আপনি কেন করতে গেলেন? আপনার কি নিজেরও সংশয় ছিল? কিছু কিছু গল্প কি আদৌ গল্প কি-না?

শাহাদুজ্জামান : বলতে পারো তাই। আমি সেই বইয়ের ভূমিকায় সে কথা বলেছি। আমার অনেক গল্পকেই প্রচলিত ধারার গল্প হয়তো বলা যাবে না। আমি বলেছি যে সাহিত্যের নানা শাখার ভেতরকার দেয়াল ভেঙে ফেলতে আমি পছন্দ করি। আমার গল্পের ভেতর প্রবন্ধ বা কবিতার উপাদানও আছে। আমার কোনো কোনো গল্পকে কেউ বলেছেন ডকু ফিকশন, কেউ মেটাফিকশন। আমার একটা এ্যান্টি ন্যারেটিভ গল্পের নাম 'অগল্প', যেটার কথা আগে বলেছি। তো এসব মিলিয়েই আমি আমার গল্পগুলোকে কোনো বিশেষ তকমায় ফেলতে চাইনি বলে এ ধরনের একটা নাম দিয়েছি। এ লেখাগুলোকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন আমার আপত্তি নাই।

মাসউদুল হক : আপনার গল্প উপন্যাসের নায়করা সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতি দুর্বল। মূলত আপনারও যে ঐ ব্যবস্থার প্রতি দুর্বলতা আছে সে-টা আপনি লুকান না। 'জ্যোৎস্নালোকের সংবাদ' গল্পটা উত্তম পুরুষে বর্ণনা করেছেন। গল্পের কথক গল্পের শেষে এসে তার ভাই মঞ্জু'কেই নায়ক বানায়। যে কি-না সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি দুর্বল। দেখা যাচ্ছে যে, গল্পে আপনার যে হিরো বা যারা হিরো তারা কোনো না কোনভাবে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রতি দুর্বল।

শাহাদুজ্জামান : আমি যখন লেখালেখি শুরু করি তখন রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে আমি মার্ক্সবাদের অনুসারী ছিলাম। পৃথিবী ব্যাপী যে ব্যাপক বৈষম্য সেটা নিরসনে মার্ক্সবাদী বিশ্ববীক্ষা একটা প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেয় বলেই আমি মনে করি। তবে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ভাঙনের ভেতর দিয়ে অনেক নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছে। সেসব অভিজ্ঞতার আলোকে সমাজতান্ত্রিক দর্শনকে নতুন করে ভাবার আছে। একটা সাম্যবাদী সমাজের প্রতি আমার অবশ্যই দুর্বলতা আছে। তবে সেটা কীভাবে আসবে তা নিয়ে আরো গভীরভাবে ভাবার প্রয়োজন আছে। সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে কীভাবে স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে যুক্ত করা যায় সেসব নিয়ে ভাবার আছে। নিও মার্ক্সসিজম, সাব অলটার্ন ভাবনা এক্ষেত্রে আমাদের নতুন চিন্তার খোরাক দেয়। পুরনো সোভিয়েত ধারার সমাজতন্ত্রে ফিরে যাবার সুযোগ নেই এখন আর।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মাসউদুল হক : হ্যাঁ, আপনি তো সরে আসছেন সেই ভাবনা থেকে। কারণ 'শিং মাছ, লালজেল...' গল্পের মধ্যে আপনি নিজে নিজের সাথে কথা বলছেন, বললে অত্যুক্তি হবে না। হামিদের চোখ দিয়ে দুটি সত্তার বোঝাপড়ার কথা বলছেন। আপনি নিজের সাথে বোঝাপড়া করতেছেন, এটা বুঝা যায়। কিন্তু ধরেন যে অনেক সময় তা ব্যক্তিপূজার মতো মনে হয়েছে। যেমন ধরেন, আপনার হিরো হচ্ছে কর্নেল তাহের, ফিদেল কাস্ট্রো। আপনি দেখা যাচ্ছে কর্নেল তাহের একটা আর্মি অফিসার হয়ে জিপে দাঁড়িয়ে গুলি করতে করতে বিয়ে বাড়িতে ঢুকছেন–তেমন একটা অসামরিক এবং উচ্ছৃংখল বিষয়কেও আপনি অনেক বড় করে দেখাচ্ছেন। আজকের বিশ্ব প্রেক্ষপটতো বটেই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও কেমন যেন বৈসাদৃশ্য লাগে এমন একটি ঘটনা। আজকের একজন আর্মি অফিসার গুলি করতে করতে বিয়ে বাড়িতে ঢুকবে এটি কি কেউ কল্পনাও করতে পারে? কিন্তু আপনি সেই বিষয়টাকে অনেক বড় করে দেখাচ্ছেন।

শাহাদুজ্জামান : এগুলোকে ব্যক্তি পূজা কেন বলবে জানি না। ব্যক্তি এককভাবে কিছু করে না কিন্তু কোনো কোনো ব্যক্তির ভেতর দিয়ে ইতিহাসের আকাঙ্ক্ষাগুলো পরিস্ফুট হয়ে উঠে। ফলে ইতিহাসে ব্যক্তির তো বড় ভূমিকা আছে। আমি এসব ব্যক্তিকে ঠিক ব্যক্তি হিসেবে তুলে ধরিনি বরং চেষ্টা করেছি কীভাবে এই ব্যক্তিগুলো তার দেশ কালের স্পিরিটটাকে ধারণ করেছে সেটা প্রকাশ করতে। কর্নেল তাহের ব্যক্তি হিসেবে তো ব্যর্থ কারণ তিনি যা করতে চেয়েছেন তার কিছুই করতে পারেননি কিন্তু তার স্পিরিটটাকে ধরতে চেয়েছি। তাহেরকে বুঝতে হলে তার সময়টাকে বুঝতে হবে। সেই সময়ের তারুণ্যের আকাঙ্ক্ষাগুলো কেমন সাহসের সাথে তিনি ধারণ করেছেন সেটা লক্ষ করতে হবে। বিয়ের আসরে গুলি করতে করতে ঢোকা ব্যাপারটা বিশাদৃশ্য মনে হবে নিশ্চয়ই কিন্তু এর ভেতর একটা রোমান্টিকতা, এ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়তা আছে। আজকের প্রেক্ষিতে এটাকে পাগলামি মনে হতে পারে কিন্তু সে সময়টার প্রেক্ষিতে সেটা দেখতে হবে। উনি পরবর্তীকালে যে কাজগুলো করেছেন সেগুলো তো এক অর্থে সব উচ্ছৃংখলতা। কিন্তু তোমার মনে রাখতে হবে যে কোনো বিপ্লব মাত্রই একধরনের উচ্ছৃংখলতা। আজকের পৃথিবীর যে হিসাবি, বৈষয়িক প্রজন্ম তাদের দিকে তাকিয়ে সেই প্রজন্মের মানুষগুলো একটা কোন আদর্শের জন্য যেসব বেহিসাবি কাজগুলো করেছেন সেগুলোকে আমি সহানুভূতির সাথে দেখি। তাদের জীবনকে অনেক সিগনিফিকেন্ট মনে হয়।

মাসউদুল হক : প্রসংগত্রুমে আরেকটি কথা বলি। (আমি ক্রাচের কর্নেল পড়িনি। তবে এ বইয়ের উপর আলোচনা এবং কর্নেল তাহেরের জীবন ও রাজনীতির উপর কিছুটা ধারণা আছে। সেই প্রেক্ষাটপটে জানতে চাইছি) যেহেতু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কর্নেল তাহের আর্মিতে ছিলেন। ১৮ বছর বয়সেই তিনি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। তারপর আর্মি থেকে যখন বেরিয়ে আসেন তখন তার বয়স ৩০ ছিল। ঐ দীর্ঘ ১২ বছর সময় ক্যান্টনমেন্টে থেকে একজন মানুষ কি সমাজতান্ত্রিক আদর্শে দীক্ষা নেয়ার কোনো সুযোগ পান? নাকি সবই তাঁর রোমান্টিসিজম?

শাহাদুজ্জামান : তুমি আমার ক্রাচের কর্নেল বইটা ভালোভাবে পড়লে দেখবে তাহের আর্মি তে গেলেও কখনোই বৃহত্তর জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। একটা সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক ধারাবাহিক ভাবনার ভেতরই সবসময় ছিলেন । তিনি একটা রাজনৈতিক মিশন নিয়েই আর্মিতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে থেকেই নানা রাজনৈতিক তৎপরতা করেছেন। সেনাবাহিনীতে থাকলে সমাজতন্ত্রে দীক্ষা নেবার সুযোগ নাই একথা তো ঠিক না, সেনাবাহিনী থেকে বহু বিপ্লবীই পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছেন। আর রোমান্টিক তো তিনি ছিলেনই। যে কোনো বিপ্লবী মাত্রই রোমান্টিক। যেমন বলছিলাম আজকের দুনিয়ার শুধু আত্মপ্রতিষ্ঠা আর বৈষয়িক সাফল্যের হিসাব নিকাশে ব্যস্ত চালাক প্রজন্মের চাইতে ঐ রোমন্টিক ভুল ভাল করা প্রজন্ম মানুষ হিসেবে অনেক প্রাণবন্ত আমার কাছে।

মাসউদুল হক : কর্নেল তাহেরের আচরণের মধ্য দিয়ে, সেই সময় সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে যে স্বেচ্ছাচারিতা ছিল সেটা কিন্তু প্রকাশিত। কারণ বাংলাদেশ এর সেনাবাহিনী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গর্ভে জন্ম হয়েছে। ওরা সাধারণত এইগুলো পাকিস্তানের পেশোয়ার মুলতানে ষাট বা সত্তুরের দশকে করে থাকতে পারে। আমার মনে হয় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কালচার হয়তো তার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করেছিল?

শাহাদুজ্জামান : আমার বইটা তুমি এখনও পড়নি বলে এ মন্তব্য করছো। আমার ক্রাচের কর্নেল বইটাকে একটু মনোযোগ দিয়ে পড়তে অনুরোধ করব। সেখানে দেখবে তাহেরের মিশনই ছিল বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে পাকিস্তানি এবং কলোনিয়রিয়াল সেনাবাহিনীর প্রভাবমুক্ত করে পিপলস আর্মি তৈরি করা। তার ভেতর স্বেচ্ছাচারিতার কোনো নমুনা আমি দেখিনি।

মাসউদুল হক : আপনার পারসেপশন অবশ্য গড়পরতা লোকের চেয়ে আলাদা। যেমন 'ইব্রাহিম বক্সের সার্কাস' গল্পটির কথা বলা যায়। সেখানে গ্রামের হাঁটে পাঞ্জাবি বিক্রি করছে এক লোক। ইউজুয়ালি তো দেখা যায় যে গ্রামের মানুষ যেটা খুব টকটকে রংয়ের– সেটাই পছন্দ করে। আমরা এধরনের টকটকে রংয়ের জিনিসের প্রতি গ্রামের মানুষের আগ্রহকে গ্রাম্য-মানসিকতার পরিচয় বলে দেখি। সাধারণ বাংলায় বলি খ্যাত। কিন্তু আপনি তাদের ঐ টকটকে লাল-রংয়ের পাঞ্জাবি পছন্দ করাকে ব্যাখ্যা করতে যেয়ে বললেন, 'ঐরকম লাল টকটকে

~ www.amarboi.com ~

পাঞ্জাবি পরার মতো সারল্য আমার নেই।' ঘটমান ঘটনাকে সবার চেয়ে আলাদাভাবে দেখা কি আপনার সহজাত। নাকি ভিন্ন কিছু ব্যাখ্যা করার জন্যই আপনি ঐভাবে নিজের চিন্তা শক্তিকে প্রভাবিত করেন?

শাহাদুজ্জামান : আউট অব দ্য বক্স ভাবতে আমি সবসময় পছন্দ করি। আরোপিতভাবে ভিন্ন কিছু ভাবার চেষ্টা করি না ।

মাসউদুল হক : আপনি কখন অনুভব করলেন যে আপনি বাংলা সাহিত্যে একজন বিশিষ্ট লেখক?

শাহাদুজ্জামান : আমি বিশিষ্ট লেখক কিনা জানি না। একটা প্যাশন থেকে লেখালেখি করে যাই এবং টের পাই যে আমার একটা পাঠক পাঠিকা গোষ্ঠী আছে। নানাভাবে আমার লেখার রিয়াকশন পাই। অচেনা একজন মানুষকে শুধুমাত্র লেখার মধ্য দিয়ে স্পর্শ করতে পেরেছি সেটা দেখতে পাই। সেটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। আমি বিশিষ্ট না বিখ্যাত লেখক সেটা নিয়ে বিশেষ ভাবি না।

মাসউদুল হক : ইদানিংকালে একটা আলোচনা হয় যে, দৈনিক পত্রিকা নিজে যেমন কোনো বিষয় জনপ্রিয় করে আবার জনপ্রিয় বিষয়ের সাথে নিজেকে জড়াতে পছন্দ করে। যেহেতু আপনি তো ইদানিং দৈনিক পত্রিকা কেন্দ্রিক কিছু লেখালেখি করছেন। সে কারণে আমি জানতে চাইছি– আপনি কি দৈনিক পত্রিকার সাথে জড়ালেন না-কি দৈনিক পত্রিকা আপনার সাথে জড়াল?

শাহাদুজ্জামান : আসলে দৈনিক পত্রিকা আমাকে কলাম লেখার অনুরোধ জানায়। লিখব কিনা সেটা নিয়ে শুরুতে দ্বিধা ছিল। কিন্তু পরে সচেতনভাবেই সিদ্ধান্ত নিই লেখার। কেন লিখছি সেটা নিয়ে কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর আমার একটা সাক্ষাৎকার নিয়েছিল তাতে অনেক বিস্তারিত আলাপ করেছি। এইটুকু বলি আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গিকে বজায় রেখে আমার টুকরো নানা ভাবনাকে বৃহত্তর একটা পাঠকের কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। আমি প্রচলিত ধারার রাজনৈতিক কলাম লিখিনি। আমি সমাজ, দর্শন, ভ্রমণ ইত্যাদি নিয়ে নানা ভাবনার কথা লিখেছি যেগুলো হয়তো আমি কখনো কোনো গল্প বা প্রবন্ধে লিখব না। দৈনিক পত্রিকা না লেখক কে কাকে ব্যবহার করবে সেটা লেখকের উপর নির্ভর করবে। পত্রিকায় কলাম লেখা আমার লেখালেখিতে কীভাবে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে সেটা নিয়ে বিস্তারিত আলাপ করেছি জাহাঙ্গীরের সঙ্গে। সেই সাক্ষাৎকার আমার নিজের বই 'দূরগামী কথার ভেতর' এবং জাহাঙ্গীরের সম্পাদিত সাক্ষাৎকার বইয়ে আছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মাসউদুল হক : আপনি কি মনে করেন যে, লেখালেখি যদি আপনার পেশা হতো তাহলে আপনি এখন যেমন লিখছেন তার চেয়ে লেখার পরিমাণ বেশি হতো বা মানের দিকটা আরো উন্নত হতো?

শাহাদুজ্জামান : সেটা তো আগে তোমাকে বলেছি যে লেখাকে যদি আমি পেশা হিসেবে নিতে পারতাম তাহলে আমি সবচেয়ে খুশি হতাম। আমি নিশ্চয়ই আরো বেশি লিখতে পারতাম এবং মন খুলে লিখতে পারতাম। কিন্তু আমি যে ধারার লেখা লিখি তা দিয়ে তো এদেশে জীবিকা নির্বাহ করা সম্ভব না। তবে লেখার মানের সাথে আমি কম্প্রোমাইজ কখনোই করি না।

মাসউদুল হক : 'অগল্প' প্রসঙ্গে আসি। এটা তো প্রথম গল্প বলছেন আপনি এবং এটার মূল বিষয় মুক্তিযুদ্ধই ছিল। পরবর্তী সময় কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আপনি তেমন কিছু লেখেননি বা লেখার কোনো চেষ্টা করেননি। হয়তো কখনো কখনো মুক্তিযুদ্ধের প্রসংগটি এসেছে প্রকটভাবে। তবে মূল উপজিব্য বিষয় হিসেবে নয়।

শাহাদুজ্জামান : মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সত্যিকার যে রকম সাহিত্য হওয়ার কথা সেরকম হচ্ছে না, এই একটা আক্ষেপ থেকে বলতে পার 'অগল্প' লেখা। এটা একটা গল্প লিখতে না পারার গল্প। পরবর্তীকালে ক্রাচের কর্নেল উপন্যাসে বেশ বিস্তৃতভাবেই মুক্তিযুদ্ধ এসেছে। এছাড়া আমার 'মাজার, টেবিল টেনিস, আসলি মোরগ' গল্পটাতেও মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটটা আছে।

মাসউদুল হক : 'মাজার, টেবিল টেনিস, আসলি মোরগ' পড়েছিলাম। সেটা কি পরে শেষ করেছিলেন না ঐ অবস্থায়ই আছে জানি না। এটা কি একটি উপন্যাসে রূপ দেয়ার কথা ভাববেন?

শাহাদুজ্জামান : ওটা ঐ অবস্থাতেই আছে। ওটাকে একটা বড় গল্প হিসেবেই প্রকাশ করেছি। কোনদিন হয়তো এটাকে এক্সপান্ড করব।

মাসউদুল হক : 'শিং মাছ, লাল জেল' এর মতো কিছু গল্প আছে যেসব গল্প পড়লে মনে হয় আপনি নিজের সাথে নিজেই কথা বলছেন?

শাহাদুজ্জামান : এক অর্থে তো সব গল্পই নিজের সাথে কথা বলা। ঐ গল্পটায় আসলে আমি বরং আমার এক বন্ধুর মানসিক অবস্থাটাই ধরতে চেয়েছি। সে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী এক একনিষ্ঠ রাজনৈতিক কর্মী ছিল। তারপর সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটলে সে মানসিকভাবে খুবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তার সেই মানসিক দ্বন্দ্বগুলোই ঐ গল্পে ধরবার চেষ্টা করেছি। সেখানে আমিও হয়তো আংশিকভাবে আছি।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মাসউদুল হক : আপনার পাঠক হিসেবে আমার মনে হয়েছে, ক্যাঙ্গারু দেখার শ্রেষ্ঠ দিন অনুবাদের আগে লেখা গল্পগুলো এবং পরবর্তী সময়ে লেখা গল্পগুলোর ফরম্যাটে পরিবর্তন ঘটে গেছে। আমরা দেখি, আগে আপনি লিখেছেন এমন বিষয় নিয়ে আবার গল্প লিখেছেন। এখন যদি আমরা বলি, 'আন্না কারেনিনার জনৈক পাঠিকা' গল্পের মধ্যে আপনার সাম্প্রতিক গল্প 'অন্য এক গল্পকারের গল্প নিয়ে গল্প' এই গল্পের বীজ রোপণ করা ছিল?

শাহাদুজ্জামান : কীভাবে বল দেখি?

মাসউদুল হক : 'অন্য এক গল্পকারের গল্প নিয়ে গল্প'টিতে আপনি কিন্তু জীবনানন্দ-এর একটি গল্প নিয়ে আপনার এক বন্ধুর সাথে আলাপ করেছেন। সেই আলাপের প্রতিচ্ছবি এই গল্পটি। আবার অনেকবছর আগে লেখা 'আন্না কারেনিনার জনৈক পাঠিকা গল্প' যখন লিখেছেন তখন সেখানে বইয়ের পাতায় পাতায় গ্রন্থের মালিক আর তার সম্ভাব্য প্রেমিকার গল্পের চরিত্র নিয়ে আলোচনাকে আপনি গল্পের ভেতরে তুলে এনেছেন। উভয় গল্পের ফরম্যাট একই। একটি বিখ্যাত গল্প নিয়ে আলোচনাকে কেন্দ্র করে আরেকটি গল্পের জন্ম দেয়া।

শাহাদুজ্জামান : এই দুটো গল্পের ফরমেটের ভেতর একটা মিল আছে ঠিকই বলেছ। তবে সেটা সচেতনভাবে না। হয়তো সাব কনসাসলি কাজ করেছে।

মাসউদুল হক : 'আন্না কারেনিনার জনৈক পাঠিকা' এবং 'অন্য এক গল্পকারের গল্প নিয়ে গল্প'– এই দুই গল্পের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কতদিন?

শাহাদুজ্জামান : পনেরো বছরের মতো হবে।

মাসউদুল হক : আমরা বলতে পারি, পুরনো গল্প থেকে আপনি বিস্মৃত হন না। কারণ 'সাড়ে সাতাশ'তে এসে আপনি আবার আপনার পুরনো লেখা রিভিউ করছিলেন। দেখা যাচ্ছে, আপনি রিভিউয়ের মধ্যে থাকেন; আপনার পুরনো জিনিসগুলো নড়াচড়া করে দেখেন। আমার কাছে মনে হয় যে, আপনি লিখতে না পারলে একটা অস্বস্তির মধ্যে থাকেন যে, কিছু একটা লিখতে হবে আপনাকে।

শাহাদুজ্জামান : হ্যাঁ, সাড়ে সাতাশ গল্পটা মূলত আমার আগের গল্পের রিভিউ। সেসময় আমার একটা রাইটার্স ব্লক চলছিল তখন আমি আমার পুরনো গল্পের চরিত্রগুলো নিয়ে বসলাম এবং তাদের সঙ্গে একধরনের ডায়লগ শুরু করলাম। সেটা নিয়েই ঐ গল্প। আমি ফিলিনির ফিল্ম 'এইট এ্যান্ড হাফ' দিয়ে প্রভাবিত হয়ে গল্পটা লিখেছিলাম। হ্যাঁ বলতে পারো লিখতে না পারলে আমি একটা অস্বস্তিতে থাকি। কিছু না কিছু আমাকে লিখতেই হয় অধিরত

~ www.amarboi.com ~

মাসউদুল হক : 'অন্ধ শাহাজাহান' গল্পটি কত সালে বের করেন? মানে এটা তো কাঙ্গারু দেখার শ্রেষ্ঠ দিন অনুবাদের আগে না পরে?

শাহাদুজ্জামান : এটা তুমি জানতে চাচ্ছ কেন?

মাসউদুল হক : জানতে চাচ্ছি এই জন্য যে, সেখানে কয়েকটি ধারণা আছে। 'লিভিং টুগেদার অ্যান্ড লিভিং এপার্ট টুগেদার।' তার পর আবার মায়া সভ্যতার কথা বলেছেন যে তারা একদিন নগর ছেড়ে অন্য নগরে চলে গেল। ঐটারই ধারাবাহিকতার পরে আমরা পাই 'মহাশূন্যে সাইকেল' এ। তারাও একটা গ্রহ থেকে আর একটা আলোক বর্ষে চলে যাচ্ছে। তো আমার মনে হয়েছে, আপনার ভাবনাটা শুরু হয়েছে ঐ সময়টা থেকে। আমি বলতে চাইছি আপনার যে পরিবর্তন তা শুরু হয়েছে 'কাঙ্গারু দেখার শ্রেষ্ঠ দিন ' অনুবাদেরও আগে। মূলত শুরু হয়েছে 'অন্ধ শাহাজাহান' এ। অ্যান্ড ভেরি ইন্টারেস্টিং যে, তখন আপনার বয়স ৪৫ অতিক্রম করেছে।

শাহাদুজ্জামান : আমি প্রথম বিদেশে পড়তে যাই ১৯৯৬ এ। দেশ এবং প্রবাসের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে আমার চিন্তার একটা পরিবর্তন শুরু হয়। সেটা ঠিকই যে তা বেশ আগে থেকেই, 'কাঙ্গারু দেখার শ্রেষ্ঠ দিন' অনুবাদেরও আগে। 'অন্ধ শাজাহান' গল্পটা লিখি আমি ২০০১ এ টুইন টাওয়ার হামলার পরে । গল্পে সেটার রেফারেন্স আছে।

মাসউদুল হক : কোনো কোনো জিনিস আপনি রিপিট করেন। যেমন 'শাহজাহান' একাধিকবার আপনার গল্পে এসেছে।

শাহাদুজ্জামান : এই শাহাজাহান তো সম্রাট শাহাজাহান আর ঐ শাহাজাহান তো হচ্ছে রাস্তার গায়ক শাহাজাহান।

মাসউদুল হক : লক্ষণীয় বিষয় আগে আপনি মানুষকে দেখতেন। আমরা শাহজাহানের কথা এই জন্য বললাম যে ২০০১ সালের দিকে থেকে আসলে আপনি অনেকটা নিজের দিকে ফেরা শুরু করেছেন। মানে টার্নিং পয়েন্ট, আপনি একটা পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গেছেন। সেটা আস্তে আস্তে 'মহাশূন্যে সাইকেলের' দিকে টার্ন নেয়। যদি গল্পগুলো ধারাবাহিকভাবে পড়ি তখন আপনি আসলে নিজের দিকে তাকান নাই। এবং সেই সাথে কিন্তু প্রবাস জীবনটা জড়িত খেয়াল করছেন? আপনি যখন আস্তে আস্তে একটা অভ্যস্ত সমাজ থেকে বের হয়ে যাচ্ছেন তখন আপনার মধ্যে একটা সেলফ কনসাসনেস এর জায়গা তৈরি হচ্ছে। তখন আপনি পুরনো গল্পগুলো নিয়ে বা আপনার নিজের লেখা নিয়েও ভাবা শুরু

~ www.amarboi.com ~

করলেন। তারপরে 'মহাশূন্যে সাইকেল' আসল। মহাশূন্যে সাইকেল তো বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলোর মধ্যে একটি। অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন।

শাহাদুজ্জামান : আমার প্রবাস জীবনের সাথে নিজের দিকে তাকানোর যে সম্পর্ক তুমি দেখাচ্ছ সেটা খুব ইন্টারেস্টিং এবং তার সত্যতা আছে। আমি এভাবে ভেবে দেখিনি আগে। মহাশূন্যে সাইকেল আমার নিজেরও খুব পছন্দের একটা গল্প।

মাসউদুল হক : 'মহাশূন্যে সাইকেল' এ যে ভাবনার অবতারনা ঘটিয়েছেন তা কি আপনার নিজস্ব চিন্তা প্রসূত না-কি ভাবনার মূল এসেন্সটা ধার করা?

শাহাদুজ্জামান : এ গল্পের এসেন্সটা আমারই কারো কাছে ধার করা না। তবে ঐ যে নিজেকে টেলিফোন করা এই ভাবনাটা এসেছে একদিন একজনের সাথে কথা বলতে বলতে। কী প্রসঙ্গে সে যেন বলছিল আচ্ছা নিজের বাসায় ফোন করে নিজেকেই যদি চাওয়া যায় তাহলে ব্যাপারটা কেমন হয়? এটা নিয়ে আমরা মজা করেছিলাম। পরে অস্তিত্ব, বিচ্ছিন্নতা, দূরত্ব এইসব ভাবনাকে উপস্থিত করতে গিয়ে ঐ টেকনিটকটাকে ব্যবহার করেছি।

মাসউদুল হক : আপনার অনেকগুলো গল্পের শুরুতে কিছু হেয়ালি আছে যেমন 'বুক সেলফে বাঘ' আপনি সরাসরি স্বীকারও করেছেন, আপনি তো হেয়ালি করেন। এটার পেছনে কারণটা কী?

শাহাদুজ্জামান : শিবু কুমার শীল আমার একটা সাক্ষাৎকার নিয়েছিল তাতে সে বলেছিল যে আমি গল্পের শুরুতে অনেকটা ক্রিকেটের লুজ বল দেয়ার মতো পাঠককে প্ররোচিত করে গল্পের ভেতর ঢুকিয়ে নেই তারপর তাকে একটা ভিন্ন অভিজ্ঞতার ভেতর নিয়ে যাই। কথাটা আমার পছন্দ হয়েছে। এই টেকনিটটা আমি সম্ভবত অবেচতনভাবে নিয়েছি রাস্তার পাশে ঔষধ বিক্রেতা ক্যানভাসারদের কাছ থেকে। একসময় আমি প্রচুর এই ক্যানভাসারদের বক্তৃতা শুনতাম। তারা কিন্তু তার ঔষধ বিক্রি করবার জন্য আগে নানারকম মজাদার গল্প শোনাতে থাকে যার সঙ্গে ঔষধের কোনো সম্পর্ক নাই। আমি একধরনের হেয়ালির ভেতর দিয়ে এভাবে হয়তো পাঠকদের জালে আটকে ফেলবার চেষ্টা করি যাতে গল্পের শেষ ঔষধটা সে খায়।

মাসউদুল হক : ফুটবলে রোমারিও যেমন অনেকক্ষণ ডি বক্সের আশপাশে ঘুরে একটা ফাঁক খুঁজে বের করার জন্য। সে জানে, ড্রিবলিং করতে থাকলে এক সময় ফাঁকটা দিয়ে গোলবারে বলটা চালিয়ে দেয়া যাবে। আপনি কি ফাঁকটা জেনেই

~ www.amarboi.com ~

বল নিয়ে ঘুরেন না-কি ফাঁকটা এক সময় বের হবে এরকম একটা সম্ভাবনা মাথায় রেখে শুরু করেন?

শাহাদুজ্জামান : হ্যাঁ বলতে পারো ঐ ফাঁকের ফাঁদের মধ্যে পাঠককে ফেলে দেয়া। পাঠক পাঠিকা একধনের প্রত্যাশা নিয়ে গল্পে ঢোকে কিন্তু হয়তো একটা সারপ্রাইজ তার জন্য অপেক্ষা করে।

মাসউদুল হক : আপনি বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের মধ্যে সাক্ষাৎকার নিয়েছেন যেমন, হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এবং শহীদুল জহির-এর।।

শাহাদুজ্জামান : না শহীদুল জহিরের ফরমাল সাক্ষাৎকার নেওয়ার কথা ছিল, নেয়া হয়নি। এক শুক্রবারে বসার কথা ছিল তার সাথে কিন্তু তার দুদিন আগে তিনি মারা গেলেন।

মাসউদুল হক : এর মাঝখানে তো আরও অগ্রজ সাহিত্যিক আছেন। এদের মাঝখান থেকে আপনি এই মাত্র ক'জনের বিষয়ে আগ্রহী হলেন কেন?

শাহাদুজ্জামান : বাংলাদেশের বিভিন্ন জনের লেখা আমি পড়ি। কিন্তু আমাকে সবাই আগ্রহী করে না। সবকিছু মিলিয়ে হাসান আজিজুল হক, ইলিয়াস ভাই আমাকে কৌতূহলী করেছে এবং শহীদুল জহিরও করেছে। আর বাকিদের লেখাপত্র পড়ে আমার মনে হয়েছে যে আমি মোটামুটি তাদের বুঝতে পারছি, প্রশ্ন করে তাদের আরও ভেতরে ঢোকার আগ্রহ হয়তো ততটা বোধ করিনি।

মাসউদুল হক : যাদেরকে আপনার সময় আপনি জীবিত পান নাই, এমন যদি কারও সাক্ষাৎকার নেয়ার সুযোগ পান তাহলে আপনি কার কার সাক্ষাৎকার নিবেন?

শাহাদুজ্জামান : জীবনানন্দ দাশ।

মাসউদুল হক : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ?

শাহাদুজ্জামান : হ্যাঁ ওয়ালীউল্লাহও। সময়ের তুলনায় অনেক এগিয়ে থাকা লেখক তিনি। তার 'কাঁদো নদী কাঁদো' তো অসাধারণ কাজ, লেখার ফর্ম, কনটেন্ট দু দিক দিয়েই।

মাসউদুল হক : এখন আপনার ভাবনার একটা বড় অংশ জুড়ে কি 'এগজিসটেনসিয়ালিজম' সংক্রান্ত ভাবনা জায়গা করে নিয়েছে?

আমার বই

~ www.amarboi.com ~

শাহাদুজ্জামান : অস্তিত্ববাদ তো একটা দার্শনিক ধারণা। আমি ঠিক সে ধরনের দর্শন দিয়ে প্রভাবিত হয়ে লিখি নাই। তবে ব্যাক্তির অস্তিত্ব তো সবসময় আমার আগ্রহের বিষয়। কিন্তু ব্যক্তিকে আমি বড় প্রেক্ষপটের ভেতর দেখার চেষ্টা করি। তুমি বললে যে আমি রূপবান এর কাহিনি বলতে গিয়ে রূপবান যে জঙ্গলে আছে সেই জংগলটাও দেখতে চাই।

মাসউদুল হক : আপনার সময় যখন লিখছেন তার আগে পরে অর্থাৎ সেই সময় অনেকেই চিত্রকলা, গল্প উপন্যাস সবজায়গাতে ফ্রয়েডিজম দ্বারা অনেক বেশি প্রভাবিত ছিলেন। আপনার উপর তার কোন প্রভাব আছে কি?

শাহাদুজ্জামান : বিশ শতকের পশ্চিমা ভাবনার কয়েকজন মানুষকে বোঝা যেকোন চিন্তাশীল মানুষের জন্য জরুরি, যেমন মার্ক্স, ফ্রয়েড আর আইনস্টাইন। আমি একসময় এদের লেখাপত্র মনোযোগের সাথে পড়েছি। মানুষের অবচেতন মনকে বোঝার ক্ষেত্রে ফ্রয়েডের তো বড় ভূমিকা আছে। সেটা লেখালেখিতে তো অবশ্যই প্রভাব ফেলে। তবে আমি ফ্রয়েডের মার্ক্সিস্ট ক্রিটিকে আগ্রহী ছিলাম। ফ্রয়েড ব্যক্তির উপর বেশি জোর দিয়েছেন। আমি বরং পছন্দ করতাম মনোবিজ্ঞানী ইয়ুং কে, যিনি যৌথ অবচেতনার কথা বলেছেন। আমি ইয়ুংএর লেখা অনুবাদও করেছি।

মাসউদুল হক : মনোবিজ্ঞানী ইয়ুং-এর সূত্র ধরেই বলি, আপনি যখন লেখেন তখন আপনার সচেতন মন বা ব্যক্তিগত অবচেতন মন কি যৌথ অবচেতন মনের চিন্তাকে অতিক্রম করতে পারে? লেখকের জন্য এই অতিক্রম কি জরুরি?

শাহাদুজ্জামান : এই যৌথ অবচেতনাকে তো ঠিক অতিক্রম করা যায় না। বরং এর ব্যাপারে সচেতন হওয়া যায়। ঋত্বিক ঘটকের ছবিতে এক ধরনের কালেকটিভ আনকনসাস, আর্কিটাইপ এসব ধারণার প্রতিফলন আছে। তার অযান্ত্রিক ছবিটা তার একটা উদাহরণ।

মাসউদুল হক : আপনি সাবঅলটার্ন স্টাডিজের কথা বলছিলেন। গ্রামের যে সাব অলটার্ন জীবন সেটা কি আর আগের মতো আছে? সাবঅলটার্নদের জীবন তো বদলে গেছে।

শাহাদুজ্জামান : সাবঅলটার্ন স্টাডিজ তো একটা হিস্টোরিকাল পারসেপেকটিভ, একটা থিউরিটিক্যাল জায়গা। পোস্ট কলোনিয়াল স্টাডিজের ভেতর সাবঅলটার্ন তাত্ত্বিকদের এক বড় ভূমিকা আছে। আমি এই পারসপেকটিভকে আজকের পৃথিবী বুঝতে খুবই প্রয়োজনীয় মনে করি। এটা শুধু গ্রামের মানুষের ব্যাপার না, এটা পুরো আধুনিকতাকে বোঝার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ পারসপেকটিভ। সাব

~ www.amarboi.com ~

অলটার্ন তাত্ত্বিকদের ভেতর দীপেশ চক্রবর্তীকে আমার খুব সিগনিফিকেন্ট মনে হয়। এক্ষেত্রে অলটারনেটিভ মডার্নিটির ধারণা আমার কাছে খুব আকর্ষণীয় মনে হয়।

মাসউদুল হক : আপনার 'কথা পরম্পরা' বইয়ের সূত্রে মিলান কুন্ডেরার ভাষায় উপন্যাস হলো ফাঁদে আটকে পড়া মানুষের জীবনের ব্যবচ্ছেদ। আপনিও কি তাই মনে করেন?

শাহাদুজ্জামান : কথা তো ঠিকই। এই যে আমি একটা দেশে, একটা ধর্ম পরিচয়ে একটা বিশেষ সময়ে জন্ম নিয়েছি এটা তো আমার চয়েস না, আমি একটা ফাঁদেই পড়েছি। এখন আমার সারা জীবনের কাজ এই ফাঁদে আটকে পড়াকে বোঝা, ব্যবচ্ছেদ করা। প্রত্যেকটা মানুষই এমন এক একটা ফাঁদে আটকে পড়ে থাকে। বিটলসের একটা গান আছে, 'ইউর লাইফ ইজ হোয়াট হেপেনস টু ইউ হোয়েন ইউ আর মেকিং আদার প্ল্যানস।' তুমি যখন তোমার জীবন নিয়ে নানা পরিকল্পনা করছ তখন তোমার জীবনে অনেক কিছু ঘটে যায়, যা তোমার পরিকল্পনার বাইরে, সেটাই হচ্ছে আসল জীবন। তো কুন্ডেরার কথা তো ঠিক বলেই মনে করি। আমরা কে কীভাবে ফাঁদে আটকে আছি সেটার ব্যবচ্ছেদ করাই লেখকের কাজ। আমি যে গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, গবেষণা, অনুবাদ একের পর এক করে চলেছি সেটা জীবনকে ঐ ব্যবচ্ছেদ করার একটা লোভ থেকেই।

মাসউদুল হক : এর পরে যদি আবার জীবন পান তবে বর্তমান সত্তাগুলোর মধ্যে কোন সত্তাকে রাখবেন বা বাতিল করবেন? অন্যভাবে বললে, একই রকম পৃথিবীতে আপনি যদি আবার আসেন, সেক্ষেত্রে আপনি কোন কোন জিনিসগুলো রাখবেন আর কোন কোনগুলো বাতিল করে দেবেন।

শাহাদুজ্জামান : আমার লেখক সত্তাকেই বাঁচিয়ে রাখতে চাইব। লেখা আমার কাছে জীবনের সবচেয়ে আনন্দের এবং অর্থময় কাজ মনে হয়। সাহিত্যের ভেতরই একটা বিস্তৃত জীবনযাপন সম্ভব। জীবিকার জন্য অনেক সময় মনের বিরুদ্ধে অনেক কাজ করতে হয়েছে সেগুলোকে হয়তো বাতিল করার চেষ্টা করব। জীবন আর জীবিকাকে মেলাবার চেষ্টা করব। এখন তো জীবন জীবিকার সাথে লুকোচুরি করে সাহিত্য করতে হয়। তবে জীবন তো আর আমার একার উপর নির্ভর করে না। আমি যে সমাজে জন্মাব, যে সময়ে জন্মাব তার প্রভাব থাকবে আমার উপর। তবে যতগুলো জীবনই পাই না কেন এটা জানি যে কোনো জীবনই পূর্ণাঙ্গ তৃপ্ত জীবন হবে না, অসম্পূর্ণতা থাকবেই। ফলে যে জীবনেই আসি না কেন জীবনকে ব্যবচ্ছেদ করাই হবে আমার কাজ। তবে কে জানে মানুষ না পশু পাখি হয়ে জন্মাব। জীবনানন্দ অবিশ্যি পাখি, ফড়িং, ঘাস যা কিছু হয়েই জন্মাতে

~ www.amarboi.com ~

চেয়েছেন। এসব হলে কি আর সাহিত্য করা যাবে? অবশ্য সনাতম ধর্ম মতে বারবার জন্ম নেয়া খুব ভালো কোনো কাজ না। আত্মাকে নশ্বর দেহ থেকে চূড়ান্ত মুক্তি দেয়াই প্রধান কাজ বলে তাদের ধারণা।

মাসউদুল হক : আপনার কিছু কিছু ভাবনা আছে যা মৌলিকতো বটেই; বিরলও বলতে পারেন। যেমন, গাছ যে বেড়ে ওঠে আপনি তার সে-ই বেড়ে ওঠার শব্দ শুনতে পান বা টয়োটা গাড়ির টায়ারে টগরের গন্ধ ভরা বাতাস ঢুকানো থাকে সেটা আপনি লক্ষ করেন। এ ধরনের ভাবনাগুলো আপনার মাথায় কী করে আসে?

শাহাদুজ্জামান : আসলে শুনবার মতো মন থাকলে অনেক কিছুই শোনা যায়, ইয়েটসের একটা কবিতা আছে তুমি ঠিক মতো কান পাতলে বনের কাঠবেড়ালীর হৃদস্পন্দনও শুনতে পাবে, জীবনানন্দ তো শিশিরের শব্দও শুনতে পেতেন। কিন্তু আমাদের সেই ধ্যানস্থ হবার সময় কোথায়? না গাছ বেড়ে ওঠা দেখতে পাই না কিন্তু দেখার আকাঙ্ক্ষা করি। আমার লেখাগুলোতে সেই আকাঙ্ক্ষার কথাই বলে থাকি।

মাসউদুল হক : লেখকের কি অহংকার বা আভিজাত্য থাকা দরকার?

শাহাদুজ্জামান : তুমি ঠিক কী অর্থে অহংকার বা আভিজাত্যের কথা বলছ জানি না। তবে কথা হচ্ছে, আমার জীবনের অভিজ্ঞতাটা গুরুত্বপূর্ণ, এই ভাবনাটা থাকা দরকার। আমি পৃথিবীর ৭০০ কোটি মানুষের একজন কিন্তু ঠিক আমার মতো কেউ নাই। আমার জীবনের একটা ইউনিকনেস আছে। এই স্বাতন্ত্র্যতার প্রতি বিশ্বস্ত থাকা দরকার। নিজের প্রতি এই বিশ্বস্ততা একধরনের আভিজাত্য তৈরি করতে পারে। লেখকের সেই আভিজাত্য থাকতে পারে। তার মানে এই বোধ না যে আমার জীবনটাই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো, গুরুত্বপূর্ণ, আমি সবচেয়ে বেশি বুঝি এসব। সেগুলো হচ্ছে স্থূলতা। এগুলো থেকে অহংকার জন্ম নিতে পারে। সেটা বাজে ব্যাপার। লেখকের বিনয় থাকা উচিত বলে আমি মনে করি।

মাসউদুল হক : আপনি যদি দেখেন যে, আপনার মতো করে এরকজন গল্প লিখছেন বা আপনার চেয়ে ভালো গল্প লিখছে–তখন কি আপনার মধ্যে ঈর্ষা বা তাকে অতিক্রম করার কোনো তাগিদ তৈরি হয় না।

শাহাদুজ্জামান : লেখকদের ভেতর সুস্থ প্রতিযোগিতা থাকা ভালো। সমসাময়িককালে আশপাশে কাউকে ভালো লিখতে দেখলে তাকে ঠিক ঈর্ষা না বরং নিজেকেই আরো অতিক্রম করার ইচ্ছা জাগে। শহীদুল জহিরের লেখা পড়ে,

~ www.amarboi.com ~

তার সঙ্গে কথা বলে আমি নিজের লেখাতেই আরো মনোযোগী হবার অনুপ্রেরণা পেতাম।

মাসউদুল হক : শহীদুল জহিরের একটা নিজস্ব স্টাইল ছিল। আপনি তো তার ভীষণ ভক্তও বটে। আমার পর্যবেক্ষণ হলো, উনি যে স্টাইল এ লিখতেন তার একটা সুবিধা ছিল । সুবিধাটা ছিল এই জন্য যে, ছোট একটা বিষয়টাকে নিয়ে অনেক কিছু করতে পারতেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে দেখা যেত যে, পাঠক ঐখানেই ঘুরপাক খাচ্ছে বেশি স্পেস নিয়ে উনি কিন্তু গল্প লিখেন নাই।

শাহাদুজ্জামান : শহীদুল জহিরের শক্তি দুর্বলতা নিয়ে আমি লিখেছি 'শহীদুল জহিরের দিকে দেখি' নামে একটা লেখায়। আমার কাছে উনার দেখার চোখটা ইন্টাররেস্টিং।

মাসউদুল হক : (ইন্টারেস্টিং বিষয় হলো, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদুল জহির স্মৃতি সংসদ এর আয়োজনে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলাম প্রবন্ধের নাম ছিল শহীদুল জহির : দেখার চোখ) আপনি কি মনে করেন যে সংসার জীবন সৃষ্টিশীল মানুষদের জীবনের জন্য অন্তরায়?

শাহাদুজ্জামান : সংসার জীবন সৃষ্টিশীল মানুষের জন্য অন্তরায় হতেই পারে। আমাদের দেশে সংসার যাপনের ঝক্কি তো অনেক। দেশের সবকিছুর সিস্টেমই যেহেতু নড়বড়ে ফলে বৈষয়িক ব্যাপারগুলো ঠিক ঠাক চালাতে অনেক শ্রম ঘাম ঝরাতে হয়। সেখানে অন্যমনস্কতার সুযোগ নাই। কিন্তু সৃজনশীল মানুষকে তো কখনো কখনো অন্যমনস্ক হতে হয়, এটা তার জন্য প্রয়োজন। তখন সংসারের অপর সঙ্গীর উপর ভারটা বেশি পড়ে, সেখান থেকে তিক্ততার সৃষ্টি হয়। তবে উদ্ধার পাওয়া যায় যদি সঙ্গী আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়। লেখালেখি বাউলরা যেমন বলেন যে বাতাসে গেরো দেয়ার কাজ। এই কাজটা তার সঙ্গী গুরুত্বপূর্ণ মনে করে কিনা সেটার উপর নির্ভর করবে সংসার সৃজনশীল মানুষের জন্য অন্তরায় হবে কিনা।

মাসউদুল হক : আপনি যেহেতু চিকিৎসক ছিলেন সেহেতু প্রাইভেট প্র্যাকটিস করার কথা। আমার কেন যেন মনে হয় আপনি প্র্যাইভেট প্র্যাকটিস করেননি? বা যদি করেও থাকেন এই যে পরামর্শের বিনিময়ে ফিস নেয়া– এই বিষয়টিকে কি অন্য সবার মতো খুব প্রফেশনালি দেখতে পারতেন?

শাহাদুজ্জামান : না আমি স্থায়ীভাবে প্র্যাকটিস করা ডাক্তার কখনোই ছিলাম না। পাস করার পরই আমি ব্র্যাকের গ্রামীণ স্বাস্থ্য প্রকল্পে ডাক্তার হিসেবে যোগ দিই। ওটা ছিল মূলত পাবলিক হেলথের কাজ, ফিস দিয়ে রোগী দেখার ব্যাপার

~ www.amarboi.com ~

না। আসলে আমার পেশা নিয়ে একসময় নানা টানাপোড়েন গেছে। মধ্যবিত্ত পরিবারে ভালো রেজাল্ট করা ছেলে তাদের সামনে অবভিয়াস অপসন হচ্ছে ডাক্তারি, না-হয় ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া। আমার বাবা ইঞ্জিনিয়ার ফলে সবাই বলল ডাক্তারি পড়। পেশা নিয়ে তেমন বিশেষভাবে তো ভাবিনি তখন। আমাদের দেশে ছেলেমেয়েদের ক্যারিয়ার প্লানিং নিয়ে তেমন তো কোনো চর্চা নাই। এখন তাও কিছু আছে, আমাদের সময় তো এসব কোনো ভাবনাই ছিল না। তাছাড়া ক্যাডেট কলেজে পড়েছি, তারা তো চাইত আর্মিতে যাই। আর্মিতে যে যাব না সে ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম। সাহিত্য ভালো লাগত কিন্তু সাহিত্যকে পড়ার বিষয় ভাবার কোনো সুযোগ ছিল না। ইকোমিক্স পড়ার কথা ভেবেছিলাম। সে ব্যাপারে সিরিয়াস হলে সেটা হয়তো হতো কিন্তু আমার মেডিকেল ভর্তির রেজাল্ট বের হলো আগে। খুব একটা আর না ভেবে ভর্তি হয়ে গেলাম চিটাগাং মেডিকেল কলেজে। কিন্তু আগেই বলেছি মেডিকেল পড়া অবস্থায় আমার ইনভলভমেন্ট অনেক বেড়ে গেল নানারকম সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে। মানুষ তো জীবনের একটা মিনিং খোঁজে। ডাক্তারির চেয়ে শিল্পসাহিত্যের ভেতর থাকাটাকেই বেশি মিনিংফুল মনে হলো আমার কাছে। ডাক্তারি পড়া একসময় ছেড়েই দিলাম। তোমাকে বলেছি আগে যে ফিল্ম নিয়ে মেতে উঠেছিলাম, মস্কো, পুনা এসব ফিল্ম ইন্টিটিউটে ভর্তির চেষ্টা করছিলাম। আমার এসব পাগলামিতে পরিবার স্বভাবতই খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। পরিবারের সাথে নানা আবেগঘন এপিসোড গেছে এসব নিয়ে। এক পর্যায়ে আব্বা বললেন ঠিক আছে তোমার ডাক্তারি করতে হবে না, শুধু পাসটা করো, তারপর যা ইচ্ছা করো। আমি যা করতে চাইতাম আমার মা অবশ্য সাপোর্ট করতেন। বাবাও করতেন। কিন্তু ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত হতেন স্বাভাকিকভাবেই। যাহোক আমি পরে গ্যাপ দিয়ে আবার মেডিকেল পড়ি, পাস করি। মনে আছে মেডিকেল সার্টিফিকেটটা আব্বাকে পোস্ট করে পাঠিয়ে লিখেছিলাম, এটা তোমার জন্য। পেশা হিসেবে ডাক্তারি তো চমৎকার একটি পেশা, কিন্তু এক এক জনের মাইন্ড সেটটা তো এক এক রকম। আমি ভাবতাম আমার জীবনের এতরকম বিষয়ে আগ্রহ, শিল্প সাহিত্যে একটা কিছু করতে চাই কিন্তু শুধু চেম্বারে বসে বা হাসপাতালে রোগী দেখলে সেই সুযোগগুলো পাব কই। তখন গোপনে খোঁজ করতাম লেখকদের মধ্যে কে ডাক্তার। জেনে বেশ সাহস পেতাম যে বনফুল ডাক্তার ছিলেন, চেকভ, সমরসেট মম ডাক্তার ছিলেন। যাহোক আমি এমন একটা পেশা খুঁজছিলাম যাতে আমার ডাক্তারি জ্ঞানটাকে কাজে লাগাতে পারব কিন্তু আমার অন্য কাজ করারও সময় থাকবে। আমাদের দেশে চিকিৎসা পেশার পরিস্থিতি তো নানাভাবে জটিল। আমি যখন ফিল্ম নিয়ে মশগুল তখন একবার হাসান আজিজুল হকের 'পাতালে হাসপাতালের' গল্পটাকে ফিল্ম বানানোর চেষ্টা করেছিলাম। যাহোক পাস করার পর নিশ্চিত ছিলাম না কী করব।

~ www.amarboi.com ~

সেসময় ব্র্যাকের রুরাল হেলথ প্রজেক্টে কাজ করার সুযোগ পাই। কাজটা ভালো লেগে যায়। এরপর পাবলিক হেলথ গবেষণা, শিক্ষকতা এটাকেই পেশা হিসেবে নেই। চিকিৎসা নৃবিজ্ঞানের পিএইচডি করি। আমার পিএইচডির গবেষণা ছিল বাংলাদেশেরই একটি হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা। সুতরাং আমি চেম্বারে বসে রোগী দেখিনি ঠিকই কিন্তু স্বাস্থ্য গবেষণা আর শিক্ষকতার মাধ্যমে আমার ভূমিকা রেখেছি, রাখছি। একাজ আমার লেখালেখিকেও সাহায্য করছে নানাভাবে। চেম্বারে বসে রোগী দেখলে আমার জীবন কেমন হতো জানি না। তবে মনে হয় আমি ব্যাপারটা উপভোগই করতাম। আমার হিউম্যানেটিজের জ্ঞান হয়তো আমাকে মানবিকভাবে চিকিৎসা করতে সাহায্য করত। তবে চিকিৎসা এখন যেভাবে পণ্য হয়ে উঠেছে তাতে কতটা সফলভাবে তা করতে পারতাম কে জানে। আমি আমার পেশা নিয়ে এখন খুশি। অনেক লম্বা উত্তর দিলাম কারণ তুমি এমন এক প্রশ্ন করেছ যা নিয়ে আমি নিজেই দ্বন্দ্বে ভুগেছি অনেকদিন।

মাসউদুল হক : এই যে বিদেশে থাকছেন, বিদেশি সাহিত্য এবং তাদের চিন্তা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন– এগুলো কি আপনার ইদানিংকালের লেখায় প্রভাব ফেলছে বলে মনে করেন?

শাহাদুজ্জামান : বিদেশি সাহিত্য তো আমি পড়ছি অনেকদিন থেকেই, তার সাথে বিদেশে যাওয়ার কোনো সম্পর্ক নাই। তবে বিদেশে জীবনযাপন করার কারণে আমার চিন্তা ভাবনার উপর অনেক প্রভাব পড়েছে। কাজের সূত্রে পৃথিবীর নানা প্রান্তে ঘুরতে হয় আমাকে। এশিয়া, ইয়োরোপ, আফ্রিকার অনেক দেশে গিয়েছি আমি। এইসব অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই আমার চিন্তায় ভূমিকা রেখেছে। আজকের এই গ্লোবালাইজেশনের যুগে যে কোনো কাজ করতে গেলেই বিশ্ব প্রেক্ষাপটটা মাথায় রাখা দরকার। দেশের জীবন নিয়ে সাহিত্য করলেও ঐ বিগ পিকচারটা ভাবনার ভেতর থাকা দরকার। সেসব দেশে সশরীর অভিজ্ঞতা মনকে উন্মুক্ত করে। তাছাড়া আমি ব্রিটেনে বেশ কয়েক বছর ধরে আছি। একটা দেশে বেড়াতে আসা আর অনেকদিন সেখানে থাকার অভিজ্ঞতা ভিন্নরকম। এসব দেশের অনেক ভেতরের রূপটা বোঝা যায়। এদের শক্তি, দুর্বলতাটা বোঝা যায়। আর বিদেশে থাকতে থাকতে নিজের দেশকেও নতুন করে চেনা হয়। এর প্রভাব আমার নতুন লেখায় নিশ্চয়ই আছে।

মাসউদুল হক : 'দূরগামী কথার ভেতর' বইয়ের সাক্ষাৎকারগুলোতে দেখা যায়, আপনাকে যখন প্রশ্ন করা হয় এসময়ের কার লেখা ভালো লাগে তখন আমার মনে হয়েছে আপনি নির্দিষ্টভাবে কারো নাম উল্লেখ করেন না। কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর তার নেয়া সাক্ষাৎকারে যেমন অনেকটা জোর করিয়ে আপনার মুখ দিয়ে দু'একজন সম্পর্কে কথা বলিয়ে নিয়েছে। তখনও কিন্তু আপনি মতামত

~ www.amarboi.com ~
ব্যক্তকরণে সতর্ক ছিলেন। সাহিত্য এবং ব্যক্তিগত জীবন সবখানেই আপনার মধ্যে এক ধরনের সতর্কতা দেখতে পাই বলে মনে হয়। আপনার মতামত কী?

শাহাদুজ্জামান : আসলে কার লেখা ভালো লাগে এই প্রশ্নের উত্তরে অনেক রকম দায় থেকে লম্বা নামের তালিকা দেয়ার একটা রেওয়াজ দেখেছি অনেকসময়। কোনরকম দায় ছাড়া যাদের নাম আমি অকপটে বলতে পারি তাদের নাম আমি আমার সাক্ষাৎকারে বলেছি। তবে লেখালেখি আমার কাছে একটা সতর্ক কাজ। যখন লিখি প্রতিটা লাইন ভেবে সতর্কতার সাথে লিখি, অনেকবার বদলাই। আমি ঠিক স্বতঃস্ফূর্ত, চারণ ধারার লেখক না যে লিখতে বসলেই তর তর করে লেখা চলে আসে। বলতে পারো আমার জীবন যাপনেও সেই সতর্কতাটা আছে। কিন্তু সবসময় তা ছিল না। আমি একসময় লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে ঘোর গ্রস্তের মতো জীবন যাপন করেছি। জীবনের প্রচলিত হিসাব সব বাদ দিয়েছিলাম। তবে একেবারে ঠিক বেসামাল জীবন যাপন আমি করিনি কখনো। খুব বেসামাল জীবনাযাপন করেও অসাধারণ লেখা লিখেছেন অনেক লেখক। সেটা যার যার ধরন। অনেককে এমন ভাবতে দেখেছি যে সাহিত্য করতে হলে বেসামাল জীবন যাপন করতে হবে। ওসব হাস্যকর ধারণা। লেখালেখিকে যখন সিরিয়াসলি নিয়েছি তখন জীবনযাপনে সতর্ক হয়েছি। মনে হয়েছে অপচয় করার মতো সময় তো আমাদের হাতে বেশি নাই। তাছাড়া আগেই বলেছি আমাকে বেশ কয়েকটা জীবনকে সামাল দিতে হয়। ফলে এখন সতর্ক জীবন যাপন ছাড়া উপায় নাই। তবে সতর্ক থাকলেই কি আর একেবারে অংক কষে জীবন যাপন করা যায়? ঐ যে একটা গান আছে না, 'পথ ভোল, হে সাবধানী পথিক।' সে গানও মনে বাজে মাঝে মাঝে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কথা-ছয়

[এই কথোপকথন অমিতা চক্রবর্তীর সাথে। অমিতা চক্রবর্তী গল্পকার এবং কথাসাহিত্যের পত্রিকা 'বয়ান'এর সম্পাদক । এই কথোপকথন বয়ানে প্রকাশিত হয় ২০১৭ সালে। এই আলাপ কলকাতার সাহিত্য চর্চার সাথে আমাদের সাহিত্য চর্চার তুলনা, ইতিহাস, রাজনীতি, লিটল ম্যাগাজিন চর্চা ইত্যাদি নিয়ে কথা হয়েছে।]

অমিতা চক্রবর্তী : আমরা এখন একটা সংকটময় সময়ে পতিত হয়েছি। সমাজে উত্থান-পতন সবসময়ই থাকে, কিন্তু গত ক'বছরে অর্থাৎ ২০১১-১২ এর পর থেকে সংকটটা একটু আলাদা। লোকজন আজকাল কথাই বলতে চায় না, প্রবন্ধ দূরে থাক, গল্প বা কবিতায়ও কিছু বলতে চায় না। চারপাশে যা লেখা হচ্ছে বা বইমেলায় যে বইগুলো বের হচ্ছে কোথাও বলার চেষ্টা দেখছি না। সংকটকাল লেখক-পাঠক তৈরি করে। কিন্তু বর্তমান সময়ে লেখক-পাঠকের শূন্যতা দেখা যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের লেখক-পাঠকদের তুলনায় আমরা পিছিয়ে আছি। আমরা অনেক কিছু ভাবছি না, বোঝার চেষ্টা করছি না। আমাদের সমাজে ভাবার, বোঝার আগ্রহটা কম কেন?

শাহাদুজ্জামান : আমি কলকাতা-বাংলাদেশ এরকম তুলনা করব না। তাদের বাস্তবতা, পুরো সাহিত্যের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা–সবটাই ভিন্ন। ওরা এগিয়ে আছে না পিছিয়ে আছে এটা বলা মুশকিল। কলকাতার সাহিত্যের ভেতরেও স্থবিরতা আছে। ওদের সংগ্রাম আলাদা। বাংলা ওখানে প্রাদেশিক ভাষা। ওদের কনস্ট্যান্ট হিন্দি-ইংরেজির মতো ডমিন্যান্ট ভাষার সাথে সংগ্রাম করতে হয়। ওদের সাহিত্যও পুরোপুরি ওদের জীবনকে ধারণ করছে বলে মনে হয় না। ওদের সাহিত্যচর্চার ইতিহাস তো বহু দশকের। আমাদেরটা সমান্তরালে চলেছে। আমাদের সাহিত্যের একটা নিজস্ব চরিত্র আছে। আমাদের সংগ্রাম আলাদা। নিঃসন্দেহে একসময় সাহিত্যের সূচনাটা ওপারেই হয়েছে।

অমিতা চক্রবর্তী : শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশটা যেহেতু ওখানে...

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শাহাদুজ্জামান হ্যাঁ। কলকাতা রাজধানী ছিল। সবমিলিয়ে ওখানে ডেভেলপমেন্টটা হয়েছে। তবে আমাদের অগ্রযাত্রাও কম না। একটা সমাজ নানা জটিল মিথষ্ক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যায়। সাহিত্যিক হিসেবে এই মিথষ্ক্রিয়ার দিকে যদি আমার চোখ না থাকে, যদি শুধু গল্পের আঙ্গিক, ভাষার দিকে চোখ থাকে, তাহলে সত্যিকার জীবনটা সাহিত্যে অনুপস্থিত থাকে। গল্প লিখতে হলে আগে জীবন জিজ্ঞাসাটা তৈরি হওয়া দরকার। সাহিত্য ইটসেলফ কোনো বড় ব্যাপার না। বড় ব্যাপার হচ্ছে জীবন। জীবনের দিকে তাকাচ্ছি কি না সেটা বড় প্রশ্ন। জীবনকে নিবিড় পর্যবেক্ষণের পর আমার তাকে প্রকাশের জায়গা হচ্ছে সাহিত্য, অন্য কারও অন্য কিছু হতে পারে। সাধারণভাবে এই জীবনজিজ্ঞাসা, জীবনের দিকে তাকানো, আমাদের গল্পটাকে আমাদের মতো করে বলা–এসবের কমতি আছে আমাদের সাহিত্যে। আর উত্তপ্ত সময়ে যে সবসময় ভালো সাহিত্য হয়, তা না। পরিস্থিতিকে থিতু হতে হয়। বোঝার জন্য সময় দরকার। আমরা খুব জটিল একটা সময় পার করছি। উপমহাদেশের অন্য কোনো দেশের সাথে আমাদের সংগ্রাম মিলবে না। আমাদের সংগ্রাম একেবারে আমাদের নিজস্ব। সেটা এই মুহূর্তের সাহিত্যে কতটা আসছে সেটা নিশ্চয়ই প্রশ্ন সাপেক্ষ। একটা বিপজ্জনক বিষয় হচ্ছে আমরা ভাবি সত্য আমাদের যার যার পকেটে, আমরা সব বুঝে গেছি। জটিল পরস্থিতিকে সত্যিকার অর্থে খোলা মনে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। এই সময়টার ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক মাত্রাটাকে বুঝতে হবে। সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আমি কলাম লিখছি। সৃজনশীল সাহিত্যে আনতে হলে তো বিষয়গুলোকে একটা ফিল্টারের ভেতর দিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

অমিতা চক্রবর্তী : আপনার 'ক্রাচের কর্নেল' তো ঐতিহাসিক একটা বিষয় নিয়ে লেখা। নবাব সিরাজদ্দৌলাকে নিয়ে যে লেখালেখিগুলো হয়েছে সেখানে একেকজন লেখক একেকভাবে সিরাজদ্দৌলার চরিত্র এঁকেছেন। ঐতিহাসিক চরিত্র বা ঘটনা নিয়ে সাহিত্য রচনার বিষয়টিকে আপনি কীভাবে দেখেন? লেখা উচিত কি না বা লিখলে কেমন হওয়া উচিত? যেমন ক্রাচের কর্নেলে তাহেরকে হিরো হিসেবে দেখানো হয়েছে। কেউ হয়তো বলবে যে বাস্তবে উনি এমন ছিলেন না। বা কেউ বলবে তাহের তো বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী। একেকজন একেকভাবে ব্যাখ্যা করবে।

শাহাদুজ্জামান : এটা আসলে উচিত-অনুচিতের বিষয় না। কেউ যদি ঐতিহাসিক চরিত্র বা বিষয় নিয়ে সাহিত্য রচনা করতে চায় কেন সে লিখবে না? ঐতিহাসিক সাহিত্যের কয়েকটা টাইপ আছে : এক, সময়টা ঐতিহাসিক, চরিত্রগুলো কাল্পনিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে এ ধরনের সাহিত্য হয়েছে; দুই, ঐতিহাসিক সময়ের পটভূমিতে কিছু সত্য চরিত্র এবং কিছু কাল্পনিক চরিত্র

~ www.amarboi.com ~

থাকবে; তিন, এখানে কোনো ফিকশনাল বা কাল্পনিক চরিত্র থাকবে না। পুরোটাই হবে সত্য চরিত্র নিয়ে। আমার ক্রাচের কর্নেল তৃতীয় ধারার। ঐতিহাসিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে পজিশনিং অব দ্য অথর অর্থাৎ ইতিহাস নিয়ে কে কথা বলছে সেটা ইম্পর্ট্যান্ট। নিঃসন্দেহে ইতিহাস নিয়ে কাজ করাটা ঝুঁকিপূর্ণ। ক্ষমতাবানরা একরকমভাবে ইতিহাস বলবে, ক্ষমতাহীনরা আরেকভাবে। প্রত্যেক দেশের নিজস্ব ইতিহাস আছে। লেখক হিসেবে আমি ইতিহাস নিয়ে কৌতূহলী। আমি আমার সময়টাকে বুঝতে চাই। '৬৯ থেকে '৭৫–এই ভূখণ্ডের সবচেয়ে নাটকীয় সময়। আমার আগ্রহ এ সময়টা বোঝায়। আসলে কী ঘটেছে। একেকজন একেক ডিসকোর্স থেকে এ সময়টার কথা বলেন। একেক রাজনৈতিক দলের একেকটা বয়ান আছে। কোনো নির্দিষ্ট বয়ানকে আমি এন্ডোর্স করিনি। কোনো একটা সময়কে বোঝার উপায় হলো ডকুমেন্টারি দেখা বা সেই সময়ের ঘটনাগুলোর সাথে সম্পর্কিত মানুষগুলো থেকে জানা। নিজের নিরপেক্ষতাটাও জরুরি। কিন্তু পৃথিবীর কোনো মানুষই শতভাগ নিরপেক্ষ না। তো আমি এই সময়টাকে আমার মতো করে দেখেছি। এর কিছু মেথোডলজিও আছে। যেমন যে-কোনো তথ্যকে অন্তত দুটো সূত্র থেকে যাচাই করেছি। তথ্যের ঘাটতি যেন না হয় সেদিকে লক্ষ রেখেছি। তো তথ্য সংগ্রহের পর সেটাকে কীভাবে অর্গানাইজ করা হচ্ছে সেটা ইম্পর্ট্যান্ট। আমি চেয়েছি সেই সময়ের প্রচলিত বয়ানগুলো দ্বারা প্রভাবিত না হতে। '৭৫ এর সময়টা, ৭ নভেম্বরের সময়টা কুয়াশাচ্ছন্ন, রহস্যময়। আমি আমার জায়গা থেকে সেই সময়ের কথা বলতে চেয়েছি। একেকটা গ্রুপ একেক রকমের কথা বলেছে। কেউ কেউ এই বইটা পড়ে বলেছেন তাহেরকে এখানে বেশি মহান হিসেবে দেখানো হয়েছে। আবার অন্যরা বলেছেন এখানে শেখ মুজিবকে বেশি জায়গা দেওয়া হয়েছে। আমি এবিষয়ে আরো কয়েক জায়গায় লিখেছি। এই বইয়ের মূল নায়ক হচ্ছে বাংলাদেশের ইতিহাসের সেই সময়টা। সাহিত্যের জায়গা থেকে তাহের খুব ইন্টারেস্টিং। '৬৯-'৭৫ এই সময়টা বোঝার জন্য আমি এমন একটা চরিত্র নিয়েছি যে কন্ট্রোভার্শাল, প্যারাডক্সিক্যাল, আবছা। আওয়ামী লীগ, বিএনপি বা জাসদ–যে কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষেই তাহেরকে পুরোপুরি গ্রহণ করা মুশকিল। বেসিক্যালি তাহের তো ব্যর্থ মানুষ। যা করতে চেয়েছেন, তার কিছুই বাস্তবায়ন করতে পারেননি। আমি একটা ব্যর্থ মানুষকে কেন্দ্র করে লিখেছি, তার ইন্সপিরেশন-মোটিভেশনকে ফলো করেছি। হিরো তিনিই, যিনি একটা নির্দিষ্ট স্পিরিট নিয়ে এগিয়ে যান এবং এ জন্য যে কোনো কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকেন। আমি এই স্পিরিটটাকে ধরতে চেয়েছি। বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়ে যতটা রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতা হয়েছে, ততটা আর কোনো দেশেই বোধহয় হয়নি। ক্রাচের কর্নেল লেখার পেছনে আমার একটা ইন্সপিরেশন ছিল আমাদের ইতিহাসকে তথাকথিত প্রচলিত প্যাটার্নের বাইরে

~ www.amarboi.com ~

বোঝার চেষ্টা–এছাড়া নতুন প্রজন্মের কাছে তাহেরের স্পিরিটটা পৌঁছে দেওয়া। এখন একটা জেনারেশন তৈরি হয়েছে, যাদের সব কিছু পাবার আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু স্যাক্রিফাইস করার মানসিকতা নেই। একটা মানুষের পক্ষে যা কিছু স্যাক্রিফাইস করা সম্ভব, তাহের তার সব করেছেন–ক্যারিয়ার, একটা পা এবং নিজের জীবন। একটা হিসেবি মানুষের চেয়ে একটা ভুল মানুষ আমার কাছে বেশি আকর্ষণীয়, যদি তার মধ্যে স্পিরিটটা থাকে। যদি কারও উদ্দেশ্য থাকে শুধু নিজেকে গোছানো তাহলে সেই মানুষটা আমাকে টানে না। তাহেরের অ্যাসপিরেশন নিজেকে নিয়ে না, পরিবারকে নিয়ে না, তার চেয়ে বড় কিছু নিয়ে। তার রাজনীতি ভুল না শুদ্ধ সেটা নিয়ে তর্ক চলতে পারে। কিন্তু আমি তার স্পিরিটটাকে বুঝবার চেষ্টা করেছি। '৬০-'৭০ দশকে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায়– চীনে, ভারতে, ইন্দোনেশিয়ায়, ল্যাটিন আমেরিকায়, ভিয়েতনামে একটা সাম্যবাদী পৃথিবীর জন্য আন্দোলন হয়েছে। এই সময়টা ছিল তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের বৈষম্যহীন সমাজের স্বপ্ন দেখার কাল।

অমিতা চক্রবর্তী : একটা স্পিরিট নিয়ে আপনি ক্রাচের কর্নেল লিখেছেন। আবার স্পিরিট নিয়ে কিন্তু সাহিত্যে বাণিজ্যও হয়েছে। নকশালদের নিয়ে লেখা উপন্যাসগুলো যদি আমরা দেখি...

শাহাদুজ্জামান : আগেই বলেছি ইতিহাস নিয়ে কাজ করার ঝুঁকি আছে। কেউ কেউ নিজের মতো করে ইতিহাসকে বিকৃত, ভুলভাবে প্রেজেন্ট করেছেন। কেউ কেউ আবার ইতিহাস নিয়ে ব্যবসা করেছে। ইতিহাস নিয়ে কিছু করা আসলে সুতার ওপর হাঁটার মতো। ৭ই নভেম্বরের মতো একটা সময়কে নিয়ে উপন্যাস লেখা ঝুঁকির ছিল। আমি সেই ঝুঁকি নিয়েছি। আমার এটুকু আত্মবিশ্বাস আছে যে ক্রাচের কর্নেলে কোনো তথ্যের ভুল নেই।

অমিতা চক্রবর্তী : তথ্যের ভুল নিয়ে অভিযোগ না। ফিলোসফিক্যাল জায়গা থেকে বিতর্ক আছে।

শাহাদুজ্জামান : এ বিতর্ক থাকবেই। আমার আহ্বান হচ্ছে, আসুন, আমরা সেই সময়টাকে বোঝার চেষ্টা করি। তাহেরের কী ভুল হয়েছে, কেন হয়েছে। সেই সময়টাকে, তাহেরকে বোঝার জায়গা থেকে যদি এই বইটার আবেদন থাকে তাহলে আমি বলব সেটাই যথেষ্ট।

অমিতা চক্রবর্তী : এখন একটা খরা সময় যাচ্ছে। এ জেনারেশন লিখছে না, পাঠকও হচ্ছে না। বয়ানে আহ্বান থাকে–নতুন, কখনও লেখেননি, এমন মানুষও গল্প পাঠাক। বয়ানে এক ডজন গল্প থাকে, তার মধ্যে অন্তত পাঁচটা এমন

~ www.amarboi.com ~

লেখকের, যে আগে লেখেননি। আমরা আসলে বলাতে চাই। আমাদের আগ্রহ শুধু সাহিত্যচর্চা না । আমাদের আগ্রহ লেখক-পাঠক যোগাযোগ ঘটানো, যে যোগাযোগটা একটা কিছু সৃষ্টি করবে, সময়কে প্রভাবিত করবে।

শাহাদুজ্জামান : আপনাদের এই বলাতে চাওয়ার উদ্যোগটা তো খুবই ভালো। আমি মনে করি, যে কোনো ক্রিয়েটিভ কাজ ধ্যানের ব্যাপার। ইনওয়ার্ড লুকিং এর ব্যাপার আছে। আমরা এমন একটা সময়ে পৌঁছেছি যে সেই ধ্যান ভাঙার জন্য নানা রকম ব্যবস্থা আছে! রূপকথায় রাজপুত্রকে বলা হয় তুমি রাজকন্যার কাছে পৌঁছাবার আগে নানা রকম মায়া তোমাকে ডাকবে, কিন্তু সাড়া দেওয়া যাবে না। ক্রিয়েটিভ কাজের পথে পথে মায়া আছে–প্রতিষ্ঠার মায়া, নাম-ডাকের মায়া, পুরস্কারের মায়া। করপোরেটেরা এখন সাহিত্যে ইনভলভড হচ্ছে। ফ্রি মার্কেট ইকোনমির কাজ এটাই–যে কোনো কিছুকে পণ্যে পরিণত করা। করপোরেটেরা সবখানে হাত বাড়াচ্ছে, প্রভাব রাখছে। পুঁজিকে মানবিক করতে সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা–সবখানে হাত রাখছে। এখানে সাহিত্যিকের ভাবনার বিষয় হচ্ছে করপোরেট তাকে নিয়ন্ত্রণ করবে, না কি সে করপোরেটকে নিয়ন্ত্রণ করবে। অনেক শক্তিমান-প্রতিভাবান সাহিত্যিক এর মধ্যে থেকেও নিজেকে বাঁচিয়ে চলেছেন। কথায় আছে না, জলে নামব কিন্তু চুল ভেজাব না। ক্রিয়েটিভিটির দিকে চোখ না থেকে যদি চোখ থাকে পুরস্কারের দিকে, উৎসবের দিকে তাহলে তো আন্তরিক সাহিত্য অর্থাৎ যে সাহিত্যে আমরা নিজেদের দেখতে পাব, আমাদের সময়কে দেখতে পাব, সেই সাহিত্য হবে না। লেখক হতে হলে সমাজভাবুক হতে হবে। রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি বুঝতে হবে। অনেক তরুণের সাথে আমার আলাপ হয়। যাদের ভেতর এমন অনেককেই দেখছি তারা আন্তরিকভাবে ভাবছে এই সময়টা নিয়ে, চারদিকের এত প্রলোভন সত্ত্বেও। যথার্থ সাহিত্য সৃষ্টির নৌকাটা খুব ছোট, সবার জায়গা হয় না। উত্তেজনায় হয়তো কিছুদিন লিখলাম। কিন্তু টিকে থাকা, সত্যিকার অর্থে আনন্দের সাথে লিখে যাওয়াটা জটিল। সাহিত্যে কেউ কাউকে পরামর্শ দিতে পারে না। এটা খুব লোনলি জার্নি। যার যার সংগ্রাম তার নিজের। এখানে ফাঁকির জায়গা নেই। লেখালেখি একটা ধ্যান–আন্তরিকতা ও একাগ্রতা দরকার। চোখ-কান খোলা রাখা দরকার।

অমিতা চক্রবর্তী : ধরুন, রূপকথার মতো রাজকন্যার কাছে পৌঁছে গেলাম। ধরুন, নিষ্ঠার সাথে জীবনমুখী সাহিত্যের চর্চাটা শুরু হলো। তাহলে সংকটের সময়টাকে কি পাল্টাতে পারবে এই সাহিত্য?

শাহাদুজ্জামান : পরিবর্তন আসলে বহুমাত্রিক। একটা লম্বাকালের ক্ষুদ্র একটা সময়ে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। বহুযুগ ধরে পরিবর্তন হয়ে আসছে নানা মাত্রায়। তো এই পরিবর্তনে রাজনীতি যেভাবে ভূমিকা রাখে, সাহিত্য সেভাবে রাখে না।

~ www.amarboi.com ~

ধরুন একটা ছেলে মিছিলে যাচ্ছে, স্লোগান দিচ্ছে, তার এই স্পিরিটটা এসেছে কোনো একটা আইডিওলজি থেকে। সাহিত্য এই স্পিরিটটা দিতে পারে। সাহিত্যের কাজ মানুষের মনটাকে সত্য-সুন্দর-কল্যাণের দিকে ফিরিয়ে রাখা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই সাহিত্য থেকে, বিপ্লব হবে কি না, সাংস্কৃতিক ধারা পরিবর্তন হবে কি না। ইতিহাস বলে যে অতীতে হয়েছে। সাহিত্য পরোক্ষ ভূমিকা রাখে। প্রোপাগান্ডা আর সাহিত্য এক জিনিস না। কার্ল মার্কস সমাজ পরিবর্তনের প্রেরণা পেয়েছেন বালজাক থেকে। সাহিত্যের ভূমিকা সবসময় দৃশ্যমান হয় না, তবে পরিবর্তন নিশ্চিতভাবেই আনে। এদেশে '৪৭ থেকে '৭১ পর্যন্ত ছোট ছোট অনেক পত্রিকা বের হয়েছে। হয়তো মাত্র দুই পাতার পত্রিকা। কিন্তু এই পত্রিকাগুলো এই অঞ্চলের মানুষের স্পিরিটের প্রবাহটা সচল রেখেছে। যেটা ভূমিকা রেখেছে '৭১ এ। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলন বড় ভূমিকা রেখেছে।

অমিতা চক্রবর্তী : ছোট ছোট অনেক পত্রিকা অনেক উদ্দেশ্য, মতাদর্শ, ডাইমেনশন নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। ছোট পত্রিকার একটা অন্যতম বিষয় ছিল প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা। পশ্চিম বাংলায় এটা অনেক ব্যাপকভাবে হয়েছে। আপনি কি মনে করেন এই বাংলায় সেটা হয়েছে?

শাহাদুজ্জামান : সব বিষয়ে কলকাতার সাথে বাংলাদেশের তুলনা করলে চলবে না। কলকাতার প্রতিষ্ঠান অনেক ক্ষমতাবান, ৪০-৫০ বছর ধরে টিকে আছে। আনন্দবাজারের মতো বড় প্রতিষ্ঠান আমাদের এখানে হয়নি। সেখানে শত শত লেখক আছে, অনেক বই বের হচ্ছে। বড় বড় পত্রিকা না থাকলে সেখানে জায়গা করে নেওয়াটা কঠিন। বাংলাদেশে এরকম ম্যাসিভ লেখকগোষ্ঠী নেই। এরকম পাওয়ারফুল প্রতিষ্ঠানও নেই যে লেখককে একদম কিনে ফেলছে। ধীরে ধীরে কিছুটা হচ্ছে এখানে, তবে কলকাতার মতো আগ্রাসী প্রতিষ্ঠান এখানে নেই।

অমিতা চক্রবর্তী : তাহলে কলকাতার ছোট কাগজের আন্দোলন আর এখানকার ছোট কাগজের আন্দোলনের চরিত্রটা আলাদা।

শাহাদুজ্জামান : প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার চেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে সাহিত্যে আমাদের জীবনটাকে আনতে পারছি কি না, সময়টাকে ধরতে পারছি কি না। বড় পত্রিকায় হয়তো এর জন্য স্পেস থাকে না। আমরা ছোট ছোট পত্রিকায় সেটা করতে পারি। সেটাও অনেক বড় কাজ। আর ইন্টারনেটের কারণেও সংগ্রামটা বদলে গেছে। আগে লেখা ছাপা হওয়াটা ছিল বিরাট ব্যাপার। এখন ওয়েব ম্যাগাজিনে যে যার মতো লেখা ছাপছে। আগের লিটল ম্যাগাজিনের যে চরিত্র সেটা আর থাকবে না। বালজাককে কেন মার্কস গুরুত্ব দিয়েছিলেন? কারণ সমাজকে যদি

বুঝতে চাই তাহলে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বোঝার জায়গা সাহিত্য। একটু আগে শুনছিলাম দোকানের মালিক তার কর্মচারীকে একটা কী কিনতে একশ টাকার একটা নোট দিয়েছে। কর্মচারী বলছে– 'এটা ছেঁড়া টাকা। চলব না।' মালিক তখন তাকে বলছে, 'তুই যদি ঢাকা শহরে এই নোট চালাইতে না পারিস, তোকে ঢাকা শহর থেকে বের করে দেওয়া হবে।' ঢাকা শহর সম্পর্কে দারুণ একটা স্টেটমেন্টে। ব্যাপার হচ্ছে যে এখানে টিকতে হলে অচল টাকা চালানোর স্মার্টনেস থাকতে হবে। এই বাক্য সমাজবিজ্ঞান বইয়ে বা রাজনৈতিক বক্তৃতায় পাওয়া যাবে না। পাওয়া যাবে সাহিত্যে। কার্ল মার্কস কেন বালজাক পড়েছেন? ইয়োরোপীয় সোসাইটির প্রাণের ভেতর যে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে সেটা বালজাক দেখিয়েছিলেন, টলস্টয় দেখিয়েছেন রাশান সোসাইটির পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের ডিটেইল টলস্টয়ের সাহিত্যে যেভাবে আছে, তেমন অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান না নীতিশাস্ত্রের বইয়ে নেই। প্রতিষ্ঠান যেন আমাদের গিলে না খায় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে কিন্তু আমাদের সংগ্রামের বড় বিষয় হচ্ছে সাহিত্য আমাদের সময়কে, জীবনকে ধারণ করছে কি না সেটা নিশ্চিত করা।

অমিতা চক্রবর্তী : একটু পিছিয়ে যাই। ক্রাচের কর্নেলে আপনি '৬৯ থেকে '৭৫ কে ধরেছেন। এরপর রাজনীতির অনেক পট পরিবর্তন হয়েছে। '৯০ এ স্বৈরাচার পতন হয়েছে। আরও দুটো দশক পেরিয়ে গেছে। এই সময়ের মধ্যে সাহিত্যে গুণগত বা পরিমাণগত কোনো পরিবর্তন কোনো ভবিষ্যৎকে ইঙ্গিত করছে কি না বা সময়টাকে ধরছে কি না বা আপনি এই সাহিত্যে আস্থা রাখতে পারছেন কি না?

শাহাদুজ্জামান : প্রথম কথা, এই সময়ের লেখকদের সবার লেখা আমি পড়িনি। তাই অবিচার করা হবে আমি যদি সিদ্ধান্ত দিয়ে ফেলি কিছু হচ্ছে কি হচ্ছে না। তবে কারো কারো ভেতর সম্ভাবনা আছে মনে হয়েছে। তবে সাধারণভাবে সময়টাকে আমাদের সাহিত্য ধরতে পারছে তা দৃঢ়তার সাথে বলা যাবে না।

অমিতা চক্রবর্তী : তাহলে এই সময়ে দাঁড়িয়ে আমার পত্রিকা বের করব কেন? আপনার কী মনে হয়? যুক্তিটা কী?

শাহাদুজ্জামান : এর মাধ্যমে কাউকে কাউকে লেখার স্পেসটা দেওয়া। পত্রিকার মতাদর্শের কথা যদি বলেন, তাহলে আপনারা সেই লেখাগুলোই ছাপবেন যেগুলো এই সময়কার প্রশ্ন নিয়ে তাড়িত, এই সময়কে বুঝতে চাচ্ছে।

অমিতা চক্রবর্তী : [illegible] সোসাইটি তো সবখানেই হাত দেবে। তো, যে এই সোসাইটিতে বড় হচ্ছে, সে কিন্তু ভাবছে যে এরা যেহেতু কথা বলতে চায়,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাহলে এই জায়গাটি ব্যবহার করে সে তার গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে। এরা কিন্তু আমাকেও সেভাবে ব্যবহার করতে চাইবে। এটা থেকে উত্তরণের পথ কী?

শাহাদুজ্জামান : আমি আগেও বললাম যে সতর্ক থাকতে হবে। নিরন্ত্রণ নিজেকে প্রশ্নের মধ্যে রাখতে হবে। হয়তো অনেক সময় আমাদের কমপ্রোমাইজ করতে হয় কিন্তু সবসময় সচেতনভাবে ভাবা উচিত কোন জায়গায় কম্প্রোমাইজ করছি, কতটা করছি, কী করে সেখান থেকে উত্তরণ ঘটানো যায়। কিন্তু বিষয়টা যদি উলটো হয়, যদি আমি শুধু ভাবি কীভাবে মানুষের নজরে পড়ব এবং সেই অংক অনুযায়ী কাজ করি তাহলে সেটা হবে লেখকের মৃত্যু।

অমিতা চক্রবর্তী : লেনিন বলেছেন টলস্টয় না থাকলে বিপ্লব হতো না। আবার টলস্টয় বিপ্লবের সময় লেনিনের কাজগুলোকে বিশ্বাস করছিলেন না। লেখকের সাংগঠনিক যুক্ততা কী রকম হবে? সংগঠনের কাজটা কী? সংঘবদ্ধতার জন্য লেখকের নিজস্ব দার্শনিক টেরিটরি আছে কি না?

শাহাদুজ্জামান : খুবই জরুরি প্রশ্ন এবং গভীর আলোচনার দাবি করে। সাহিত্য সৃষ্টি একার যাত্রা, যৌথভাবে হবে না। আমি আগেই বলেছি লেখককে হতে হবে সমাজভাবুক। ব্যক্তিগতভাবে আমি অনেক সংগঠনের ভেতর দিয়ে গেছি। সামাজিক ইমপ্যাক্টের জন্য সমমনা অনেক মানুষ যদি একত্রিত হয় তাহলে নিশ্চয়ই সেটা কাজের। তবে সৃজনশীল মানুষের সাথে বিশেষ করে বাম রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর অভিজ্ঞতা সাধারণভাবে ভালো না। অনেক বাম রাজনীতির সংগঠন শিল্প সাহিত্যকে খুব যান্ত্রিকভাবে দেখেছেন। পাক ভারত উপমহাদেশের বহু প্রতিভাধর শিল্পী সাহিত্যিক কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত হয়েই শেষ পর্যন্ত পার্টির সাথে থাকতে পারেননি–বের হয়ে আসতে হয়েছে, রাজনৈতিক নেতাদের ঐ যান্ত্রিক মানসিকতার কারণে। তবে শিল্পীসাহিত্যিকরা যদি সাংগঠনিকভাবে কাজ করেন তাহলে তার ইতিবাচক ভূমিকা আছে। এই যে আমাদের দেশে শিল্প সংস্কৃতি নিয়ে নানারকম মায়া-প্রলোভন তৈরি হয়েছে সেটা সমমনা কয়েকজন মিলে একসাথে রুখে দেওয়া যায়। দলগতভাবে কাজ করা গেলে ভালো কিন্তু এই সময়ে সেটা জটিল এবং কঠিন হয়ে উঠেছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কথা-সাত

[এই কথোপকথন হয়েছে হারুন পাশার সঙ্গে। হারুন পাশা গল্পকার এবং ঔপন্যাসিক। তিনি 'পাতাদের সংসার' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 'পাতাদের সংসার' শাহাদুজ্জামান সংখ্যা নামে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে যাতে এই সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয় ২০১৮ তে। লেখালেখির প্রণোদনা, ডাক্তারি আর লেখক জীবনের সমন্বয়, গল্প লেখার প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ে কথা হয়েছে এই কথোপকথনে।]

হারুন পাশা : কেন লেখালেখিতে আসা? লিখতেই বা হবে কেন? এই বোধ কেনই বা আপনাক তাড়িত করল?

শাহাদুজ্জামান : তা ঠিক, কেন যে লেখালেখিতে আসা সে এক ধাঁধা বটে। লিখতে হবে এমন কোনো দস্তখত কোথাও দেইনি। না লিখলে আমার ফাঁসি হবে না। তবু অবিরাম লিখছি। এটাকে ডেসটিনি বলে নাকি? জীবন তো রহস্যময়। কে কোন পথে গিয়ে যে পড়বে তার হিসাব রাখা মুশকিল। আমার প্রকৌশলী বাবা চেয়েছিলেন আমি ডাক্তার হই অথচ তিনিই আমার ভেতর অক্ষরের নেশা ধরিয়ে দিয়েছেন। ছোট বেলা থেকে দেখে এসেছি বাবা বই পড়ে, গল্পের বই, কবিতার বই। বই বুকের উপর রেখে ঘুমিয়ে পড়ে। পাওয়ার স্টেশনের বিরাট মেশিন তদারকি করে ফিরে এসে বাবাকে রাতে লুকিয়ে লিখতে দেখেছি। তারপর লুকিয়ে একদিন বাবার সেই লেখার খাতা পড়েছি। অগণিত কবিতা, চমৎকার গদ্যে লেখা গল্প। তারপর প্রকাশ্যেই বাবা আমাকে পড়ে শুনিয়েছে তার গল্প, কবিতা। বাবা লেখক হতে চেয়েছিল। ছোটবেলা থেকে বাবার মাধ্যমেই এমন একটা ধারণা হয়েছে যে বই, অক্ষর, লেখালেখি এসব খুব দরকারি, রহস্যময় ব্যাপার। বাবা লেখক পরিচিতি তৈরি করতে পারেনি। কে জানে আমার ভেতর থেকে বাবার সেই অপূর্ণ লেখক সত্তাই আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নেয় কিনা?

~ www.amarboi.com ~

হারুন পাশা : কেনই বা কথাসাহিত্যে, কবিতা বা নাটকে কেন নয় লেখালেখি?

শাহাদুজ্জামান : স্কুলে থাকতে কিছু কবিতা লেখার চেষ্টা করেছিলাম গোপনে। কাউকে তা কখনো দেখাইনি। সেই শেষ আর কখনো কবিতা লিখবার চেষ্টা করিনি। রাজনীতি, দর্শনের নানা জ্ঞানতাত্ত্বিক তর্ক আমাকে দখল করে বসল। পরবর্তীকালে নিজের জীবনের নানা ঘটনা, কাজের সূত্রে গ্রামে গঞ্জে ঘোরা ইত্যাদির কারণে আমাকে দখল করল মানুষের গল্প। মন সেদিকেই ছুটল। কিন্তু কবিতা পড়া আমি সারা জীবন অব্যাহত রেখেছি। ভালো কবিতার আশ্চর্য বিমূর্ত পৃথিবী, শব্দের তীক্ষ্ণ ব্যবহার আমাকে বরাবর কাবু করে রেখেছে। আমার গল্পেও তাই প্রায়ই তৈরি হয়েছে কাব্য পরিবেশ। আমি শেষ পর্যন্ত ফিরেছি সেই কবির কাছেই যিনি জ্ঞান বিজ্ঞানের তর্ক, গল্প আর শব্দের অনন্য ব্যবহারে আমাকে আছর করে রেখেছেন। আমি নিজে কবিতা লিখিনি কিন্তু বিশ্ব সাহিত্যের অন্যতম এক কবিকে নিংড়ে বুঝতে লিখেছি একটা গোটা বই। আমি জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে লেখা আমার 'একজন কমলালেবু' বইটার কথা বলছি। কবিতা লিখি না ঠিক কিন্তু কবিতা চোরাগোপ্তাভাবে হাজির থাকে আমার গল্পে, উপন্যাসে। নাট্যদলের সাথে যুক্ত ছিলাম, নাটকে অভিনয়ও করেছি। কিন্তু নাটক লেখার চেষ্টা করিনি। নাটক লেখার ব্যাপারটা আমার ঠিক সহজাতভাবে আসেনি। তবে নাটক লেখার ইচ্ছা যে নেই তা না। আমার লেখার উপর ভিত্তি করে অবশ্য অন্যরা মঞ্চ নাটক লিখেছে। সুবচন নাট্যদল আমার 'ইব্রাহিম বক্সের সার্কাস' গল্প থেকে নাটক করেছে। ক্রাচের কর্নেলের নাট্যরূপ দিয়েছে বটতলা নাট্যদল। এছাড়া কিছু টিভি নাটকও হয়েছে।

হারুন পাশা : প্রথম গল্পটি কবে প্রকাশিত হয়? সেই গল্প প্রকাশ বিষয়ে জানতে চাই।

শাহাদুজ্জামান : আমার প্রকাশিত প্রথম গল্প 'জ্যোস্নালোকের সংবাদ' এটি প্রকাশিত হয়েছিল সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সম্পাদিত 'সাহিত্যপত্র' পত্রিকায়, সম্ভবত ১৯৮৬ সালে। আন্ডারগ্রাউন্ড বাম রাজনীতি করা এক ছেলে এবং গ্রামে তার এক প্রেমিকার কথা নিয়ে গল্প। আমি তখন নিজে বাম রাজনীতির ব্যাপারে আগ্রাহী, মার্ক্সবাদ, বিশ্ব বিপ্লব ইত্যাদি ব্যাপারে কৌতূহলী। ঐ গল্পে বাম রাজনীতি করা ছেলেটির জেল হয়, জেল থেকে রেরিয়ে এলে গ্রামে অনেকদিন পর দেখা হয় তার প্রাক্তন প্রেমিকার সঙ্গে। প্রেমিকার তখন বিয়ে হয়ে গেছে, গর্ভবতী সে। পুকুর ঘাটে এক জ্যোৎস্না রাতে দেখা হয় তাদের। গল্পটি শেষ হয় মেয়েটির এক সংলাপে। মেয়েটি ছেলেটিকে বলছে, 'মঞ্জু ভাই খিয়াল করিছেন, আপনি গিরামে আলেই আকাশে খুব জোছনা হয়।' আসলে এই শেষ সংলাপটাই আমার

~ www.amarboi.com ~

গল্প লেখার সূত্র। আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে তার এক অনুরাগিনী এই কথাটা বলেছিল। খুব পাওয়ারফুল সংলাপ। আমার সে বন্ধু কোনো বিপ্লবী নয়। তবে তার কাছে ঐ সংলাপটা শুনবার পরই আমি ঠিক করি এই সংলাপটা ব্যবহার করে আমি একটা গল্প লিখব। বলা যায় ঐ সংলাপটা ব্যবহার করতেই পুরো গল্পটা লিখি। আমি ব্যক্তিগত প্রেম তার সঙ্গে বিপ্লব এসব মিলিয়ে একটা বড় প্রেক্ষাপটে সংলাপটাকে স্থাপন করি। গল্পটা যখন লিখি আমি তখন চিটাগাং মেডিকেলের ছাত্র। গল্পটা ডাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর নামে সাহিত্যপত্র পত্রিকার ঠিকানায়। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সাথে কোনো ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। সংবাদে প্রকাশিত তার 'সময় বহিয়া যায়' কলামটা আমার প্রিয় ছিল। কিছুদিন পরেই সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর নিজের হাতে লেখা একটা চিঠি পাই। তিনি লেখেন গল্পটা তার পছন্দ হয়েছে এবং তিনি এটি ছাপবেন। সাহিত্যপত্র পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় গল্পটা ছাপা হয়েছিল। তারপর তিনি মানি অর্ডার করে গল্পের সম্মানী বাবদ একশ টাকাও পাঠিয়েছিলেন। সেটা আমার গল্প লিখে প্রথম রোজগার। পরে তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে এবং অনেক সময় তার সঙ্গে আড্ডা দিয়ে কাটিয়েছি। এরপর আমার দ্বিতীয় গল্প ছাপা হয় প্রায় ছয় বছর পর, ১৯৯২ তে, 'অগল্প' নামে সেই গল্প ছাপা হয় 'ভোরের কাগজ'পত্রিকায়। তবে এই গল্পটা কিন্তু লিখেছিলাম আগে। আমার প্রথম ছাপা গল্প 'জ্যোৎস্নালোকের সংবাদ' হলেও আমার প্রথম লেখা গল্প হচ্ছে 'অগল্প'।

হারুন পাশা : ডাক্তারি করতে এসে লেখায় জড়ালেন, আর জড়ালেন এমন করে যে নিজের একটি অবস্থান তৈরি করেছেন ইতোমধ্যে, তৈরি হয়েছে অনেক পাঠক, সরে আসারও পথ বন্ধ, ডাক্তারি ও লেখালেখি বিষয়ে জানার আগ্রহ।

শাহাদুজ্জামান : খুব পরিকল্পিতভাবে ডাক্তারি পড়তে আসিনি। আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারে সেসময় একটা গৎবাধা চল হচ্ছে ছেলে ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে। আমি ক্যাডেট কলেজে পড়েছি, ভালো রেজাল্ট ছিল, ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ার যে কোনোটাই পড়তে পারতাম। আমি পরিবারের বড় ছেলে আব্বা তো ইঞ্জিনিয়ার, আব্বা বলল ডাক্তারি পড়ো। আমাদের সময় তো ক্যারিরার প্ল্যানিং বলে বিশেষ কিছু ছিল না। আমার আগ্রহ ছিল সোসাল সাইন্স কিছু একটা পড়ার। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ইকোনমিক্সে ভর্তি হবার ফরমও এনেছিলাম। ইতোমধ্যে মেডিকেলের জন্যও এ্যাপ্লাই করলাম। মেডিকেলে ভর্তির ফল আগে বেরিয়ে গেল। ভর্তি হবার সুযোগ পেলাম চিটাগাং মেডিকেল কলেজে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির তখনও দেরি। আব্বা বলল মেডিকেলে চান্স পেয়েছ ভর্তি হয়ে যাও দেরি করার দরকার কী? খুব যে জোরজোরি করল তা না। কী পড়ব এটা নিয়ে আমারও বিশেষ জোর কোনো প্ল্যান ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি

~ www.amarboi.com ~

তখনও দেরি ফলে ভর্তি হয়ে গেলাম ডাক্তারি পড়তে। মেডিকেল কলেজে প্রথম বছরটা বেশ উপভোগই করলাম। লাশ কাটাকাটি, এ্যাপ্রন পরা এসব নিয়ে বেশ একটা উত্তেজনা। ক্যাডেট কলেজের রেজিমেন্টেড জীবন থেকে বেরিয়ে মুক্ত এক জীবন, ছেলে মেয়ে সব একসাথে পড়ছি এসব বেশ উপভোগ করছি। কিন্তু দ্বিতীয় বছর থেকেই আমার মনে হতে থাকে টিপিক্যাল ডাক্তারের জীবন যাপন সম্ভবত আমাকে দিয়ে হবে না। আমি তখন মেডিকেল কলেজের নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত। গান করি, আবৃত্তি, বিতর্ক করি। নানা দিকে আগ্রহ। ডাক্তারি পড়ায় মন বসে না। আমার কাছে শিল্প সাহিত্যের এই কর্মকাণ্ড নেহাত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড আর থাকে না । আমি ক্রমশ এসব ব্যাপারে আরো সিরিয়াস হতে থাকি। গ্রুপ থিয়েটারে যোগ দেই, চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনে খুব সক্রিয় হয়ে উঠি, কজন মিলে 'প্রসঙ্গ' নামে একটা সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করি। ডাক্তারি পড়া থেকে আমার মন উঠে যায়। জীবনের নানা বিষয়ে কৌতূহলকে চেপে রেখে শুধুমাত্র ডাক্তারি পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করতে মন সায় দেয় না কিছুতেই। চিটাগাং মেডিকেল কলেজে এনাটমির বড়ুয়া স্যার নামে একজন নামজাদা শিক্ষক ছিলেন তখন। তিনি একদিন আমাকে ডেকে বলেন, 'তোমার ঝোঁক, সহজাত ক্ষমতা শিল্প সাহিত্যের ভেতর তুমি ডাক্তারি পড়ে সময় নষ্ট না করে ঐ ধরনের কোনো বিষয়ে পড়াশোনা করো। এখনও সময় আছে তুমি অন্য কোথাও ভর্তি হও।' আমিও মনে মনে সেরকমই ভাবছিলাম। আমি সত্যি সত্যি মেডিকেল পড়া ছেড়ে দেবার কথা ভাবি। নানা বিকল্প ভাবতে থাকি। কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য পড়ার খোঁজ খবর করি, মাঝে ফিল্ম নিয়ে পড়ার ঝোঁক উঠে, মস্কো ফিল্ম ইন্সটিউটে ভর্তির আয়োজন প্রায় সম্পন্ন হয়েছিল, তখন রাশান কালচারাল সেন্টারের সেক্রেটারি ছিল আদ্রেই কাদেরেলিয়েভ, তার সাথে বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছিল চিটাগাং-এ একটা রুশ চলচ্চিত্র উৎসব করার সূত্রে। তো তিনি আমার মস্কো ফিল্ম ইন্সটিটিউটে ভর্তির ব্যাপারে সাহায্য করছিলেন। আমার পরিবারের সাথে এনিয়ে মন কষাকষি শুরু হয়। মধ্যবিত্ত পরিবারের বড় ছেলে আমি স্বভাবতই এসব পাগলামির অনেক কনসেকুয়েন্সেস আছে। আমার আব্বা, আম্মার সাথে সেসময়ে লেখা চিঠিপত্র আছে আমার কাছে তাতে সেসব সময়ের দ্বন্দ্বগুলো আছে। তারাও আমার মানসিক অবস্থাটা বুঝতে পারছিল। যাহোক, আব্বা বলল, ডাক্তারি করার দরকার নাই শুধু ডিগ্রিটা নাও তারপর তোমার যা মনে চায় কোরো। ওদিকে মস্কো ফিল্ম ইন্সটিটিউটের ভর্তিটাও পিছিয়ে গেল। তারপর আবার বছর গ্যাপ দিয়ে মেডিকেল পড়ায় মন দেই। মনে আছে পাস করার পর আমার মেডিকেল সার্টিফিকেটটা আব্বাকে পোস্ট করে পাঠিয়েছিলাম এই লিখে–এই কাগজটা তোমার জন্য। যাহোক সেসব অনেক কাহিনি। আসলে আমার ভেতরে ক্রিয়েটিভ আর্জটা তখন তীব্র হয়ে উঠেছিল ।

~ www.amarboi.com ~

শিল্পকে জীবনের চেয়ে বড় করে দেখতে শুরু করেছিলাম। ক্রিয়েটিভিটির ঘোরের ভেতর যারা পড়ে তাদের এসব হয়। আমি পরে ঠিক প্রচলিত অর্থে চেম্বারে বসে ডাক্তারি করিনি। ব্র্যাকের গ্রামীণ স্বাস্থ্য প্রকল্পে ডাক্তার হিসেবে কাজ করেছি। গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি, স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রজেক্ট তত্ত্বাবধায়ন করেছি। পরে জনস্বাস্থ্য, চিকিৎসা নৃবিজ্ঞান নিয়ে বিদেশে পড়াশোনা করলাম। স্বাস্থ্য গবেষণা আর শিক্ষকতায় যোগ দিলাম। ডাক্তারি পড়াতে এসব ক্ষেত্রে আমার সুবিধা হয়েছে। মেডিকেল সাইন্স আর সোসাল সাইন্সকে সমন্বিত করতে পেরেছি। এই পেশার কারণে বাংলাদেশে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরবার সুযোগ পেয়েছি। মানুষকে অনেক কাছ থেকে দেখতে পেরেছি। এই পেশার কারণে পৃথিবীর নানা দেশে যাবার সুযোগ হয়েছে আমার। এসব শেষমেশ আমার লেখাকেও নানাভাবে সাহায্য করেছে। আমি সেই অর্থে হাসপাতালে রোগী দেখি না। দেখলে হয়তো ভালোই হয়তো কিন্তু আমি হয়তো লেখার এত সময় পেতাম না। ডাক্তারি পেশার সাথে তাই একটা দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক আছে আমার। একসময় বিশ্বসাহিত্যের অনেক ডাক্তার লেখকের খোঁজ পেয়ে মনে ভরসা পেয়েছি। চেকভ, সমরসেট মম, বালগাকভ ডাক্তার ছিলেন। বাংলাসাহিত্যে বনফুল নামজাদা লেখক যিনি নিয়মিত ডাক্তারিও করতেন। বাংলাদেশেও তো এখন বেশ কজন ডাক্তার কথাসহিত্যে সক্রিয় আছে। মামুন হুসাইন, জাকির তালুকদার, তসলিমা নাসরিন প্রমুখেরা তো ডাক্তারি পড়েছেন। যাহোক, আমি আমার ডাক্তারি পড়াটাকে অন্যভাবে ব্যবহার করেছি। আমি চেম্বারে বসে রোগী দেখি না কিন্তু যারা রোগী দেখবে তাদের জনস্বাস্থ্য বিষয়ে পড়াই, আমি স্বাস্থ্যনীতি নিয়ে গবেষণা করি, আমি বিশ্বস্বাস্থ্যের রাজনৈতিক, অর্থনীতি নিয়ে গবেষণা করি, পৃথিবীর নানা দেশের ছাত্রদের আমি তৃতীয় বিশ্বের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে পড়াই, আমি বাংলাদেশের হাসপাতালের উপর গবেষণা করেছি। ডাক্তার হবার কারণে এই গবেষণা, শিক্ষকতা আমার জন্য আরো তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে। শিক্ষকতা করে, গবেষণা করে লেখার সময় পাওয়া যায়। ফলে জীবন আর জীবিকার একটা সমন্বয় করা যাচ্ছে। আমি আমার পেশাটাকে এমনভাবে তৈরি করার চেষ্টা করেছি যাতে আমি লেখালেখি করতে পারি। লেখালেখি থেকে সরে আসবার তো প্রশ্ন আসে না।

হারুন পাশা: গল্পটা আপনার ভেতর কীভাবে তৈরি হয়? তারপর পৃষ্ঠাবন্দি হওয়া।

শাহাদুজ্জামান : আমার লেখক সত্তা সবসময় সক্রিয় থাকে। সমান্তরালে দুটা জীবন যাপন করি বলা যায়। চাকরি বাকরি, সংসার, বাজার ঘাট সব চলছে কিন্তু এর ভেতরই সবসময় জেগে থাকে লেখকের মন। কোনো দৃশ্য, পথে দেখা কোনো চরিত্র, ঘরের ভেতরেরই হঠাৎ একটা কোনো সংলাপ, কোনো একটা ছবি, কোথাও পড়া কোনো লাইন নতুন আভা নিয়ে ধরা দেয়, তার ভেতর একটা গল্পের সম্ভাবনা দেখা দেয়। আমাকে আকর্ষণ করে আইডিয়া। বৃহত্তর কোনো ভাবনা।

~ www.amarboi.com ~

একটা দৃশ্য, চরিত্র, সংলাপকে গল্পের ভেতর দিয়ে বড় কোনো আইডিয়ার সাথে যুক্ত করবার চেষ্টা চলে তখন। ক্যামেরার জুম ইন থেকে জুম আউট করার মতো।

হারুন পাশা : লিখেন কখন?

শাহাদুজ্জামান : ব্রিটেনের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করি আমি, বিশ্ব স্বাস্থ্য বিষয়ে গবেষণা করি। এসব কাজের দাবি অনেক। আমার লেখার কাজ তাই রাতে আর ছুটির দিনে। আমি প্রায় প্রতি রাতে ঘণ্টা খানেক লিখতে বসি। লেখা আমার রাতের চাকরি। এই চাকরির আমিই আমার নিয়োগ কর্তা। এর বেতনের কোনো গ্যারান্টি নেই। যখন বড় কোনো লেখার ভেতর থাকি তখন সাপ্তাহিক ছুটির দিনের টানা সাত আট ঘণ্টাও লিখি। তাছাড়া বিশ্বস্বাস্থ্যের কাজের সূত্রে আমাকে নানা দেশে যেতে হয়, বিমানের লম্বা জার্নিতেও আমি লিখি।

হারুন পাশা : ব্র্যাকে কাজ করার সময় মানুষের বিচিত্র জীবন দেখার সুযোগ পেয়েছেন, এই দেখাই কী সাহিত্যে প্রতিফলিত হচ্ছে?

শাহাদুজ্জামান : ব্র্যাকে গ্রামীণ স্বাস্থ্য প্রকল্প ডাক্তার হিসেবে কাজ করতে গিয়ে আমার বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রত্যন্ত গ্রামে ঘুরবার সুযোগ হয়েছে। গ্রামের জীবনকে নিবিড়ভাবে দেখতে পেরেছি। আমি শহরে বেড়ে উঠা মানুষ। ব্র্যাকের কাজের সূত্রে খুব কাছ থেকে গ্রামের জীবনকে দেখার এই সুযোগ আমার একটা দারুণ পাওয়া। সাধারন মানুষের জীবনের সংগ্রাম সাথে সাথে অসাধারণ সব সৃষ্টিশীলতায় অবাক হয়েছি আমি। গ্রামের প্রেক্ষাপটে যে গুল্পগুলো লিখেছি তাতে সেসময়কার গ্রামীণ অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন আছে। তাছাড়া শহর বা মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে লিখলেও বাংলাদেশের বিরাট জনগোষ্ঠীর ঐ জীবনটাও বরাবর আমার চোখের নিচে ফুটে থাকে। যে কাজই করি, যে লেখাই লিখি না কেন দেশের ঐ বৃহত্তর বাস্তবতাটা মনের ভেতর জমা রাখা দরকার বলেই মনে করি। আমরা শুধু বইপত্র পড়ে, নাগরিক পরিমণ্ডলে নিজের শ্রেণি, সংস্কৃতির মানুষজনের সাথে গল্প আড্ডা দিয়ে, টিভি, পত্রিকা আর অনলাইনের ভেতর দিয়ে জীবনটাকে দেখলে সেটা খুবই খণ্ডিতভাবে দেখা হবে জীবনকে। সেটা খুবই বিপজ্জনক।

হারুন পাশা : লেখায় নিজের স্বাতন্ত্র্য কীভাবে প্রকাশিত আপনার বিবেচনায়...পাঠক-সমালোচক তাঁদের মতো করে তো বিচার করবেন-ই, তবুও জানতে চাওয়া।

শাহাদুজ্জামান : পৃথিবীতে শত কোটি মানুষ থাকলেও আমার নিজের জীবনটা, আমার দেখবার ধরনটা তো স্বতন্ত্র। আমি আমার মতো করে যখন সেই দেখাটাকে লেখায় তুলে আনব তখন তার একটা স্বতন্ত্র চেহারা তো থাকবেই।

~ www.amarboi.com ~

আমার সেই স্বাতন্ত্র্যের চরিত্রটা কেমন, সেটা পাঠক বিচার ব্যাখ্যা করবেন। আমি দেশের বা বিশ্ব সাহিত্যের বিস্তর লেখকদের লেখা পড়েছি কিন্তু কখনো কারো মতো লিখতে চাইনি। নিজের কথাটা নিজের মতো লিখতে চেয়েছি। আমার কতগুলো প্রবণতা কথা হয়তো বলতে পারি। আমার একটা মাল্টিডিসিপ্লিনারি আগ্রহ আছে। আমি চলচ্চিত্র, নাটক, গান, চিত্রকলার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলাম, অন্য মাধ্যমের প্রভাব আমার লেখায় আছে। আমি স্থানীয় বিষয়কে সব সময় বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে দেখবার চেষ্টা করেছি, ভাষাকে আমি শুধু কাহিনি বয়ানের হাতিয়ার মনে করি না। ভাষার দিকে, উপস্থাপনের দিকে আলাদা করে নজর দেই।

হারুন পাশা : লিখতে লিখতে ক্লান্ত হয়েছেন কখনো?

শাহাদুজ্জামান : না লিখতে লিখতে আমি কখনো ক্লান্ত হয়নি। লেখা আমার জীবন যাপনের পুষ্টির মতো। লিখতে বসলে আমি চাঙ্গা হয়ে উঠি।

হারুন পাশা : আপনি জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে লিখলেন অন্য এক গল্পকারের গল্প নিয়ে, আবার কয়েকটি কমলালেবু, জীবনানন্দ প্রীতি বিষয়ে জানতে চাই।

শাহাদুজ্জামান : জীবনানন্দের লেখক সত্তা আমাকে দখল করে আছে বহু বছর। একজন আপাদমস্তক লেখক বলতে যা বোঝায় তিনি তাই। ভাবনায়, আবেগে, জ্ঞানে অসাধারণ মেধাবী মানুষ। তার সামাজিক দক্ষতা সে তুলনায় খুবই সামান্য। ফলে সামাজিক জীবন, ব্যক্তি জীবনে বিপর্যস্ত তিনি। তাকে নিয়ে আমি দীর্ঘদিন ধরে একটা বই লিখবার কথা ভেবে এসেছি। অনেকদিন গবেষণা করেছি। *একজন কমলালেবু* নামে সেই বইটা শেষ পর্যন্ত লেখা হলো। অনেক সময় দিয়েছি আমি লেখটার পেছনে। বইটি নিয়ে ইতোমধ্যে বিস্তর আলাপ আলোচনা হয়েছে। আমিও এ নিয়ে আমি বেশ কতগুলো লেখা লিখেছি। এ বইয়ে জীবনানন্দের জীবনকে আমার মতো পুনর্নির্মাণ করে তার নিকটবর্তী হতে চেয়েছি আমি, এই টুকুই বলতে পারি।

হারুন পাশা : ক্রাচের কর্নেল বিষয়ে কিছু বলেন। এটি নিয়ে তো মঞ্চনাটকও হয়েছে।

শাহাদুজ্জামান : ক্রাচের কর্নেল নিয়ে আমি অনেকগুলো লেখা লিখেছি, অনেক সাক্ষাৎকারে বলেছি। যে কথাটা আমি বারবার বলেছি তা হলো এই যে আমার গল্পের প্রধান চরিত্র হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বাপর নাটকীয় সময়কাল। আমি সেই সময়টাকে ধরতে চেয়েছি কর্নেল তাহেরের মতো প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাসে উপেক্ষিত একজন চরিত্রের মাধ্যমে। তার রাজনীতি নিয়ে নানা বিতর্ক

~ www.amarboi.com ~

আমরা করতে পারি কিন্তু আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ তার ভেতরের স্পিরিটটি। একটা আত্মকেন্দ্রিক, আত্মপ্রেমের যুগের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি আমরা সেসময় তাহেরের একটা আদর্শের জন্য যাবতীয় রকম আত্মত্যাগের নমুনাগুলো আমাকে আনুপ্রাণিত করে। আগেই বলেছি ঢাকার বটতলা নাট্যদল এই উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছে। নাটকটি ইতোমধ্যে দর্শকপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এধরনের একটি উপন্যাস থেকে নাট্যরূপ দেখা চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার। বটতলা এই চ্যালেঞ্জ সাফল্যের সাথেই মোকাবেলা করেছে। তাদের অভিনন্দন।

হারুন পাশা : আপনার গল্প সংক্রামক। ভাষায়, পাঠককে জারিত করে...আপনি একমত? এত কম গল্প কেন?

শাহাদুজ্জামান : আমার গল্প যদি পাঠককে জারিত করে সেটা তো আমার জন্য আনন্দের সংবাদ। আমার একমত হওয়া না হওয়াতে কী এসে যায়। একটা গল্পের ভাবনা মনের ভেতর জাগলে সেটাও অনেকদিন বয়ে বেড়াই, মনের ভেতর থিতু হতে দেই, সেটার ভেতর ডুব দিয়ে তলায় বসে থাকি। তারপর একসময় লিখি। ফলে তাড়াতাড়ি অনেক গল্প লেখা সম্ভব হয় না। গল্পটা ভালো মতো লিখতে চাই তাতে সংখ্যা কত দাঁড়ালে সেদিকে নজর দিই না।

হারুন পাশা : আমার মনে হয় আপনি বিশ্ব পাঠক, গল্পে সেই বোধের আভাস পাওয়া যায়..

শাহাদুজ্জামান : লিখতে হলে তো পড়াটা বাধ্যতামূলক। একটা ভালো লাইন লিখতে হলে একশটা ভালো লাইন পড়তে হয়। পড়তে পড়তেই সাহিত্যের ভালো মন্দের বোধটা তীক্ষ্ণ হয়। সাহিত্য করতে হলে শুধু সাহিত্য পড়লে লাভ নেই। আমি মনে করি একজন লেখককে বিশ্ব ভাবুক হতে হবে। রাজনীতি, ইতিহাস, দর্শন, আর বিজ্ঞানের প্রধান ভাবনাগুলোর সাথে পরিচয় থাকা খুব জরুরি। লেখক রসকাণ্ডের মানুষ কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডে তার বিচরণ থাকা উচিত। পণ্ডিত হওয়ার দরকার নেই কিন্তু বিশ্ব ভাবনার মূল প্রবণতাগুলো সম্পর্কে একটা ধারণা থাকা দরকার, তাতে দৃষ্টিটা স্বচ্ছ হয়। এতে করে বোকা বোকা লেখার ঝুঁকি কমে আসে। আবার সাহিত্য জ্ঞান ফলানোরও জায়গা নয়। লেখার সময় সম্যক জ্ঞানগুলোকে প্রেক্ষাপট হিসেবে মাথায় রাখা দরকার বলে মনে করি। আমার একজন কমলালেবু বইটাতে দেখবেন জীবনানন্দ দাশ জানাচ্ছেন কী করে আইনস্টাইনোর থিয়োরি অব রিলেটিভিটি তার কবিতা ভাবনাকেও প্রভাবিত করেছে। কথা ঠিক যখন যতটুক সময় পাই আমি অবিরাম পড়ার ভেতর থাকি। আমি সব রকম বিষয়ে পড়ি। শুধু জ্ঞান বিজ্ঞানের বইই যে পড়ি তাতো, ওদিকে আবার চটি বই,

~ www.amarboi.com ~

লিফলেট, ফ্যাশন ম্যাগাজিন এসবও পড়ি। আমি মনে করি পপুলার কালচারের ধারণা থাকাটাও খুব প্রয়োজন লেখকের জন্য।

হারুন পাশা : যারা ভালো গল্প লিখতে চায় তাদের উদ্দেশে আপনার বক্তব্য..

শাহাদুজ্জামান : অন্যকে পরমর্শ দেয়াটা কঠিন। যার যার সংগ্রাম, চর্চার ধরন আলাদা। তবে মনে মনোযোগটা লেখার দিকেই থাকা উচিত। লেখা কী হচ্ছে সে ব্যাপারের চেয়ে যে কোনো মূল্যে লেখক পরিচয় পাবার একটা উদগ্রীব বাসনা থাকে অনেকের। তড়িঘড়ি বই বের করার উত্তেজনা থাকে। সেটা যার যার প্রবণতা। আমি মনে করি সত্যিকার জীবনের গভীরে গিয়ে শব্দ দিয়ে তাকে তুলে আনবার যে সংগ্রাম আর আনন্দ এর সঙ্গে আর কোনকিছুর তুলনা নাই। সে আনন্দের কাছে নাম ডাক পুরস্কারের মূল্য সামান্য। লেখার আশ্চর্য আনন্দের ভেতর ডুব দিতে শেখা দরকার। সৎ, পরিশ্রমি আন্তরিক লেখাকে পাঠক পাঠিকা খুঁজেই নেয়। আমার নিজের ব্যাপারে বলতে পারি প্রায় বছর দশেক পত্রপত্রিকায় লেখালেখির পর বই বেরিয়েছে আমার। আমার কোনো বইয়ের কখনো মোড়ক উন্মোচন হয়নি, আমার বইয়ের কোনো ভূমিকা কেউ কখনো লিখে দেয়নি। আমি কোনদিন কোনো অগ্রজ লেখককে আমার বই নিয়ে আলোচনার জন্য অনুরোধ করেনি। আমি লিখে গেছি, ধীরে ধীরে আমার একটা পাঠক গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। সাহিত্য তো একশ মিটার দৌড় নয় এটা ম্যারাথন রেস বলেই মনে করি। দম রেখে দীর্ঘ পথ চলাটাই সাহিত্যের বড় চ্যালেঞ্জ। একটা দুটা ভালো লেখা লিখে আত্মতৃপ্ত হয়ে বসে থাকার সুযোগ নেই। সাহিত্য এই বিলাসিতার সুযোগ দেয় না।

হারুন পাশা : বিদেশে তো বেশি সময় যাপন করছেন, সেসময় বাংলাদেশ বিষয়ে আপনার বোঝাপড়া কেমন?

শাহাদুজ্জামান : আমি পড়াশোনার সূত্রে চার পাঁচ বছর থেকেছি নেদারল্যান্ডের আমাস্টার্ডামে, তারপর বিশ্বস্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করি বলে পৃথিবীর সব কটি মহাদেশের ভ্রমণ করার সুযোগ হয়েছে। আর এখন ব্রিটেনে আছি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সূত্রে। তো বিদেশে সে অর্থে অনেকদিনই জীবন যাপন করেছি। আজকের এই বিশ্বয়নের যুগে দেশ বিদেশের বিভেদ তো ঘুচেছে অনেক। আমার অভিজ্ঞতায় বলতে পারি বিদেশ আসবার কারণে, এখানে থাকবার কারণে বাংলাদেশকে নানা নতুন মাত্রায় বুঝতে, চিনতে পেরেছি। পশ্চিমা দেশ সম্পর্কে নানারকম মিথ আছে বাংলাদেশে। এখানে এসে থাকতে থাকলে এদের ভেতরের চেহারাটা ভালোভাবে বোঝা যায়। এদের ক্ষয়ের চেহারাটা দেখা যায়। পোস্ট কলোনিয়াল বোঝাপড়া থেকে ইয়োরোপের আধুনিকতার সীমাবদ্ধতার ব্যাপারটা

~ www.amarboi.com ~

তো জানা ছিলই । এখানে এসে নিজের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে সেসব সীমাবদ্ধতাগুলো টের পেয়েছি। পশ্চিমা দেশের একটা বাহ্যিক চাকচিক্য আছে, যে চাকচিক্যের পেছনে তাদের দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শোষণের ব্যাপারের সম্পর্ক আছে। এখন পশ্চিমা দেশ তো অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতি, নৈতিক দিক থেকে কাবু হয়ে আছে। চীন, ভারত, ব্রাজিল এসব তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো এখন এগিয়ে যাচ্ছে। বিদেশে আসবার কারণে আমি বাংলাদেশের শক্তির জায়গাগুলো আরো বেশি করে টের পেয়েছি। একথা বলার মাধ্যমে আমি বাংলাদেশের দারিদ্র্য, বিশৃংখলা, দুর্নীতির গুণগান করছি না। এসব সবই আছে কিন্তু আমাদের অপার শক্তির জায়গাও আছে। পশ্চিমাদের দিকে তাকিয়ে থাকলে সেই শক্তির জায়গাগুলো চিহ্নিত করা যাবে না। আমাদের নিজেদের দিকে আরো গভীরভাবে তাকাতে হবে, আমাদের শক্তির জায়গাগুলো চিহ্নিত করা দরকার। বিদেশে অবশ্যই আসতে হবে কিন্তু এখানে এসে কেবল মুগ্ধ হয়ে থাকবার কিছু নেই, হীনমন্যতায় ভুগবার কিছু নাই। যারা বিদেশে থাকেন তারা প্রায় সময়েই নিজেদের সফল এবং সুখী প্রমাণের জন্য এখানকার জীবনের নানা নেতিবাচক দিকগুলো দেশের মানুষকে বিশেষ বলতে চান না। এদের ভালো ব্যাপারগুলো থেকে শিখবার আছে কিন্তু এদেরকে ক্রিটিক্যালিও দেখতে হবে। যারা অন্য দেশে এসেছেন তারা সেই দেশে তার শ্রম মেধা দেবেন, সেই দেশে কনস্ট্রিবিউট করবেন সেটা তো ঠিক আছে কিন্তু বিদেশে এসে মৌমাছির মতো এদের মধুটা নিজের দেশে ফিরে নিয়ে যাবারও প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। আমি দীর্ঘসময় বিদেশে থাকলেও আমার কর্মকাণ্ড মূলত বাংলাদেশ কেন্দ্রিক। আমার লেখালেখির মাধ্যমে, গবেষণার মাধ্যমে, তাছাড়া আজকালকার ভার্চুয়াল জগতের কারণে আমি বাংলাদেশের সাথে সব সময়েই যুক্ত। আমার শরীর বিদেশে থাকলেও, মন সবসময় দেশে। সাংস্কৃতিকভাবে মানুষ মাইগ্রেট করতে পারে বলে আমি মনে করি না। ফলে আমি যেখানেই থাকি বাংলাদেশই আমার ভাবনার জগৎ। আর বিশ্বসাহিত্যের বহু লেখক তো তার নিজের দেশের বাইরে বসেই সাহিত্য চর্চা করেছেন। মার্কেজ ম্যাক্সিকোতে বসেই সারা জীবন কলাম্বিয়ার জীবন নিয়ে লিখে গেছেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তার শ্রেষ্ঠ লেখাগুলো বিদেশের মাটিতে বসেই লিখেছেন। চেক লেখক মিলান কুন্ডেরাকে নির্বাসিত জীবন কাটাতে হয় ফ্রান্সে। সে হিসেবে আমি তো বেশ ভালো আছি। সারা বছরই বাংলাদেশে আসা যাওয়া করি।

হারুন পাশা: লেখা নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?

শাহাদুজ্জামান : সম্প্রতি 'একজন কমলালেবু' লিখে শেষ করলাম। এটা অনেকদিন ধরে লেখা পরিশ্রমী একটা কাজ। একটু দম নিচ্ছি আর একটা নতুন

~ www.amarboi.com ~
উপন্যাসের পরিকল্পনা করছি। বাংলাদেশের সমসাময়িক জীবনকে নিয়ে একটা উপন্যাসের পরিকল্পনা করছি। বাংলাদেশ তো বড়সড় ট্রান্সফর্মেশনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। মূল্যবোধ, আইডেন্টিটি এসবের একটা বিবর্তন হচ্ছে। ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে এসবের নানা অভিঘাত হচ্ছে। এসব নিয়েই একটা উপন্যাস লেখার প্রস্তুতি নিচ্ছি। আর ফাঁকে ফাঁকে ছোট গল্প লিখছি। বেশ কয়টা গল্প ইতোমধ্যে লিখছি। এছাড়া প্রথম আলোতে আমি একটা কলাম লিখি। সেটাও চালিয়ে যাচ্ছি। শুরুতেই বলছিলাম কাউকে দস্তখত দেইনি যে লিখতে হবে কিন্তু টের পেয়ে গেছি যে না লিখে আমার মুক্তি নাই।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কথা-আট

[এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন আলতাফ শাহনেওয়াজ । আলতাফ শাহনেওয়াজ কবি এবং সাংবাদিক। আমার গল্পের বই 'মামলার সাক্ষী ময়না পাখি' বইটি ২০১৯ সালে 'প্রথম আলোর বর্ষসেরা বই' এর সৃজনশীল শাখায় পুরস্কৃত হয়। আলতাফ শাহনেওয়াজ প্রথম আলোর পক্ষ থেকে এই বইটির নানা দিক নিয়ে আলাপ করেন। সাক্ষাৎকারটি ছাপা হয়ে প্রথম আলো পত্রিকায়।]

আলতাফ শাহনেওয়াজ: ১৪২৫ বঙ্গাব্দে 'প্রথম আলো বর্ষসেরা বই'-এর সৃজনশীল শাখায় পুরস্কৃত হয়েছে আপনার গল্পগ্রন্থ মামলার সাক্ষী ময়না পাখি। আপনার অনান্য গল্পের বইয়ের চেয়ে এই গ্রন্থের বিশেষত্ব কী বলে মনে করেন?

শাহাদুজ্জামান: এত দিন গল্পের বিষয় ও আঙ্গিকের যে নিরীক্ষা আমি করে এসেছি, এই বইয়ে তার একটা সম্প্রসারণ হয়তো দেখা যাবে। এ বইয়ে আঙ্গিকের নিরীক্ষাগুলো আমি করেছি তুলনামূলকভাবে স্বাচ্ছন্দ্যে। বইয়ের 'জনৈক স্তন্যপায়ী প্রাণি, যিনি গল্প লেখেন' গল্পটি আসলে একাধারে গল্প ও গল্পের সমালোচনা। আমি একটা প্রবন্ধকেই গল্পে রূপান্তরিত করেছি বলা যেতে পারে। কিংবা 'নাজুক মানুষের সংলাপ' নামের প্লটবিহীন গল্পে কথার ছলে বিবিধ জটিল দার্শনিক প্রশ্ন নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি। আবার আঁটসাঁট প্লটনির্ভর গল্প 'টুকরো রোদের মতো খাম' লিখেছি এক বসায়, যা আমার আগের গল্প লেখার ক্ষেত্রে বিশেষ ঘটেনি। এ ছাড়া এ বইয়ে আমি এমন কিছু বিষয় নিয়ে গল্প লিখেছি, যা আমার আগের কোনো গল্পে আসেনি। ফলে বলতে পারি, এত দিনের গল্প লেখার অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এ গল্পগুলো অনেকটাই নির্ভার হয়ে লিখেছি, যার ছাপ হয়তো মামলার সাক্ষী ময়না পাখি বইটিতে পাওয়া যাবে।

আলতাফ শাহনেওয়াজ: মামলার সাক্ষী ময়না পাখিতে আমরা দেখতে পাই আপনার নতুন এক বিন্যাস—এখানকার বেশ কয়েকটি গল্পেই রয়েছে নিটোল প্লট। তবে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত প্রথম বই কয়েকটি বিহ্বল গল্প থেকে পরবর্তী

~ www.amarboi.com ~

গল্পবইগুলোতে আপনার যে ধারাটি প্রধান হয়ে ওঠে, সেটি অতটা প্লটনির্ভর গল্প নয়, যতটা তা ভাবনা বা ধারণানির্ভর গল্প। এখানে এই যে আপনার প্লটের দিকে যাত্রা, সেটি কেন?

শাহাদুজ্জামান: বলছিলাম যে এই বইয়ে আমি বেশ কিছু নতুন বিষয় নিয়ে গল্প লিখেছি। অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে আমাদের জীবনের বাঁকবদলের ভেতর আকস্মিকতার একটা বড় ভূমিকা আছে। একটা জীবন কীভাবে কোথায় গিয়ে ঠেকবে, তার ভেতর একটা ঘোর অনিশ্চয়তা থাকে। জীবনের খুব গভীরে একটা নির্মম কৌতুকও যেন আছে। আমরা অবিরাম স্বপ্ন দেখি, কিন্তু সেই স্বপ্ন ভাঙবার জন্য কোথাও কিছু একটা ওত পেতে থাকে। আমি কেবল আশার বেসাতি না করে জীবনের সেই আকস্মিকতার, অসহায়ত্বের জায়গাগুলোও বিষয় হিসেবে ধরতে চেয়েছি গল্পে—এবারের বেশ কয়েকটা গল্পে। একটা নিটোল গল্পের ভেতর দিয়ে এই থিমগুলোকে বরং অনেক বেশি স্পষ্ট করে তোলা যায়। সে কারণেই সম্ভবত এই বইয়ে বেশ কিছু প্লটনির্ভর গল্প লেখা হয়েছে।

আলতাফ শাহনেওয়াজ: লেখালেখির শুরু থেকেই মূলত নাজুক মানুষের গল্প বলতে চান আপনি, এমন সব মানুষ, সাধারণের ভেতরে থেকেও যারা থাকে আমাদের চোখের বাইরে। মামলার সাক্ষী ময়না পাখিতে তো একটা গল্পই আছে 'নাজুক মানুষের সংলাপ নামে'। তো, নাজুক মানুষের প্রতি আপনার এই পক্ষপাতের কারণ কী?

শাহাদুজ্জামান: আমি মনে করি, আমরা যে সময়কালের ভেতর দিয়ে জীবন যাপন করছি, তাতে ব্যক্তিমানুষ নানা জটিল চাপের ভেতর থাকে। যে ভৌগোলিক অবস্থানেই থাকি না কেন, বিশ্বায়নের কারণে পৃথিবীর নানা প্রান্তের ঘটনা-দুর্ঘটনার অভিঘাত আমাদের জীবনে এসে পড়ে। সিরিয়ার যুদ্ধ, অস্ট্রেলিয়ার দাবানল, আমেরিকার ড্রোন হামলা আমারই অভিজ্ঞতার অংশ হয়ে ওঠে। এই বৈশ্বিক উদ্বিগ্নতার সঙ্গে যুক্ত হয় নানা স্থানিক উদ্বিগ্নতা। আমাদের দেশের রাজনীতির, ইতিহাসের নানা বাঁকবদল হচ্ছে, জাতি হিসেবে আমাদের আত্মপরিচয় ঠিক কোন দিকে যাচ্ছে, তা নিয়ে দ্বিধা তৈরি হচ্ছে। সেই সঙ্গে আমাদের জালের মতো ঘিরে রেখেছে বাজারি অর্থনীতি। বাজারের নিয়ম অনুসারে সবাই সবার প্রতিযোগী। এতে করে মানবিক সম্পর্কের জায়গাগুলো সংকুচিত হয়ে আসছে। নানা রকম অদৃশ্য বর্ম পরে মানুষের মুখোমুখি হতে হচ্ছে এই আশংকায় যে আমাদের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আবেগ, বিশ্বাসের জায়গাগুলোতে আঘাত আসতে পারে নিকট, দূর—যেকোনো মানুষের কাছ থেকে। এ রকম একটা পরিস্থিতিতে ব্যক্তিমানুষ খুব নাজুক থাকে বলেই মনে করি। মানুষের খুব গভীরে তো ভালোবাসা, আস্থা, স্বস্থির তৃষ্ণা থাকে। আপাতসফল, ব্যস্ত, সুখী মানুষটার আড়ালে যে নাজুক মানুষটা আছে, লেখক হিসেবে আমি তার দিকে নজর দেওয়া জরুরি মনে করি।

আলতাফ শাহনেওয়াজ: বেশ অনেক কাল ধরেই আপনি প্রবাসে বাস করছেন। সে হিসেবে ডায়াসপোরা সংস্কৃতি আপনার লেখায় থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। তবে আপনার লেখালেখির বেশির ভাগ পটভূমি বাংলাদেশের; এবং আরও মজার ব্যাপার হলো, আপনার লেখায় দেশ ও দেশের মানুষের নানা কিছু দারুণভাবে জ্বলজ্বল করে। এই যে ডায়াসপোরা বাস্তবতা বা মন নিয়ে লেখার সময় দেশীয় পটভূমির বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে লেখেন, এই দুইয়ের (ডায়াসপোরা ও দেশীয় পটভূমি) মধ্যে সমন্বয় করেন কীভাবে?

শাহাদুজ্জামান: কথা সত্য যে প্রবাসে থাকলেও প্রবাসজীবন নিয়ে আমি বিশেষ লিখিনি। শরীরটা প্রবাসে থাকলেও আমার সমস্ত সত্তাজুড়ে থাকে বাংলাদেশ। আমার চেতনা, মানস গঠন, অভিজ্ঞতার সিংহভাগই গড়ে উঠেছে বাংলাদেশকে ঘিরে। লেখক তো গাছের মতো। তার ডালপালা আকাশের চারদিকে ছড়ালেও দাঁড়াবার জন্য তার একটা মাটি লাগে। আমার ডালপালা যেদিকেই ছড়াক না কেন, মাটি এই বাংলাদেশের। বাংলাদেশের সঙ্গে আপাতদূরত্বের কারণে আমি বাংলাদেশকে বরং অনেক সময় আরও স্পষ্ট আর বিস্তারিতভাবে দেখতে পাই। পুরো মিছিলটাকে ভালোভাবে দেখবার জন্য অনেক সময় মিছিলের বাইরে এসে দাঁড়াতে হয়। দূর থেকে দেখি বলেই তো তারারা জ্বল জ্বল করে। তবে বাস্তবতার স্পর্শ পেতে কাছ থেকে দেখাও অবশ্য কর্তব্য। আমি সারা বছরই কাজের সূত্রে অনেকবার দেশে আসি। ফলে দেশের প্রাত্যহিক বাস্তবতার সঙ্গেও আমার যোগাযোগ থাকে। আমি পৃথিবীর নানা প্রান্তে যাই, সে অভিজ্ঞতাকে বরাবর মেলাই বাংলাদেশের সঙ্গে। কারণ, আমার লেখার প্রধান উপজীব্য এ দেশের মানুষের স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গের নানা ইতিবৃত্ত। নানা দেশের সঙ্গে তুলনা করার কারণে আমি বাংলাদেশের শক্তি এবং সীমাবদ্ধতার ব্যাপারেও আরও স্পষ্ট ধারণা পাই। তবে এ কথাও সত্য যে প্রবাসজীবনও আমার অভিজ্ঞতার অংশ। সেই অভিজ্ঞতার মাত্রাটি অবশ্য ভিন্ন। প্রবাসজীবনের আনন্দ-বেদনার এক আশ্চর্য ও পৃথক ধরনের নাগরদোলা আছে। সেই সব অভিজ্ঞতা আমার ভাবনা আর স্মৃতির

সিন্দুকে জমা রাখছি। একদিন তালা খুলে সে অভিজ্ঞতা নিয়েও লিখবার ইচ্ছা রাখি। আপাতত আমার ডায়াসপোরা অভিজ্ঞতাকে বরং কাজে লাগাই বাংলাদেশ ও তার মানুষকে বুঝে উঠতে। বিশেষ করে একসময়ের ঔপনিবেশিক প্রভুর দেশ ব্রিটেনে থাকি বলে আমাদের অতীতটাকে ভিন্ন আলোকে দেখতে পাই এখন। বলা যায়, এভাবেই আমি এখন আমার ডায়াসপোরা ও দেশীয় পটভূমির সমন্বয় করি।

আলতাফ শাহনেওয়াজ: একজন গল্পকার বিভিন্ন বাস্তবতায় দাঁড়িয়েই গল্প লিখতে পারেন । তিনি যেমন অপরের জীবনের গল্প লিখতে পারেন, একইভাবে কখনো হয়তো লেখেন নিজের জীবনের গল্পও। যেমন মামলার সাক্ষী ময়না পাখি গ্রন্থে 'মৃত্যু সম্পর্কে আমার অবস্থান খুব পরিষ্কার' নামে আপনার একটি গল্প আছে, যেখানে দেখা যায়, লাইফ সাপোর্ট দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে বাবাকে। তার লাইফ সাপোর্ট খুলে নেওয়া হবে কি হবে না, তা নিয়েও ওই পরিবারে চলছে আলোচনা। কারণ, প্রতিদিন লাইফ সাপোর্টে রাখতে বিপুল পরিমাণ টাকারও তো প্রয়োজন হয়। এই যে গল্প, যদ্দুর জানি, এর সঙ্গে আপনার নিজের জীবনের একটি বাস্তবতা জড়িয়ে আছে। প্রশ্ন হলো, গল্পে অন্যের জীবনের বাস্তবতা নিয়ে কাজ করা যতটা স্বচ্ছন্দের, নিজের একান্ত বাস্তবতার মুখোমুখি কি তেমন সাবলীলভাবে হওয়া যায়? এ ক্ষেত্রে আপনার অভিজ্ঞতা কেমন?

শাহাদুজ্জামান: সত্যি বলতে আমার সব গল্পই হয়তো কোনো না কোনভাবে আমারই গল্প। টুকরো আমি আমার নানা গল্পেই ছড়িয়ে আছি। কোনো এক লেখক বলেছিলেন, লেখক সারা জীবন মূলত আত্মজীবনীই লেখেন। তবে কোনো কোনো গল্প হয়তো তুলনামূলকভাবে আমার খুব কাছের অভিজ্ঞতার গল্প। যেমন 'মৃত্যু সম্পর্কে আমার অবস্থান খুব পরিষ্কার' গল্পটা আমার বাবার মৃত্যুর প্রেক্ষাপটেই লেখা। এ বইয়ে আরও দুয়েকটা গল্প আছে, যা একান্ত আমার নিজের জীবনের বস্তবতার খুব কাছের ঘটনার ওপর ভিত্তি করে লেখা। কিন্তু লেখক হিসেবে আমার কাজ তো নানাজনের কাছ থেকে শোনা গল্পকে নিজের গল্প বানিয়ে ফেলা। সে কাজই করেছি এ বইয়ে। এটা ঠিক যে নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনার ওপর ভিত্তি করে গল্প লেখা তুলনামূলকভাবে দুরূহ। ঘটনার সঙ্গে একটা ঝুঁকিহীন দূরত্ব তৈরি হলেই কেবল তা নিয়ে ভালো গল্প লেখা যায়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আলতাফ শাহনেওয়াজ: গল্প-উপন্যাসের সীমানা এখন সম্প্রসারিত হয়ে গেছে। বর্তমানে বিশ্বে লেখা হচ্ছে নতুন ধরনের গল্প-উপন্যাস। এ বিষয়ে আপনি নিজেও

~ www.amarboi.com ~
অনেক কথা বলেছেন। নতুন ধরনের গল্প-উপন্যাস ভবিষ্যতে কি লিখতে চান আপনি?

শাহাদুজ্জামান: গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতার দেয়াল ভেঙে পরস্পরের সীমানা সম্প্রসারণের কথা আমি বলে আসছি অনেক দিন থেকেই। আমার নিজের লেখায় তার প্রতিফলন আছে। তবে গল্প-উপন্যাসের গড়নের কোনো বিশেষ ফর্মুলা আছে বলে মনে করি না। গল্প বা উপন্যাস একটা বিশেষ পাঠ অভিজ্ঞতা, সেটার যেকোনো আকার-গড়নই দেওয়া যেতে পারে, যদি তাতে সেই সৃজনশীল মেধা থাকে। নতুন যে উপন্যাসটি লিখছি, সেখানেও শিল্প-সাহিত্যের নানা শাখার সীমানা সম্প্রসারণের চেষ্টা আছে।

আলতাফ শাহনেওয়াজ: লেখালেখি নিয়ে সামনের দিনগুলোতে আপনার পরিকল্পনা কী? নতুন কোনো বইয়ের পরিকল্পনা কি করেছেন?

শাহাদুজ্জামান: আমি একটা ফিকশন ও আরেকটা নন-ফিকশন নিয়ে কাজ করছি। এ ছাড়া এ মুহূর্তে আমি ও আমার অগ্রজ বন্ধু খায়রুল ইসলাম মিলে মুক্তিযুদ্ধে চিকিৎসাসেনাদের ভূমিকা নিয়ে একটা বই লিখছি। এ বিষয়ক গবেষণা শেষ হয়েছে। এখন লেখার কাজ চলছে। একটা নতুন উপন্যাসের কাজ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে দুটো নতুন চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যও লিখছি। বাংলাদেশের ব্যতিক্রমী ধারার খ্রিষ্টীয় যাজক ফাদার রিগনের জীবনের ওপর একটি চিত্রনাট্য লিখছি, যা পরিচালনা করবে হেমন্ত সাদিক আর দ্বিতীয় চিত্রনাট্যটি লিখছি আমার গল্প 'ইব্রাহিম বক্সের সার্কাস' অবলম্বনে, যা পরিচালনা করবেন নূর ইমরান মিঠু, যিনি আমার গল্প অবলম্বনে ইতোমধ্যে নির্মাণ করেছেন কমলা রকেট চলচ্চিত্রটি।

———

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও